পলাশি

জিতেশচন্দ্র লাহিড়ী

অজন্তা প্রকাশনী

প্রকাশক
অরুণ গুহ
শ্যামা প্রকাশনী
চাকদহ, নদীয়া।

প্রথম প্রকাশ
অগ্রাণ—১৩৫৫
দ্বিতীয় প্রকাশ
আশ্বিন—১৩৫৬
তৃতীয় প্রকাশ
বৈশাখ—১৩৫৮

মুদ্রক
পশুপতি কর্মকার
শ্রীমা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২৫।১-এ, কালিদাস সিংহ লেন
কলিকাতা-৯

ব্লক
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং
১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

মূল্য—দশ টাকা

স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া কঠিন। সাধারণতঃ দেখা যায় ক্ষমতাসীন দল নিজের ঢাক ঢোল পিটাইয়া প্রকৃত সংগ্রামীদিগের ইতিহাস চাপা দিয়া রাখে। রুশ বিপ্লবের ইতিহাসে ট্রট্স্কীর কোন স্থান নাই। ট্রট্স্কী নিজ দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল, তাহাকে নির্দয়ভাবে হত্যা করা হইল। ষ্টেলিন ক্ষমতা হাতে রাখার জন্য তাহার সহ-কর্ম্মীদিগের নামে অপবাদ রটাইয়া, তাহাদিগকে হত্যা করিয়া, নিজের গদী সুদৃঢ় করিল।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসেও দেখা যায় বিপ্লবীদের কোন স্থান নাই, "তাহারা বিপথগামী, সন্ত্রাসবাদী", ভারতের স্বাধীনতা আনিয়াছে গান্ধীপন্থী কংগ্রেস। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বিপ্লবীরা যখন সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন করিতেছিল, তখন গান্ধীপন্থী কংগ্রেস বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিয়াছিল। সেই সময় বৃটিশ কূটনীতি বিভাগ বিপ্লবীদিগকে জনসাধারণের মধ্যে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য প্রচার করিতে লাগিল, বিপ্লবীরা বিপথগামী সন্ত্রাসবাদী, সন্ত্রাসবাদ দ্বারা দেশের কল্যাণ সাধিত হইবে না। তখন জাতীয় কংগ্রেস নেতারাও বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে খুশী করার জন্য "ষ্টেটসম্যান" কাগজের সুরের সঙ্গে সুর মিলাইয়া বলিতে লাগিল,—"বিপ্লবীরা বিপথগামী, বিপ্লবীরা সন্ত্রাসবাদী; সন্ত্রাসবাদ দ্বারা দেশের কল্যাণ সাধন হইবে না।" বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ার সময় ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া, মুসলিম লীগ ও জাতীয় কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করিয়া যায়। গদী লাভ করিয়া ক্ষমতাসীন দল নিজেদের ঢাক ঢোল পিটাইয়া প্রমাণ করিল দেশের স্বাধীনতা আনিয়াছে মহাত্মা গান্ধী এবং জাতীয় কংগ্রেস অহিংস নীতি দ্বারা। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বিপ্লবীদের যেমন কোন স্থান নাই নেতাজী সুভাষচন্দ্রেরও বিশেষ কোন স্থান নাই। সুভাষচন্দ্র জাতীয় কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন।

মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসের অহিংস নীতি ভারতবর্ষকে দুর্ব্বল করিয়াছে। আমাদের কোন শত্রু নাই, বীরত্বের কোন প্রয়োজন নাই, অ-হিংস নীতিতে বিশ্বাস থাকিলেই মোক্ষ লাভ হইবে। অহিংসার বাণী প্রচারের ফলে দেশে সৃষ্টি হইতেছে দুর্নীতি পরায়ণ কাপুরুষের দল।

একটা জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, বীরত্ব আত্মত্যাগ ও নির্যাতন ভোগের ইতিহাস জাতিকে সজীব রাখে, বীর সৃষ্টি করে। এখন ভারতবর্ষে বীরের প্রয়োজন আছে, না অহিংসবাদী ক্লীবের প্রয়োজন আছে, তাহা ভারতবাসীই স্থির করিবে। যাঁহারা মনে করেন ভারতবর্ষে বীরের প্রয়োজন আছে, তাঁহাদের নিকট বিপ্লব যুগের বিপ্লবীদের বীরত্ব কাহিনী সমাদৃত হইবে।

বিপ্লবী জিতেশচন্দ্রের সহিত আমি পলাতক অবস্থায় এবং জেলে একত্র ছিলাম। জিতেশচন্দ্র তাহার কৈশোরেই দেশের স্বাধীনতার জন্য গৃহত্যাগ করিয়া বৈপ্লবিক কাজে নিযুক্ত হয়। সে অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিল এবং কয়েকটি পত্রিকার গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিল। স্বচ্ছ রাজনৈতিক চেতনার সহিত সহজাত সাহিত্য প্রতিভা মিশিয়া সে যুগেই তাহাকে বলিষ্ঠ ও সার্থক লেখক হিসাবে

স্বীকৃতি দিয়াছিল। বৃটিশ আমলে প্রকাশিত তাহার প্রথম গ্রন্থ "বিপ্লবী বীর নলিনী বাগচী" সে যুগে এত আলোড়ন তুলিয়াছিল যে প্রায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়।

তাহার লিখিত "নমামি" এবং "সমিধ" আমি পড়িয়াছি। স্বাধীনতালাভের অল্প কাল পরেই যখন "নমামি" প্রথম প্রকাশিত হয় তখন ভারত ও পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বস্তরের মানুষের মনে যে অপূর্ব সাড়া জাগাইয়াছিল তাহা যে কোনও খ্যাতনামা লেখকের পক্ষেও গৌরবের বিষয়।

জিতেশচন্দ্র তাহার লেখার মধ্য দিয়া বিপ্লবী চরিত্রগুলি ফুটাইয়া তুলার চেষ্টা করিয়াছে। ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্রের উপর কল্পনার রঙ চড়াইয়া ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার রেওয়াজ চালু হইয়াছে। কিন্তু অগ্নিযুগের ঘটনা ও কর্মবহুল চরিত্রগুলি লইয়া এ পর্য্যন্ত কোনও কাহিনী রচিত হয় নাই। এ যুগ সম্বন্ধে যাহা কিছু লেখা হইয়াছে তাহা কিছুটা ইতিহাস, কিছুটা জীবনী এবং কিছুটা স্মৃতি-কাহিনী। সেদিক দিয়া বিচার করিলে ইতিহাস ধর্মী সার্থক ছোটগল্পের সংকলন হিসাবে "নমামি" ও "সমিধ"এর মূল্য অনস্বীকার্য্য। গল্পগুলির ঐতিহাসিক মূল্য অপেক্ষা সাহিত্যিক মূল্যও কিছুমাত্র কম নহে।

বিপ্লব যুগে আমরা দেশের যুবকদিগের মধ্যে বীরত্বভাব জাগানোর জন্য 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস,' 'রাজপুত কাহিনী' ও বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পড়াইয়াছি। বিপ্লব যুগের বিপ্লবীদের বীরত্বকাহিনী লিপিবদ্ধ হইলে দেশের যুবকদের মধ্যে অনুপ্রেরণা যুগাইবে। জিতেশচন্দ্রের 'নমামি' ও 'সমিধ' জাতির মধ্যে অনুপ্রেরণা জাগানোর সহায়ক হইবে।

"নমামি"র পূর্বে তৃতীয় সংস্করণ ও 'সমিধ"-এর দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছিল। অতি অল্পদিনেই ঐসব সংস্করণই শেষ হইয়া গিয়াছিল। ইহা দ্বারাই অনুমান করা যায় "নমামি" ও "সমিধ" কত জনপ্রিয় ছিল। ইহার জনপ্রিয়তা আজিও হ্রাস পায় নাই এবং প্রবল চাহিদাই নূতন করিয়া এই গ্রন্থদ্বয়কে একত্রে প্রকাশের প্রেরণা দিয়াছে। আজ ১৮ বৎসর পর জিতেশচন্দ্রের পুত্র দিব্যেশচন্দ্র "নমামি" প্রকাশ করিয়া জাতির সেবা করিয়াছে।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী
(মহারাজ)



জিতেশচন্দ্র লাহিড়ী

জন্ম—১৮৯৮ মৃত্যু—১৯৬৭



উৎসর্গ

অগ্রজ শ্রীপ্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী

শ্রীচরণকমলেষু—

দাদা,

আপনাকে কেন্দ্র করে রাজসাহীতে অনুশীলন দলের যে বিপ্লবী সংস্থা গড়ে ওঠে আমার স্বাদেশিকতার হাতে খড়ি সেখানেই হয়। ভারতের মুক্তিসমরের বহু নির্ভীক যোদ্ধার বহু আত্মোৎসর্গী মহাবীরের পুণ্যময় সাহচর্যের যে সৌভাগ্য আমি জীবনে পেয়েছি আপনার বৈপ্লবিক আগ্রহেই তার সূচনা ও উন্মেষ। আমাদের দুর্গম পথের যাত্রীদের মধ্যে আজও যাঁরা জীবিত আছেন তাঁদের অনেকেই ঘরের টানে পথ ছেড়েছেন। কিন্তু আপনার পথ চলা আজও শেষ হয়নি। তাই আমার ভক্তির অর্ঘ্য 'নমামি' আপনার ক্লান্তিহীন চরণোদ্দেশে উৎসর্গ করলাম। ইতি—

আপনার

স্নেহাকাঙ্ক্ষী অনুজ,

জিতেশ

নিবেদন

প্রতিদিন সন্ধ্যাব পর আমার ছেলেমেয়েরা আমাকে ঘিরে বসে গল্প শুনতে চায়। মহাভারত, রামায়ণ আর ইতিহাসের যত বীরত্বের কাহিনী, মহত্ত্বের কাহিনী আমি জানতেম ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে সব বলেছি। কিন্তু আরো চাই—আরো চাই। তাই ওদের দাবী মেটাতে স্বরু করেছিলাম অগ্নিযুগের কাহিনী—গল্পচ্ছলে সাজিয়ে শুনিয়েছি দিনের পর দিন। এই থেকেই অগ্নিযুগের ঘটনা ও ঘটনাবহুল চরিত্রগুলি নিয়ে গল্প লেখার ইচ্ছা হয়। তার উপর দাদার ক্রমাগত তাগিদে অগ্রসর হই।

আমি সাহিত্যিক নই। বোধহয় কোন সাহিত্যিকের হাতে এইসব মাল-মশলা পড়লে গল্পগুলি সুন্দর রূপ পেত, যেমন পেয়েছে মনোজ বাবুর "ভুলি নাই" বইয়ে। তাঁর লেখনীতে অগ্নিযুগের কাল্পনিক চরিত্রগুলি চমৎকার ফুটে উঠেছে। আমার 'নমামি''র বেশীর ভাগই বাস্তব ঘটনা,—অল্পটুকু কল্পনা—অর্থাৎ মুখ্যতঃ ইতিহাস, গৌণতঃ গল্প।

দেশ আজ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু দেশের চরম দুর্দিনে যে আপনভোলা তরুণের দল স্বাধীনতার স্বপ্ন প্রথম দেখেছিল, নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে সেই স্বপ্ন সার্থক করতে চেয়েছিল, যাদের অস্থি ও রক্ত দিয়ে স্বাধীনতার সোপান নির্মিত হয়েছে তাদের অনেকেই আজ অবজ্ঞায় একপাশে পড়ে রয়েছে। অথচ কত দেবোপম শুভ্রতা,—কত ত্যাগ, কত প্রেম, কত অপূর্ব কর্মকুশলতা রয়েছে এদের চরিত্রে। অবহেলার এই অপচয়ের জন্য একদিন হয়তো পরিতাপ করতে হবে দেশ নায়কদের। হয়তো হীরা ফেলে কাঁচ সংগ্রহের গ্লানি তাঁদের কর্মে ব্যর্থতার ছাপ এঁকে দেবে। ভবিতব্যের কথা ছেড়ে দিয়ে আজ শুধু দধীচি-ধর্মী মানুষগুলোর কথাই বলে যাই—তাঁদের কাহিনী ধারণ করে ধন্য হোক আমার "নমামি"।

জিতেশচন্দ্র লাহিড়ী।

নমামি

এই লেখকের :—

উঁচু-নীচু

মেঘ ডাকে

পথের পরিচয়

বিপ্লবের তপস্যা

নন্দনপুর নাট্য সমিতি

(নাটক)

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র লাহিড়ীর :—

বিপ্লবী জীবন

পাক ভারতের রূপরেখা

INDIA PARTITIONED AND MINORITIES

IN

PAKISTAN

নমামি

দুর্যোগের রাত্রি। ঝড় আর বৃষ্টি সমানেই চলেছে। আঁধারে পথ তো দূরের কথা, সামনের মানুষ—এমন কি নিজের হাত পা পর্যন্ত দেখা যায় না। এই আঁধারভরা বাদল রাতে তিনজন যুবক চলেছে হাত ধরাধরি করে—অতি সন্তর্পণে। বাত্যাতাড়িত বৃষ্টির ধারা আছড়ে পড়ছে তাদের চোখে, মুখে, সর্বাঙ্গে—সুতীক্ষ্ণ শরের মত। পিছল পথে একজন পড়ে যাবার মত হতেই আর একজন তাকে সামলে নেয়। আবার চলতে থাকে হাতে হাত মিলিয়ে—যথাসম্ভব ক্ষিপ্র গতিতে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকায়। তারই আলোতে পথ দেখে নেয় তারা। ঝড়ে ধান ও পাটের চারাগুলি জড়াজড়ি করে এলোমেলো ভাবে শুয়ে পড়েছে—ঢেকে ফেলেছে পথের রেখাটুকু। তাই মাঝে মাঝে হারিয়ে যায় পথ। মাঠের চারদিকের বসতিগুলোতে আলোও দেখা যায়। অথচ এই বিভ্রান্ত পথিকের দল একটু চেঁচিয়েও বলতে পারে না—"কে আছ ভাই! একটু বাইরে এস—আলো দেখাও!" কেউ দেবেনা সাড়া তাদের আহ্বানে। সারাটা দেশের বুক জুড়ে দুর্যোগ-দৈত্যের তাণ্ডব চলেছে। আর দোর জানালা বন্ধ করে ঠাণ্ডা হাওয়ায় দিব্যি আরামে সকলে ঘুমে অচেতন। পথের ডাক কি পৌঁছুবে তাদের কানে? তাই নীরবেই চলছিল তিনজন। মাঝের যুবকটি চাপা স্বরে জিজ্ঞাসা করল—"দেরী হচ্ছে না তো? ক'টা বাজে দেখুন না সেজদা।" ঘড়ির পকেট থেকে একটা ঘড়ি বের করল সামনের যুবকটি। ডান হাতে সেটা ধরেই চলতে লাগল পথ,—বিদ্যুতের আশায়। বিদ্যুৎ চমকাতে দেরী হয় না। দেখে নিল ঘড়ি—দশটা সাঁইত্রিশ।

"আরও একটু জোরে চল। সাড়ে এগারটায় পৌঁছুতেই হবে ঘাটে।" সেজদা গতিবেগ বাড়িয়ে দিলেন। মাঝেব যুবকটির দলীয় নাম বিমান। ঘর ছেড়ে এই প্রথম বেরিয়েছে সে ভীষণ দুর্যোগে, ভীষণতার অভিযানে। মন তাব মেতে উঠেছে এক সর্বনাশা নেশায়। উদ্বেল হৃদয়ের সীমাহীন সজীবতায় গ্রাহ্যই করে না প্রকৃতির প্রতিরোধ। অবশেষে নির্দিষ্ট সময়ের দশ মিনিট আগেই তারা পৌঁছে গেল ঘাটে। সারি সারি কয়েকখানি নৌকা বাঁধা।

"হেই মা-ঝি-ই-ই—কৈ আছ," —হাঁক দিলেন সেজদা।

"আহেন—আহেন—কর্তা"—অন্ধকারে জবাব ভেসে আসে। পা টিপে টিপে অতি সাবধানে তিনজন অগ্রসর হল নৌকার দিকে। নৌকায় পৌঁছে কিনারে বসে পা ধুয়ে নিয়ে তারা ঢুকল ভিতরে। নৌকায় আরও লোক ছিল। আঁধারে জড়সড় হয়ে বসল আগন্তুক তিনজন। ঝড় বৃষ্টি কমে এলেও তখনও কিছুটা রয়েছে। তখনও বিক্ষুব্ধ মেঘনা আলোড়িত হচ্ছে ঢেউয়ে ঢেউয়ে। একটা আস্ফালন,—একটানা গর্জন কবেই চলেছে যেন এই বিশালকায় দৈত্য। এরই মাঝে নৌকা দিল ছেড়ে। ঢেউয়েব তালে নাচতে নাচতে এগিয়ে চলে নৌকা। দাঁড়ে বসেছে তিনজন। একই তালে দাঁড় পড়ে—"ক্যাঁ-ও-ঝপ্, ক্যাঁ-ও-ঝপ্।"

ঘুমের ঘোরে কখন যে বিমান এলিয়ে পড়েছে জড়সড় হয়ে ছইয়ের মধ্যে একপাশে,—তা' সে জানে না। ঘুম ভেঙ্গেই দেখে ভোরের আলো ধীরে ধীরে আঁধারের আববণ ভেদ করে এগিয়ে আসছে। প্রতি মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে দিক্-দিগন্তেব রূপ। সোজা হয়ে বসেই বিমান দেখতে পেল নৌকায় আটজন লোক—মাঝি মাল্লা বাদে। তাদের মধ্যে একজন তার অতি পরিচিত,—অতি প্রিয়। আনন্দে মন তার নেচে উঠল। হাসিমুখে পরিচিত লোকটির দিকে চেয়ে বলল সে, "আপনিও এসেছেন জ্যো"—কথা তার শেষ হতে পেল না। মাঝপথে একটি ধমক খেয়ে নিতান্ত

অপ্রতিভ হয়ে থেমে গেল সে। মনের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস থমকে গেল প্রচণ্ড ধাক্কায়। তারপর সব নীরব। আটটি বোবা যেন আটকে রয়েছে একটি ঘরে। এরা হাসে না—কাঁদে না—কথা কয় না। শুধু এ ওর দিকে চায়—আর মুখ গুমড়িয়ে মনের খুশী চেপেই মারার চেষ্টা করে। কখন কদাচিৎ তার ব্যর্থতা প্রকাশ পায় ক্ষণিকের মুচকি হাসিতে। পাগল নাকি এরা!

বিমান হঠাৎ আবিষ্কার করল যে হাইলের মাঝিটি তার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে। চোখে চোখ মিলতেই মাঝিটা চোখ ফিরিয়ে নিল। আবার যেন বিমানকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। বিমানও এবার বেশ করে দেখে নিল লোকটিকে। ভীষণ কালো,—মাথার চুলের কমতি পুষিয়ে দিয়েছে দাড়ির জঙ্গল, কদাকার,—ময়লা ছেঁড়া ধুতি পরণে,—গলায় কাঠের মালা, আর সর্বাঙ্গ অনাবৃত। বিমানের ইচ্ছা হল তাকে জিজ্ঞাসা করে নামটি কি,—কি জাত! কোনও ক্রমে এগিয়ে গেল সে গলুইয়ের দিকে। মৃদু স্বরে প্রশ্ন করল—"তোমার নাম কি?"

"আঁইগ্যা? মোর নাম জিগ্যান? মোর নাম খালীছরণ"।

খুব হাসি পেল বিমানের। "কালীচরণ" কথাটা উচ্চারণ করছে "খালীছরণ"।

"কি লোক তোমরা?" বিমান জিজ্ঞাসা করে।

উত্তর হল, "নমামি।"

"নমামি! সে আবার কি?"

"আঁইগ্যা—নমামি"—আবার জবাব দেয় মাঝি। বিমান অবাক হয়ে ভাবতে থাকে "নমামি" আবার কি জাত!

এবারে "খালীছরণ"ই সেটা বুঝিয়ে দিল।

"আঁইগ্যা খরতা! মোরা ছোট জাত। হইলাম গিয়া আমি নমো।" এবারে বুঝল বিমান! কালীচরণ একটু তাড়াতাড়ি "নম", "আমি" এই শব্দ দুটি একসাথে উচ্চারণ করেছে, ফলে হয়েছে "নমামি"র আবির্ভাব।

বেলা বেড়েই চলল। নৌকার উপরেই টিনের তোলা উনুনে পাক চড়েছে। নৌকায় দাঁড় পড়ছে ঝপাঝপ,—চলেছে এগিয়ে। দুই কড়াই খিচুড়ি,—মানে চাল আর ডাল একসাথে সেদ্ধ করে তাতে নুন দেওয়া হয়েছে। হাঁডা তাতিয়ে সম্বারা দেবার ব্যবস্থাও হয়েছে। সেজদা বলে উঠলেন, "বড়ই যে বাহারের খাবার ব্যবস্থা! ভোজ দেখছি!" নীরবেই হেসে নিল সবে। একটি নির্জন স্থানে নৌকা ভিড়িয়ে স্নান সেরে সকলে খেয়ে নিল। আবার চলল নৌকা। সন্ধ্যার পর তারা পৌঁছুল মণিতলার ঘাটে। ঘাটের উপরেই প্রকাণ্ড বটগাছ। সেখানে নাকি ষাট হাজার ভূত প্রেত বাস করে। কত অনভিজ্ঞ পথিক নাকি মারা গেছে ভূতের হাতে। ফলে দিনের বেলাতেই পারতপক্ষে একাকী কেউ এধারে আসে না। বিমানও জানত এ কাহিনী। গা তার ছম্ ছম্ করে। আর একখানা নৌকা আগেই এসেছে এই ঘাটে। তাতেও জনকয় আরোহী।

রাত্রি প্রায় এগারোটা। দলের সাথে বিমানও হাফপ্যাণ্ট ও সার্ট পরে নৌকা ছেড়ে এগিয়ে চলে নিস্তব্ধ গ্রাম্য পথে। জানত সে, যে তারা সবাই চলেছে য়্যাকশানে। উত্তেজনায়, আশঙ্কায় তার বুকটা ঢিব ঢিব করে। নির্দেশমত সে একটি উপদলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রবেশ করল এক সুদখোর টাকার কুমীর মহাজনের বাড়ীতে। বাঁশীব সাঙ্কেতিক ধ্বনির সাথে সাথেই যে যার নির্দিষ্ট কাজে লেগে গেল। কেউ যাতে বাড়ীর বাইরে না যায় অন্দর থেকে, তাই লক্ষ্য রাখার ভার ছিল বিমানের। সে লক্ষ্য করল এই য়্যাকশানের সর্বাধিনায়ক এক কৃষ্ণকায় পাঞ্জাবী। মাথায় পাগড়ি, প্রকাণ্ড দাড়ি, চোখে চশমা, খাকির ট্রাউজার আর মিলিটারী সার্ট পরে সব কিছুরই তত্ত্বাবধান করছেন তিনি। অবাক হয়ে গেল বিমান। দলে পাঞ্জাবীও আছে,—আর তারাও বাংলাদেশের কাজে অংশ গ্রহণ করে! সহসা একটি বাঁশীর আওয়াজ, সঙ্গে সঙ্গেই গুড়ুম গুড়ুম। উত্তেজনায় বিমান হারিয়ে ফেলে কর্তব্যের নির্দেশ, ছুটে যেতে চায়

গেটের দিকে। হঠাৎ কে যেন তার হাত চেপে ধরে --কঠোর স্বরে আদেশ দেয়—"ফিরে যাও অন্দরের ফটকে।"

অভিভূত বিমান চেয়ে দেখে সেই পাঞ্জাবী। কিন্তু এমন পরিষ্কার বাংলা বলে সে! আশ্চর্য!

পর পর দুটি বাঁশীর শব্দ। একযোগে সকলে বেরিয়ে এল বাড়ী থেকে। উপদলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন পথে অগ্রসর হল নদীর দিকে। বিমানের ব্যাচ যখন নদীতীরে পৌঁছল তখন গ্রামে ভীষণ সোরগোল। নৌকার উপর থেকে কে যেন আদেশ দিল, "হেই! চটপট।" বিমান দেখল একজন লোক ক্ষিপ্রহস্তে প্রত্যেককে তল্লাসী করছে আর ধুতি, জামা বিলি করছে। অধিকতর ক্ষিপ্রতার সাথে চলেছে বস্ত্র পরিবর্তন। ঠিক বিমানেরই জামা ধুতি বিমানের হাতেই পৌঁচেছে দেখে সে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি সকলে নৌকায় উঠে প'ল। নৌকা দিল ছেড়ে। উত্তেজনায় অধীরতায় বিমানের সাবা বাত ঘুম হল না। কি যে হয়ে গেল কিছুই সে বুঝতে পারেনি। নানা চিন্তার দাঙ্গা লেগেছে তার মনে,—মাথা তার ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল।

ভোবেব আলোর সাথে সাথেই সে চেয়ে দেখে নমামি'র চোখ দুটি যেন তাকে গিলছে। কি কদাকার এই মাঝিটা! আর কেনই বা সে এত চেয়ে থাকে বিমানের দিকে। স্পাই না তো! তার মনে হল জ্যোতিদাদের মস্ত ভুল হয়েছে অজানা মাঝির নৌকা ভাড়া করা এই ভীষণ কাজে। কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ্য করে সে অবাক হ'ল। তারা করেছে ডাকাতি। বড় বন্দুক, পিস্তল, রিভলভার, ছেনী, হাতুড়ি,—অনেক কিছুই দেখা গেল কার্যের ক্ষেত্রে। বস্তা বস্তা টাকাও লুটেছে তারা। কিন্তু সে সব—এমন কি খাকি সার্ট, হাফ প্যাণ্ট কিছুই তো নেই নৌকায়। গেল কোথায়? বিমান নিজেই ঠাওর পায়না—তো এই অজ্ঞ নিরক্ষর মাঝি বুঝবে কি?

দুপুরে আবার রান্না হয়েছে। একটি নির্জন স্থানে স্নানাহারের

জন্যে সকলে নেমে গেছে। বিমানের শরীরটা ভাল নেই, মাথাটা খুব ধরেছে। তাই সে নৌকাতেই রয়ে গেছে। আর রয়েছে "খালীছরণ।"

মাঝি এবারে বিমানের সাথে গল্প জুড়ে দিল।

"কৈ গেছলেন হাপনারা?"—জিজ্ঞাসা করে সে।

কি উত্তর দেবে বিমান? সে চুপ করে থাকে।

মাঝি নিজেই উত্তর দেয়—"ও-ও বিয়াবাড়ী বুঝি! বাজি পুড়াইন্যার আওয়াজ পাইলাম—আর হারা গাঁ জুইড়া কি হৈ চৈ! খুব বড় ঘরের বিয়া বুঝি?"

বিমান লক্ষ্য করল যে মাঝি কথা বলে আর তার দিকে চেয়ে চেয়ে মুচকি হাসে। আবার প্রশ্নের ধরণও এই প্রকার! কিছুক্ষণ পূর্বে এই মাঝিটার চাওয়ার ধরণ দেখে স্পাই বলে যে সন্দেহ তার মনের কোণে জেগেছিল এবার সেটা আরও দৃঢ়তর হ'ল। আর প্রশ্নের সুযোগ দেয়া উচিত নয় বিবেচনায় বিমান হাই তুলে গা মোড়ামুড়ি করে শুয়ে প'ল। সত্যিই তার গা গরম হয়েছিল—মাথাটাও বেশ ধরেছে। চোখ বুজে পড়ে রইল সে। হঠাৎ সে অনুভব করল মাঝিটা এসে তাব কপালে হাত দিয়েছে। বিমান মনে মনে খুব বিরক্ত হলেও ঘুমেব ভাণ করেই পড়ে রইল। মাঝি ধীরে ধীরে তার কপাল টিপে, আব চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। প্রথম প্রথম বিরক্তির ভাব মনে এলেও মন্দ লাগছিল না বিমানের। তার মনে হ'ল কত যত্ন কত স্নেহ মাখানো রয়েছে মাঝির হাত দুটিতে, যেন স্নেহময়ী জননী হৃদয় ঢেলে পীড়িত সন্তানের সেবা করছেন শিয়রে বসে। আহারান্তে আর আর সকলে নৌকায় ফিরে আসাব আগেই মাঝি চলে গেল গলুইয়ে।

পদ্মা ও মেঘনা নদীর তীরবর্তী গ্রামগুলির ধনী মহাজনদের বাড়ীতে পর পর কয়েকটা ডাকাতি হয়েছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ডাকাত

দলের নেতা এক কৃষ্ণকায় পাঞ্জাবী। প্রকাণ্ড বড় তার দাড়ি। নদী তীরের বড় লোকদের মনে সে একটা রীতিমত বিভীষিকা। কত অদ্ভুত কাহিনী রটে গেছে তার সম্বন্ধে। কেউ বলে পুরাণের শব্দভেদী বাণ আয়ত্ত করেছে সে,—শব্দ লক্ষ্য করেই ছোড়ে অব্যর্থ গুলী। কেউ বলে লাঠি ভর করে এক লাফে ওঠে দোতালায়, অবলীলাক্রমে লাফ দিয়ে পড়ে ভূমিতে। হাত দিয়ে ভাঙ্গে সিন্দুকের তালা, হুঙ্কার দেয় দৈত্যের মত। নির্মম পাষাণ সে। অথচ কোন ক্ষেত্রেই করেনি নারীর অসম্মান। এক বাড়ীতে একজন দস্যু একটি মহিলার অঙ্গ থেকে গয়না খুলে নিচ্ছিল। কিন্তু সহসাই কে যেন তাকে দু'কান ধরে তুলে ধরল শূন্যে। সকলে চেয়ে দেখল সেই কৃষ্ণকায় পাঞ্জাবী। এও শোনা যায় ডাকাতি করতে যেয়েও সে রোগীর সেবা করে, বাড়ীর মেয়েদের কাছে জল চেয়ে খায় আর বলে, "কুচ্ছু ভয় নাই মায়ি!"

এই সব ডাকাতির ফলে পুলিশের তৎপরতা বেড়ে গেছে অসম্ভব। পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী, বুড়ীগঙ্গা নদীর স্থানে স্থানে লঞ্চে ও বোটে জলপুলিশের ঘাটি বসেছে। এদের প্রধান লক্ষ্যই ছিল বড় ঘাসী নৌকা দেখেছে কি থামাবেই। একদিন কালীচরণ দুজন সঙ্গীসহ জোর চালিয়েছে নৌকা। দূর থেকে সে দেখতে পেল জলপুলিশের ঘাটি। সেই সময় পাশ দিয়ে একখানা ষ্টীমারও যাচ্ছিল। ঢেউয়ের দোলায় দোলা খাচ্ছিল নৌকাখানি। হাইলের মুঠি শক্ত করে ধরে কালীচরণ চেঁচিয়ে ওঠে—"এই বীরা! এই সোৎস্যা! তরা দ্যাখস্ কি? লাগা পাল্লা জাহাজের লগে!" বলেই সে সবল হাতে হাইলের মুঠি ধরে ক্যাওড়া মারে আর মুখ বুঁজে শব্দ করে "উঁ—উঁ—হুঁ,—উ—উ!" নৌকার গলুই একবার ওঠে পাঁচ সাত হাত উঁচুতে,—আবার পড়ে গহ্বরে—যেন ঢেউয়ের দোলায় নৌকাখানি জুড়ে দিয়েছে প্রলয় নাচন। তারি সাথে সাথে নেচে উঠেছে কালীচরণের মন। শঙ্কা নেই—সংশয় নেই, যেন প্রলয়ের বুক চিরে ভ্রূক্ষেপহীন বেপরোয়া

নিঃশঙ্ক চিত্তে ছোট্ট নৌকাখানি নিয়ে স্থির লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে মাঝি কালীচরণ। বৃটিশের যান্ত্রিক জলযান নদীর বুকে তুলেছে উত্তাল তরঙ্গ,—ঢেউয়ের পর ঢেউ,—আঘাতের পর আঘাতে চুরমার করে দিতে চায় নৌকাখানি। কিন্তু কালীচরণের সবল হাতের কৌশলী চালনা এড়িয়ে চলেছে এই বিপর্যয়। নৌকা ডুবে—ডুবে—ডুবে না। আবার ওঠে ভেসে। আর মাঝি মাল্লা দাঁতে দাঁত চেপে ভ্রূকুঞ্চিত করে ;—আবার ওঠে হেসে।

জোরেই চলছিল নৌকাখানা। কিন্তু পুলিশ ঘাটির আড়াআড়ি যেই এসেছে অমনি একজন সিপাই চিৎকার করে উঠল, "এ—এ—নাইয়া! রোকো নাও"—

বেপরোয়া কালীচরণ চাপা গলায় বলে, "হুঁ! ইসে—চালা জোরে।"

এইবার পুলিশ লঞ্চ দিল ছেড়ে। দু' তিনজন সেপাই হেঁকে বলে, "রোকো—রোকো!"

কালীচরণ এইবারে নৌকা দিল থামিয়ে। পুলিশের আদেশ মত ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল তীরের দিকে।

ইতিমধ্যে লঞ্চখানি নৌকার কাছে এসেছে। একজন সেপাই এগিয়ে এসে বল্‌লে—"এ শারোয়া! কানমে বাৎ নেহি যাতা?"

লঞ্চের সাথে সাথে নৌকাখানিও তীরে ভিড়ল। একজন অফিসার হুকুম জানালেন—"উতারো"—"উতারো"।

সঙ্গীদ্বয়সহ কালীচরণ নেমে পল নৌকা থেকে। তল্লাসী সুরু হল। কিছুই আপত্তিজনক পাওয়া গেল না নৌকায়। অফিসারটি জিজ্ঞেস করলেন, "মাঝি কে?"

কালীচরণ এগিয়ে এসে মাথা নীচু করে সেলাম ঠুকে বললে – "আমি খরতা।"

"কেন অত জোরে নৌকা চালিয়েছিলে?"—প্রশ্ন করেন অফিসার।

একগাল হেসে কালীচরণ জবাব দেয়—"হ খরতা! ইসে জাহাজের লগে বাইজ ধরছিলাম।"

"থামাওনি কেনডাক শুনেও?"

ধমকের চোটে চমকে ওঠে কালীচরণ। মুখ কাঁচু মাচু করে বলে, "হুনিনি হুজুর।"

"হুননি? এইবার হুনিয়ে দিচ্ছি!"—রহস্য করে বলেন অফিসার। সঙ্গে সঙ্গেই চোখ মুখ খিঁচিয়ে বলেন—"শালা ডাকাত! দেখাচ্ছি মজাটা। এই! লে চল থানামে।"

"মাফ কর হুজুর! এই হামি কান মলা খাই! আর করুম না এমন কাজ। হুজুর! মা বাপ! আমাব পোলাপান্ না খাইয়া মোরবো। তাগো ছাখনের কেউ নাই। আমি হাপনার ছুক্ষ্যানি ছরণ ধোরত্যাছি, আমাগো ছাইড়া ছান্--আমাগো ছাইড়া ছান"—ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল কালীচরণ। সাথে সাথেই বীরা আর সোৎস্যা চোখে আঁচল দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। এই দেখে একটি বুড়ো সিপাইয়েব মনে দয়া হল। বোধ হয় বেচারার বাল বাচ্চা ছিল। সে এগিয়ে এসে জমাদার বাবুকে বলল—"এ বাবু সাহেব! ছোড়িয়ে—ছোড়িয়ে। ই লোগ একদম গঁওয়ার—বেঅকুফ হ্যায়।"

সাথী সহ কালীচরণ ছাড়া পেল। ভক্তিভরে মাটিতে পেন্নাম ঠুকে ফিরে গেল তারা নৌকায়।

এরই তিন চার দিন পরে। বড় ঘাসী নৌকাখানা সাভার বন্দরের ঘাটে ভিড়িয়ে কালীচরণ রান্না চাপিয়েছে। বীরা ও সোৎস্যা গেছে বন্দরে তেল নুন কিনতে। কিন্তু কয়েকদিন আগেই কাছে ভিতে একটা ডাকাতি হয়েছে। অচেনা মাঝি দেখলেই পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছে থানায়। ভাত চাপিয়ে কালীচরণ একমনে সুতো পাক দিচ্ছে উরুর কাপড় তুলে। এমন সময় দুজন সেপাই এসে তাকে ধরে থানায় নিয়ে গেল।

কালীচরণ থানায় গিয়ে দারোগার সামনের মাটিতে ভক্তিভরে

প্রণাম করল। দারোগা বাবু বার বার বক্রদৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে তাকে দেখলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমার নাম ?"

"আইগ্যা—খালীছরণ"—মাঝি জবাব দিল।

"বাপের নাম ?"

"আইগ্যা—শম্ভু।"

"তোমার বয়স কত ?"—দাবোগা বাবু প্রশ্ন করেন।

কালীচরণ একটু ভেবে নিয়ে চিন্তিত ভাবে বললে—"ইসে বয়সের কথা কন্ ? বয়স ঢের হইছে। এই বারচৌদ্দ হইতে পারে।"

থানা সমেত সকলে একযোগে হেসে উঠল। অপ্রতিভ হয়ে কালীচরণ কি যেন বিড় বিড় করে বলতে লাগল। হঠাৎ সে বলে উঠল, "হঁ্যা হুজুর! বারচৌদ্দই হইব। হেবার গাঁয়ে যখন খুব বাঘের ভয় হইছিল—হেই যে আমাগো লাপসী গাপসী ছাগলডা লইয়া গ্যাল গিয়া হেই বাবেই তো আমি তামাক খাওন শিখছিলাম।"

আবার একচোট হাসির ধূম পড়ে গেল থানায়। কালীচরণ বেকুবের মত খানিকটা এধারে ওধারে চেয়ে নিল। তারপর দাঁত ছুপাটি বের করে মিনতির সুরে বলল—"হুজুর! য়্যাড্ডা খতা খই। কোলক্যা নাই এহানে ? গলাডা শুখাইয়া কাড় হইয়া গ্যাছে গিয়া, প্যাড্ডা যেনি ফুল্ল্যা উঠছে"—

দারোগাবাবু এবারে নিঃসন্দেহে বুঝলেন কালীচরণ নিতান্তই বোকা মাঝি! সুতরাং ছেড়ে দিলেন তাকে।

নদীর আশে পাশের গ্রামে আরও কয়েকটা ডাকাতি হওয়ায় কোলকাতা থেকে একদল গোয়েন্দা এসেছে তদন্তে। একদিন তিন-জন সি, আই, ডি অফিসার নারায়ণগঞ্জ ঘাটে যে নৌকাখানি ভাড়া করল তার মাঝি হচ্ছে কালীচরণ। তাদের একজন জিজ্ঞাসা করল—"এই মাঝি! সাত্ত আট দিন আগে এই ঘাট থেকে পনর

কুড়ি-জন ভদ্দর লোকের ছেলে রাতে কোন নৌকাভাড়া নিয়েছিল ?”

“খী খন্ খরতা ?”—উল্টে প্রশ্ন করে কালীচরণ।

“একদল লোক গেছে এই ঘাট থেকে সাত আট দিন আগে ?” কালীচরণ কি যেন মনে মনে ভাবে। তারপর জবাব দেয়, “হ—হ—খরতা! গেছিল একদল লুক। বিয়ার দল। তাগো লগে কি সুন্দর বৌ আছিল!” সঙ্গে সঙ্গেই গুণ গুণ করে গান যুড়ে দিল “খুছরণ কন্যারে হে,ম্যাঘ বরণ ছু-উ-ল—”

বাবুরা সব হেসে উঠলেন। ইন্‌স্পেক্টরবাবু বললেন, ‘কন্যার কথাতেই মাঝির মন তেতে উঠেছে। ওহে মাঝি! কি নাম তোমার ?”

“আঁইগ্যা—খালীছরণ”।

“খালীছরণ ? আচ্ছা! তাই সই। বাবা খালীছরণ! তোমার বে হয়েছে বাবা ?”

“বিয়ার কথা খন্ ? কে দিব আমাগো মাইয়া ? গরীব লুক, পরের লাউত খাইট্ট্যা খাই,—বিয়া করণের টাহা পামু কৈ ? ছয় সাত কুড়িতো লাগবই।”—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বিষণ্ন মনে উত্তর দিল কালীচরণ।

“কি লোক তোমরা ?”—প্রশ্ন করেন ইনস্পেক্টরবাবু।

“আঁইগ্যা, নমামি।”

“নমামি ? সে আবার কি ?”

“হ খরতা—নম আমি”—বুঝিয়ে বলে কালীচরণ।

“আচ্ছা, কালীচরণ! এক বেটা পাঞ্জাবীকে ঘোরাফেরা করতে দেখেছ এধারে ? সেটা ডাকাত দলের সর্দার। যদি তাকে ধরে দিতে পার এত টাকা পুরস্কার পাবে সরকার থেকে, যে শুধু বিয়ে নয়, বৌ নিয়ে চিরকাল সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিয়েও দিতে পারবে।”

“হাচা কন্ বাবু ?”—আহ্লাদে বিকশিত-দন্ত কালীচরণ জিজ্ঞাসা করে।

"নিশ্চয় পাবে"—জোরের সাথে জবাব দেন ইন্‌স্পেক্টরবাবু।

সোৎসুকে কালীচরণ জিজ্ঞাসা করে—"কইতে পারেন হে হালার চেহারাডা কি রকম"?—

"ইয়া লম্বা, ভীষণ কালো, মাথায় পাগড়ী, লম্বা দাড়ি,—বেটা বাংলা, ইংরেজী, হিন্দী সবই চলনসই বলতে পারে"—বাবু জবাব দেন।

রথের মেলার শোলার মোল্লার মত মাথাটা বারকতক আলোড়ন কোরে—দাঁতে দাঁত চেপে মাঝি বলে—"হাচা খই বাবু! হালার পোরে পাইলে দ্যাখাইয়া দিমু কেমন 'নমামি'।"

ইনস্পেক্টরবাবু উৎসাহ দিয়ে বলেন—"যদি পার তবে দেশের জনে জনে বলবে, ধন্য তুমি 'নমামি'।"

দলের একখানি জরুরী চিঠি নিয়ে বিমান গেল গড়পাড়া গ্রামে। সেখানকাব মাইনর স্কুলের হেডমাষ্টাব শশীবাবুকে চিঠিখানা দিতে হবে। তিনি স্কুলের সেক্রেটারীবাবুব বাসায় থাকেন। সুতবাং খুঁজে বের করতে বেশী বেগ পেতে হ'লনা বিমানেব। শশীবাবুর গায়ের রং কালো, কিন্তু সৌম্যমূর্তি। সুগঠিত মুখমণ্ডলের দীর্ঘ দাড়ি এনে দিয়েছে বয়সোচিত গাম্ভীর্য ও প্রশান্তি। চিঠিখানা বিমানের হাত থেকে নিয়েই তিনি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—

"আসতে কষ্ট হয়নি তো?"

"না—কষ্ট আর কি!" ঈষৎ হেসে জবাব দেয় বিমান।

"নাম—কোথা থেকে আসছ কেউ জিজ্ঞেস করেনি?"

"কৈ না। করলে বলে দেব যা' তা।"

"বেশ"—বলেই চুপ করলেন শশীবাবু। তার পর বিমানের সামনেই খামখানি ছিঁড়ে চিঠি বের করলেন। তক্তপোষের উপর চিঠিখানি রেখে একখানি কাগজ আর একটি পেন্সিল নিয়ে আড়াআড়ি ভাবে কতকগুলি দাগ টেনে গেলেন। বিমান চিঠিখানার দিকে চেয়ে

দেখে কৈ কিছু তো লেখা নেই—একেবারে সাদা কাগজ। দাগটানা হয়ে গেলে শশীবাবু কাগজখানিতে অতি সাবধানে আগুন ধরিয়ে দিলেন সেটা পুড়িয়ে। এইবার পোড়া কাগজের উপর ভেসে উঠল হরপ। কিন্তু একি? এযে অঙ্ক—ইংরাজীতে লেখা আছে—

Simplify— $\frac{3}{5}\times\frac{7}{9}\times\frac{8}{4}-\frac{2}{7}$ ইত্যাদি

শশীবাবু সবটা টুকে নিলেন কাগজে। তারপর কাগজের ছক্‌কাটা ঘরগুলির মধ্যে বসিয়ে গেলেন A, B, C, D ইত্যাদি এলোমেলো ভাবে। এবার নীচে লিখে গেলেন চিঠির মর্ম। "Take care—Police on Track-Shift Namami" বিমান আর কিছু দেখতে পেলনা। শশীবাবু আর একটা তক্তপোষ দেখিয়ে বললেন,—"বড্ড পরিশ্রম হয়েছে তোমার! ঐখানে একটু গড়িয়ে নাও।"

বিমান বুঝল তার সামনে চিঠির মর্ম উদ্ধার করা শশীবাবুব ইচ্ছে নয়। সবে গেল সে। খানিকবাদে শশীবাবু বললেন—"নিশ্চয়ই খুব ক্ষিদে পেয়েছে তোমার। অনেকখানি পথ হেঁটেছ। তা' যে লক্ষ্মীছাড়ার দলে ভিড়েছ তাতে সবদিন যে খেতেই পাবে তাব কোন ঠিক নেই। যাক, আজ আছে কিছু সম্বল, খেয়ে নাও। ভাত হতে অনেক দেরী।"

একটা ঝুড়ির ভেতর থেকে তিনি বের করলেন পোয়াটেক চিড়ে। বললেন—"চিনি গুড় কিছুই নেই—তবে এ ফতুল্লার চিড়ে, মিষ্টি লাগে না।"—বলেই তিনি পথ দেখালেন একমুঠ চিড়ে মুখে পুরে। বিমান মহামুস্কিলে পড়ে গেল। বাড়ীঘরে থাকে সে। আহারে এরূপ কৃচ্ছ্রসাধন তার অভ্যাস নেই। সুধু চিড়ে পরম সন্তোষ সহকারে খেয়ে যাচ্ছেন একটা স্কুলের হেডমাষ্টার,—সেই বা না খেয়ে করে কি! সুতরাং একমুঠ চিড়ে মুখে পুরে দাঁতের কসরত জুড়ে দিল সে। খেতে খেতেই শশীবাবু বললেন—"তুমি কে জান তো?"

বিমান বুঝতে না পেরে চেয়ে রইল শশীবাবুর মুখের দিকে। চিড়ে চিবানো থেমে গেল।

শান্ত কণ্ঠে শশীবাবু বললেন—"তুমি আমার ভাগনে - নাম অবনী। আসছ ইদিলপুর থেকে মা'র অসুখের খবর নিয়ে,— আমাকে নিয়ে যেতে। কিন্তু—তোমার পৈতে আছে তো? আমরা যে বামুন।"

বিমান এবার সব বুঝতে পেরে ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিল। তার মনে খুব আনন্দও হল। এই গোপনতা,—এইরূপে নিজেকে বিলিয়ে দেয়া দেশের কাজে,—নাম নেই,—পরিচয় নেই—আছে শুধু তন্ময়তা —নীরব সাধনা, — আঁধার-ঘেরা আরাধনা, —একি কম গর্বের!

রাত্রি প্রায় একটার সময় শশীবাবুর সাথে সে রওনা হ'ল ঢাকা অভিমুখে। হেঁটে হেঁটে চলছে তারা। প্রায় তিন ঘণ্টা চলার পরই—শশীবাবু বললেন, "গাডা শির্ শির্ কোরত্যাছে—জ্বরই কি আসে!"

কিছু পরেই প্রবল বেগে এল জ্বর। শশীবাবু ঠক্ ঠক্ করে কাঁপেন—আর পথ চলেন! ভোরের পর যতই বেলা বাড়ে—ততই জ্বর বাড়ে। ধুঁকতে ধুঁকতে এক গাছতলায় শুয়ে পড়লেন তিনি। বিমান মহামুস্কিলে পড়ে গেল। কি করে সে এখন? হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। কাছে ছিল একটা নালা, এক দৌড়ে নালার কাছে গিয়ে—গায়ের জামা খুলে সেটা ভিজিয়ে এনে শশীবাবুর মাথায় নিংড়ে নিংড়ে জল দিতে লাগল। প্রায় পনর কুড়ি মিনিট পরে শশীবাবু চোখ মেলে চাইলেন। বললেন—"পিপাসা—জল।" বিমান আবার ছুটে গেল নালার ধারে। জামাটা বেশ করে ভিজিয়ে এনে নিংড়ে জল দিল শশীবাবুর মুখে।

"চল—এখন যাই" বলে শশীবাবু উঠে খাড়া হলেন। আবার সুরু হল পথ চলা। কয়েক মাইল গিয়ে তিনি শুয়ে পড়লেন। বিমান আবার জামা ভিজিয়ে জল এনে তাঁর মাথায় নিংড়ে দেয়,—তাঁর মুখে

দিয়ে পিপাসা মেটায়। সংজ্ঞা ফিরে এলে বিমানের দিকে চেয়ে শশীবাবু সস্নেহে বললেন, "বড়ই মুস্কিলে পড়েছ তুমি। কি আর কই। আমার শরীরডা এক্কেবারেই অকেজো হইয়া গ্যাছে! আজ আমার কত কাজ,—আজ কি জ্বর হওন উচিত!"

বিমান আশ্চর্য হয়ে গেল শশীবাবুর ধরণ দেখে। জ্বর হয়েছে,—সেটাও যেন মস্ত অপরাধ। গ্লানিতে আপশোষে তাঁর সমস্ত অন্তরটাই যেন ভরে গেছে।

গভীর রাতে তারা পৌঁছাল ঢাকায়। বিমান নিজের বাসায় চলে গেল। যাবার আগে শশীবাবু তার পিঠে সস্নেহে হাত বুলিয়ে বললেন, "ঢের কষ্ট পাইছ আমারে লইয়া। এখন যাও গিয়া।"

পরদিন সন্ধ্যার সময় বিমান একখানি বইয়ের খোঁজে সদর ঘাট লাইব্রেরীতে গিয়ে শুনতে পেল প্রায় আধঘণ্টা আগে বুড়ীগঙ্গার ধারে একজন সি, আই, ডি অফিসার খুন হয়েছে। আততায়ীকে অনেকেই দেখেছে। তার নাক লম্বা, দাড়ি আছে। তাকে ধরার জন্যে কয়েকজন নাকি এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু লোকটি এমনই আশ্চর্য যে কয়েকটা ফাঁকা আওয়াজ করে দাড়ি নাড়াতে নাড়াতে গম্ভীরসে পাড়ি দিয়েছে।

এই ঘটনার দুইদিন পরে কোলকাতার ইডেনগার্ডেনে একখানি বেঞ্চে একটি লোক বসে বসে কাশ্‌ছে। শুকনো মুখ,—ময়লা পোষাক, রুক্ষ চুল দাড়ি, চোখে মুখে একটা হতাশার ভাব। হরদম কেশেই চলেছে সে। ইতিমধ্যে একটি আই, বি স্পাই এসে বেঞ্চের অপর প্রান্তে বসে চেয়ে চেয়ে দেখছে কেশো রোগীটিকে। দাড়ির দিকেই তার বিশেষ মনোযোগ। খানিকটা ইতস্ততঃ করে সে দাড়ি-ওয়ালাকে জিজ্ঞেস করল, "আপনার নাম কি?"

লোকটি তখন রীতিমত হাঁপাচ্ছে। একটু দম নিয়ে বললে সে—"নাম ব্র—জ—"

পরবর্ত্তী অংশটুকু ঢেকে দিল কাশিতে।

স্পাইটি প্রশ্ন করল—“অসুখ নাকি ?”

লোকটি মাথা ঝাঁকিয়ে জানাল “হ্যাঁ।” তারপর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে বললে, “থাইসিস্ বলে সকলে সন্দেহ করে।”

এবারে স্পাইটি উঠে দাঁড়ালো। সহানুভূতির সুরে বললে—“বড় পাজি জিনিস! ভীষণ ছোঁয়াচে। খবরদার যেন বে থা করবেন না।”

আবার ফাঁৎ করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে দাড়িওয়ালা। থম্‌থমে ভারী গলায় সে বললে—“আমার দুই বিয়ে, এখন ভরসা”—আকাশের দিকে তর্জনী নির্দেশ করল সে।

স্পাই প্রভু দৃষ্টিপথের বাইরে গেলে জলের ধারে বসা একটি যুবকের কাছে উঠে গেল লোকটি। যুবকটি একখানা চিঠি দিল তার হাতে। খুলে পড়ে দাড়িওয়ালা বললে—“শশাঙ্ক বাবুকে বোলো আজ রাতেই আমি পূর্ববঙ্গে চলে যাব। তিনি যেন চন্দননগরে যেয়ে পূব আর পশ্চিমের বিষয় সব ঠিক করে আসেন।”

যুবকটি প্রশ্ন করল—“আপনার নাম কি বলব ?”

একটু ভেবে নিয়ে দাড়িওয়ালা উত্তর দিল, “শশীবাবু।”

দুজনে দুদিকে চলে গেল।

সপ্তাহ দুই পরে।

নারায়ণগঞ্জে বিরাট আলোড়ন। শহরে জোর গুজব ঢাকায় ডাকাত দলের নেতা ধরা পড়েছে। প্রকাণ্ড তার দাড়ি। এই দাড়িওয়ালাই পাঞ্জাবী সেজে ডাকাতি করত। সদর ঘাটের খুনও করেছে সে। তার কাছে নাকি একটা ‘হুইসেল’ পাওয়া গেছে। শহর ভেঙ্গে লোক ছুটছে কোর্টের দিকে। আজ তাকে নারায়ণগঞ্জ কাচারীতে হাজির করা হবে। “পাঞ্জাবী ডাকাত”, “সদরঘাটের খুন” প্রভৃতি গুজবে বিমানের মনেও জেগেছে কৌতুহল। সেও গিয়েছে কোর্টে। গিয়ে দেখে আদালত প্রাঙ্গনে পুলিশ আর সি,

আই, ডি গিজ গিজ করছে। ঠিক এগারোটার সময় হাতে হাতকড়ি, কোমরে দড়ি বেঁধে পুলিশ দস্যু সর্দারকে কাচারীতে নিয়ে এল। ভীড়করা জনতা পুলিশের ধমক খেয়ে সরে গেল দূরে। এবার স্পষ্টই দেখা যায় পুলিশ ডাকাতটিকে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে কাঠগড়ার দিকে। কিন্তু তাকে দেখেই বিমান বিস্ময়ে দিশেহারা হয়ে গেল। একি!? এযে শশীবাবু!!!

বিমানের পাশেই দুজন সি, আই, ডি অফিসার আলোচনা করছে নিজেদের মধ্যে। একজন বলছে—"খুব ধরা পড়ে গেছে যা হোক। খবরটা না পেলে এর গায়ে কিন্তু হাতও দিতাম না আমরা। খুব বাহাদুর বটে!" অপর একজন বললে—"বাহাদুব বলে বাহাদুর! এই তো কয়েকদিন আগে ইডেন গার্ডেনে কি শেয়াল ফাঁকিটাই দিয়েছে আমাকে। খক্ খক্ কাশি। বলে কিনা থাইসিস্, তারপর আবার ডবল বিয়ে। ফলে আমাকে বোকা বানিয়ে ভেগে এসেছে। দাড়িটা দেখে আমার মন উস্‌খুস্ করছিল। কিন্তু থাইসিস্ আমাকে ফাঁকি দিল। পাঁচ হাজার টাকা পুরষ্কার হাত ছাড়া হয়ে গেল।"

প্রথম জন আবার বললে—"কিন্তু যাই বল ভাই এরা মানুষ না দেবতা ভেবেই পাইনে। এত বড় একটা লোক, আদর্শ চরিত্র বলে বিপ্লবীরা যাকে শ্রদ্ধা করে অন্তর দিয়ে,—সেই ত্রৈলক্য চক্রবর্ত্তী কিনা নৌকাচুরি করে জেল খেটেছে। বাইরে এসে মাঝি সেজে ঝড়, বাদল, শীত, গ্রীষ্ম উপেক্ষা করে মাসের পর মাস কাটিয়েছে নদীর বুকে, পাঞ্জাবী সেজে করেছে ডাকাত দলের নেতৃত্ব, কিছুদিন আগেই ঢাকায় সাফাই হাতে বিকেল বেলা খুন করেছে, আমাদেরও দিয়েছে ফাঁকি, নাম বলেছে "খালীছরণ", জাত বলেছে "নমামি"—

বিমানের মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল। অপাব বিস্ময় তার মনে। দৃষ্টি তার ঝাপসা হয়ে এল, কানে পৌঁছে না কোনো কথা —মনের মধ্যে লণ্ডভণ্ড এলোমেলো ভাব। কিছু পরে সে যেন সম্বিত ফিরে পেল আদালতের পিয়নের হাঁক-ডাকে। অদ্ভুত ব্যাপার!

মাঝি কালীচরণ নিরক্ষর গেঁয়ো লোক—যে নিজের নামটাও শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারে না,—যাকে সে স্পাই বলে ঠাউরেছে—সেই কিনা ত্রৈলক্য চক্রবর্ত্তী! যাঁর নাম শুনেছে সে অজস্র বার, যাঁর দেবোপম চরিত্র,—নির্বাক নিষ্ঠা যুবকের দলে যোগায় পথের প্রেরণা। তিনিই আবার পাঞ্জাবী সেজে য়্যাক্‌শন পরিচালনা করেছেন; তালতলার ডাকাতিতে তো বিমানের হাতই চেপে ধরেছিলেন! কিন্তু নৌকায় ফিরে কালীচরণ মাঝিকে তো যথাস্থানেই দেখেছে বিমান। তারপর সদর ঘাটের খুন! এ যে অসম্ভব ব্যাপার! অসুস্থ শশীবাবুকে গড়পাড়া থেকে সেই তো ঢাকায় নিয়ে এসেছে। শশীবাবুই কি কালীচরণ? তিনিই কি পাঞ্জাবী নেতা? কোন মীমাংসার সূত্র খুঁজে পেলনা তার মন। কাঠগড়ায় আসামীর দিকে বার বার চেয়ে দেখল সে। মনে হল তার, সব মিথ্যে অথবা ভোজবাজী। এ যে শশীবাবু—গড়পাড়া স্কুলের হেড মাষ্টার শশীবাবু। ঐ তো বিমানের দিকে আড় চোখে চেয়ে চেয়ে হাসছেন তিনি,—ঈঙ্গিতে বলছেন—"চলে যাও চলে যাও।" এই শশীবাবুই কি নিরক্ষর মাঝি কালীচরণ, পণ্ডিত আর মূর্খের যুগপৎ প্রকাশ? তিনিই আবার য়্যাকশানের অধিনায়ক এবং হত্যাকারী? শান্ত শশীবাবুই ভয়াল দস্যু— নির্মম হত্যাকারী?

বিমানের চিন্তা খেই হারাল। হাটের কোলাহলে থমকে দাঁড়াল চৌরাস্তায় এসে। দিশেহারা অভিভূতের মত যখন সে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল কাচারী ঘর থেকে তখন তার মুহ্যমান সমগ্র চেতনা জুড়ে ওতপ্রোত ভাবে সঞ্চারিত হচ্ছে একটি মাত্র ধ্বনি—নমামি—নমামি—নমামি।

দিব্য-দৃষ্টি

অনুশীলন সমিতির স্রষ্টা মহানায়ক ব্যাবিষ্টার, পি, মিত্রের ডান হাত শ্রীযুত পুলিন বিহারী দাস। সমগ্র পূর্বাঞ্চলের ভার তাঁর ওপর। তাঁব সার্থক নেতৃত্বে ও কর্মকুশলতায় পূর্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে সমিতিব শাখা প্রতিষ্ঠা হয়েছে। দলে দলে যুবক সমিতির সভ্য হয়েছে। সমিতির কর্মধারা—লাঠিখেলা অসি চালনা, কৃত্রিম যুদ্ধ, বেপবোয়া সাহসিকতা সমস্ত দেশটাকে উদ্বেল করে তুলেছে। পুলিনবাবু নিজেব যথা সর্বস্ব—এমনকি স্ত্রীর গয়না পর্যন্ত বিক্রি করে সমিতির ব্যয় নির্বাহ কবেন। কিন্তু তাতেও প্রয়োজন মেটেনা। তাই অবশেষে উপায়ান্তর না দেখে ডাকাতি সুরু করেছেন। এতে সবকারী নির্যাতনেব পথ প্রশস্ত হল বটে, কিন্তু খুন, ডাকাতিব জন্যে দুঃখ বরণ, বীরত্ব, সাহসিকতা, ফাঁসি, জেল সবটাতে মিলে একটা রোমান্টিক আকর্ষণের সৃষ্টি করল যুবক মহলে। এতে কর্মীও যাচাই হয়ে যেত। যাদেব মন দুর্বল,—ভীরুতা আছে অন্তরে—তারা ছুতো নাতা ধরে সরে পড়তো।

পুলিশের সন্ধানী দৃষ্টি সত্ত্বেও সমিতি বেড়েই চলেছিল।

তারপর এল আঘাত। পুলিনবাবুকে ধরে নিয়ে গেল—সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হল। পুলিনবাবুর সহকারীদের মধ্যে কুশাগ্রবুদ্ধি শ্রীমাখনলাল সেনের ওপর নেতৃত্বের ভার পড়ল। তিনি সমিতির কেন্দ্র ঢাকা থেকে কোলকাতায় নিয়ে এলেন। এবারে চন্দননগরের শ্রীমতিলাল রায় ও শ্রীশ্রীশ ঘোষের দলের সাথে অনুশীলন সমিতি একেবারে মিলে গেল।

কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই মাখনবাবুর নেতৃত্ব সম্বন্ধে কোন কোন বিশিষ্ট কর্মীর মনে সন্দেহ দেখা দিল। তাদের মনে হল মাখনবাবু সমিতির বৈপ্লবিক গতির মোড় ফিরিয়ে দিচ্ছেন,—

সমিতিকে রামকৃষ্ণ মিশনের লেজুড় করে গড়ে তুলেছেন। কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করার ভরসা পায়না। "নেতার আদেশ অবিচলিত চিত্তে মানতে হবে" এই অনুশাসনের তলে বিপ্লবকর্মী যুবক দলের বিদ্রোহী মন নিয়তই গুমরে মরে।

বুদ্ধিমান মাখনবাবু এই ধূমায়িত বিদ্রোহের আভাস পেলেন। তিনি দলের বিশিষ্ট কর্মীদের ডেকে খোলাখুলি আলোচনা করলেন। সবলের সামনে স্পষ্ট করে বললেন, "আমরা চাই দেশের মুক্তি। আমাদের হতে হবে আদর্শ সন্ন্যাসী। খুন ডাকাতির দুর্নীতি যদি আশ্রয় করি, এই নৈতিক অপরাধেই আমাদের সব আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যাবে। দেশের লোকও আমাদের খুনী ডাকাত বলেই জানবে। তাদের সমর্থন, সহানুভূতি হারাব আমরা।"

মাখন বাবুর কথা শেষ হতে পেলনা। একটি কৃষ্ণকায় যুবক মাঝ পথে প্রতিবাদ জানাল। শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলল—"আমি একটা কথা জিগাই। পুলিনবাবু যখন নিজের যথা সর্বস্ব, এমনকি স্ত্রীর গয়না পর্যন্ত বেইচ্চ্যা সমিতির কাজ চালাইলেন তখন সকলেই তেনারে বাহবা দিলেন,—আমাগো ভিক্ষার ঝুলিতে বিশেষ কিছু তো দেন নাই। তাই না শ্যাষে বাধ্য হইয়া পুলিন বাবু ডাকাতির পথ লইছিলেন। আমার মনে লয় ভিক্ষায় চলতে পারে রামকৃষ্ণ মিশন, —বিপ্লবের আয়োজন চলন সম্ভব নয়।"

Pin drop silence, সকলে নীরবে চেয়ে দেখল এই যুবকটিকে, যার কণ্ঠে নেতার আচরণের প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেছে। এইবার ফিস্ ফাস্ করে প্রচারিত হল যুবকটির পরিচয়,—সরকারী কর্মচারী—জবরদস্ত ডেপুটি ইনস্পেকটর অব স্কুলস, প্রভাত সেনের পুত্র, ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে, জি, গুপ্তের ভাগনে—ঢাকার নরেন সেন।

মাখনবাবু বললেন—"নীতির কথা না হয় বাদই দিলাম। কিন্তু ডাকাতিতে কি আমরা জনসাধারণের সহানুভূতি, সমর্থন হারাব না ?"

"না—হারাইতামনা।" উত্তর দিল যুবকটি "আমরা জানি খুন,

ডাকাতি আমাগো লক্ষ্য নয়। ইয়ার লাইগা পুলিশ আমাগো পিছনে লাগব—হেও মানি; কিন্তু করুম্ কি? কে দিব আমাগো টাকা? জনসাধারণের সমর্থন হারাইবার ভয় মিছাই করি। কারণ ধনী, জমিদার, মহাজন—যাগো বাড়ী আমরা ডাকা দিমু—তাগো গরীব জন সাধারণ ভাল চক্ষে দ্যাখেনা। তাগো লুটলে সাধারণ লোক খুশীই হইব। আর খুনের কথা কন্! আমাগো পথে যারা বাধার সৃষ্টি কোরব—তাগো সরাইতে হইব। আরো যে সব কর্মচারী অত্যাচারে অত্যাচারে জনসাধারণরে তাতাইয়া তুলছে তাগো সরাইলে সকলের সমর্থনও পামু—প্রচারও হইব।"

চাপা গুঞ্জন ধ্বনি দ্বারা বেশীর ভাগ কর্মীর হৃষ্ট সমর্থন লাভ করল নরেন সেনের উক্তি। মাখনবাবু তা বুঝলেন। বললেন—"জানিনা সকলেই এমত সমর্থন করে কিনা। যদি করে তা হ'লে চলতেই হবে আমাকে ভিন্ন পথে। কারণ সমাজের নীতি বিরুদ্ধ পথে চলার কোন সার্থকতা—আমি খুঁজে পাইনা।"

মাখনবাবু সরে গেলেন। একদল বিশিষ্ট কর্মী যাঁরা মাখনবাবুর নীতিতে আস্থাবান ছিলেন, তাঁরাও সরে গেলেন সাথে সাথেই। এঁদের মধ্যে শ্রীসতীশ দাসগুপ্ত, শ্রীপ্রিয়নাথ দাসগুপ্ত, শ্রীদীনেশ মুস্তফি ও শ্রীনগেন সরকার রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিলেন। মিশনে যোগদান করে বিদেশে গিয়ে ভারতের অনুকূলে প্রচার কার্য চালানো ও অর্থ সংগ্রহই ছিল প্রাথমিক উদ্দেশ্য। কিন্তু গেরুয়ার মাহাত্ম্যে মনও তাঁদের বদলে যায়,—তাঁরা পরে মিশনের বড় বড় সন্ন্যাসী হয়ে পড়েন।

নরেন্দ্রনাথ এইবার তাঁর সহকর্মী ত্রৈলক্য চক্রবর্ত্তী, প্রতুল গাঙ্গুলী, রমেশ চৌধুরী, রমেশ আচার্য, জ্ঞান মজুমদার, রবি সেন, মদন ভৌমিক, নগেন দত্ত, ফেগা রায়, যোগেন চক্রবর্ত্তী, অমৃত সরকার প্রভৃতির সহযোগে দলটি গুছিয়ে নিতে লাগলেন। জীবন ঠাকুরতা, আশু কাহিলী প্রভৃতি পালংয়ের বিশিষ্ট কর্মীরা কিছুকাল চিত্তদোলায় দুলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন নরেন সেনের সাথে। নীতিগত প্রশ্নের দমকা হাওয়ায়

সমিতির তরণী হাবুডুবু খেতে খেতে রক্ষা পেল নরেন্দ্রনাথ ও তাঁর সহযোগিদের ঐকান্তিক বৈপ্লবিক আগ্রহে। এই প্রবল ধাক্কায় দলের সজীবতা প্রায় আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সে আড়ষ্টভাব কাটানোর জন্যে পর পর কয়েকটা ডাকাতি ও খুনের ব্যবস্থা করলেন নরেন্দ্রনাথ। গোয়ালন্দের প্ল্যাটফরমে য়্যালেন সাহেবকে গুলী, নগেন্দ্র দত্তের (গিরিজাবাবু) পরামর্শক্রমে চট্টগ্রাম সীতাকুণ্ডের ব্যভিচারী মোহান্তকে হত্যা, শ্রীহট্টে জগৎশী অরুণাচল আশ্রমের সন্ন্যাসীদের গুলী করে হত্যার প্রতিশোধে মহকুমা হাকিম গর্ডন সাহেবকে হত্যার উদ্যোগ এই সময়ই অনুষ্ঠিত হয়।

সেদিনে নরেন্দ্রনাথের বৈপ্লবিক অগ্রগতির এই প্রচেষ্টা ধন্য হয়েছিল তাঁর মাতার আশিস্‌ধারায় স্নাত হয়ে। সরকারী কর্মচারীর বাড়ী। সদর দোরে ভারী কড়াকড়ি। কিন্তু খিড়কীর দোর খোলা। দুপুর রাত পর্যন্ত কখনও খিড়কীর দোর দিয়ে—কখনও প্রাচীর টপকে দলের ছেলেরা অন্দরে প্রবেশ করে,—আর চাপা গলায় ডাকে—"মা! মা! খিদা লাগছে—খাইতে ছ্যান্।" নরেন্দ্র জননী চোখ মুছতে মুছতে উঠে এসে ভাত বাড়েন আর বলেন—"সময় মত খাইতে পার না? আয়নায় ছ্যাখছনি চেহারাডা! কি হইয়া গ্যাছে গিয়া! শরীর খুয়াইলে ছ্যাশের কাম করবা ক্যামতে?" মাঝে মাঝে প্রকাণ্ড একখানা থালার চার পাশে খেতে বসে এই হতভাগার দল। কেউ বলে "এ যে পূজার থালা!" জননী স্নেহগদগদ কণ্ঠে বলেন, "আমার পোলারা যে ছ্যাবতা! তাই না দিছি পূজার থালা!" স্নেহে, করুণায় তাঁর চোখ ছল্ ছল্ করে ওঠে। মরু যাত্রীরা মরুদ্যানের সন্ধান পেয়ে ধন্য হয়।

ফরিদপুর জেলায় ঘরিসারে য়্যাকশানের প্ল্যান করা হয়েছে। আয়োজন সম্পূর্ণ। এই সময় খবর পাওয়া গেল নদী থেকে বেরিয়ে যে খাল দিয়ে নৌকা যাবে সেখানে জলপুলিশ মস্ত ঘাটি বসিয়েছে। সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। কে কে যাবে তাও ঠিক। এতদূর অগ্রসর হয়ে প্রশ্ন উঠলো এই য়্যাক্‌শানে হাত দেয়া হবে কিনা। বীরেন্দ্র

চ্যাটার্জি বলল—“ফুঃ—তোর জল পুলিশ! জল-পুলিশরে জল-সই করুম্। বাহ্বার লড়াই আবার হইব ভাবতেই আনন্দে মনডা আমার নাইচ্ছ্যা ওঠে। সামনেই তো হোলি। জলের মধ্যে পুলিশের লগে হোলি খেলা খুব মজাদার লাগব। রংমে কেইসে খেলু হুলিয়া পুলিশোয়াকে সঙ”—গান জুড়ে দিল বীরেন। সকলে উঠলো হেসে—গম্ভীর হলেন নরেন সেন। তিনি রবি সেনকে ডেকে বললেন, “যে যে যাইব,—তা গো মত লও।”

হেসে বীরেন বলল—“ইসে তাজ্জব বানাইলেন দেখত্যাছি! ডাকাততে গণতন্ত্র,—ভোটাভুটি! হে প্রেভু যীসু! টুমি হামাডের রক্ষা কর!” আবার সমবেত হাসি। নরেন বাবু কিন্তু অচল অটল। বললেন “এডা ডাকাতিতে গণতন্ত্র নয়—দলে গণতন্ত্র। যে জিনিষ প্রতিষ্ঠার তরে আমাগো লড়াই তার গোড়াপত্তন হইব আমাগো দিয়াই!” হেসে বললেন—“সকলরে লইয়াই সমিতি—সমিতিও সক্কলেরই। সব কিছু কাজকর্ম যদি একমাত্র আমার মতেই হয় তা' হইলে তো এহ্যাশে রাজতন্ত্র কায়েম হইব,— আমি রাজা হমু গিয়া!”

বীরেন এবার নাটকীয় ভঙ্গীতে বলল—

“হে আর্য! বিধিমতে জনমত কর নিরূপণ—
নাহি তাহে বাধা;
কিন্তু এই দীন সেবকের, আছে শুধু একটি বি॰ ন—
‘দাদা আর গদা’।”

হো হো করে সকলে হেসে উঠল। নরেন বাবু বিরক্ত হয়ে বললেন—“থাম্ বীরা।” পরক্ষণেই তিনি হেসে বললেন—“পাজিডার উপর রাগ করণও মুস্কিল! মুখ ভ্যাঙ্গায়।”

সকলের মত নেয়া হ’ল। প্রায় সকলেই একবাক্যে সম্মতি দিল ডাকাতির পক্ষে। ডাকাতিও হ’ল,—টাকাও এল। এলনা শুধু বিপদ। আশেপাশে অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে এ খেয়ালই যেন নেই প্রভুদের।

একদিকে নরেন সেনের নেতৃত্বে খুন আর ডাকাতির বহর লেগে যায়,—অন্যদিকে বিশিষ্ট কর্মীদের আরও অনেকে দলত্যাগ করে। এবারে যাঁরা সরে গেলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (খ্যাতিমান্ নাট্যকার), শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ (পঃ বঙ্গের প্রাক্তন মুখ্য মন্ত্রী) ও শ্রীললিত বারড়ী। সকলেরই দলত্যাগ নীতিগত প্রশ্নে। নরেন বাবু কিন্তু বিচলিত হলেন না। মরণ মারণের ভীতি-শঙ্কুল বিপ্লববহুল কর্মধারায় তিনি প্রত্যেকটি কর্মীকে যাচাই করে নিতে চান। একবার এক ডাকাতিতে তিনি নিজেও যাবেন স্থির করেছেন। রবি সেন আর অমৃত সরকার আপত্তি করে বললেন—"আপনার যাইয়া কি দরকার? আমরা তো আছিই! সমিতির সব কিছু অখন আপনার উপরেই নির্ভর করত্যাছে।"

"ভুল ভুল-রবি! তোমরা মস্ত ভুল করত্যাছ। তোমাগো সমিতির নেতা নৈবেদ্যের কলা নয়। সাহসে, বীর্যে, বুদ্ধিতে, ত্যাগে তার প্রমাণ করতে হইব যে সে নেতা হওনের যোগ্য। আর আমাগো বিপ্লব দল—গণতান্ত্রিক দল। জনে জনে সকলে মিইলা হের নেতা। চলতি গণতন্ত্রের লগে আমাগো difference এই যে আমাগো নির্বাচন নাই ভোটাভুটি নাই। কাজের মধ্যে দিয়া যোগ্যতার জোরে একজন আর একজনরে ছাড়াইয়া যায়। কাজের মধ্য দিয়াই বিভিন্ন অঞ্চল হইতে যোগ্যতর কর্মীরা নেতৃমণ্ডলে আইয়া পৌঁছায় অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মে।"

কোলকাতার রাজাবাজার অঞ্চলে একখানি বাসা। লিণ্ডিয়া আইস্ ফ্যাক্টরীর মেকানিক অমৃত হাজরা থাকেন সেখানে। তাঁর দলীয় নাম শশাঙ্ক। এই বাসায় মাঝে মাঝে বিভিন্ন প্রদেশের বিপ্লবী নায়কগণ এসে সমবেত হন। চন্দননগর থেকে শ্রীমতিলাল রায়, শ্রীশ্রীশ ঘোষ, মনীন্দ্র-নায়েক প্রভৃতি নেতারা প্রায়ই সেখানে আসেন।

উত্তর ভারত থেকে রাসবিহারী বসু, শ্রীশচীন্দ্র সান্যাল, শ্রীমন্মথ বিশ্বাস, শ্রীবসন্ত বিশ্বাস প্রভৃতিকেও মাঝে মাঝে দেখা যায়। শশাঙ্কের নেতৃত্বে বাসায় হরদম বোমা তৈরী হয়। চন্দননগর থেকে শ্রীমনীন্দ্র নায়েক মাঝে মাঝে এসে তত্ত্বাবধান করে যান। তিনিই বোমা তৈরীর ওস্তাদ।

১৯১১ সালের মধ্যভাগে একদিন এক টিকিধারী—পশ্চিমে যুবককে বাসার সামনে দেখা গেল। সে যেন কাকে খুঁজছে। মুণ্ডিত মস্তক, মোটা একগোছা টিকি, হাঁটুর উপর ধুতি—অথচ গায়ে লম্বা কোট। বেশ দেখাচ্ছিল তাকে। বাসার ওপর বাইরে থেকে নজর রেখেছিলেন রবি সেন। তিনি পশ্চিমেটীর গতিবিধি দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "কেয়া মাংতা ?"

লোকটি একদৃষ্টে রবিবাবুকে দেখে নিল। তারপর চাপা গলায় বলল—"আপনি রবিবাবু না।"

রবিবাবু ঘাড় নেড়ে জানালেন "হ্যাঁ"। লোকটি বললে—"আমি শচীন সান্যাল। কাশী থেকে আসছি। রাসুদাও এসেছেন। বিশেষ প্রয়োজন।"

উভয়ে বাসায় ঢুকলেন। সন্ধ্যার পর জরুরী মন্ত্রণা সভা বসেছে। শ্রীশবাবু, রাসবিহারী চন্দননগর থেকে এসেছেন।

রাসুদা বললেন—"দিল্লীতে সাড়ম্বরে দরবার হওয়া ঠিক হয়েছে। এই অবসর। একটা কিছু করতেই হবে এবারে। বড়লাট হার্ডিঞ্জের উপর যদি বোমা মারি সারা ভারত কেঁপে উঠবে সে আঘাতে। বৃটিশের সাধের সাম্রাজ্যেও থরহরি কম্প দেখা দেবে।"

চিন্তিত ভাবে নরেনবাবু বললেন—"কিন্তু এডা যে একেবে সন্ত্রাসবাদ, শ্যাষে সন্ত্রাসবাদের অতল জলে বিপ্লবের কল্পনাডা ডুব্যা মরব না তো ? আমাগো সর্বদাই হুঁসিয়ার রইতে হইব,—মরণ-মারণের নেশায় ভাইস্যা না যাই !"

রাসবিহারী বললেন—"হোক এটা সন্ত্রাসবাদ। বিপ্লববাদ প্রচারের

জন্যে প্রয়োজন আছে এর। সমস্ত দেশটা ঘুমে অচেতন! তাকে জাগাতে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনির দরকার। তারপর বিভিন্ন দেশে হবে এর প্রতিক্রিয়া। জগত বুঝবে ভারত সুখে শান্তিতে আছে বলে ইংরেজরা যে অপপ্রচার করে,—সেটা মিথ্যা। তারপর আমাদের দেশের নেতারা বছরের পর বছর যে সব দাবী জানাচ্ছেন সরকারের কাছে— যাকে লক্ষ্য করে ঘৃণায় উপেক্ষায় কার্জন বলেছে "Let the dogs bark,—the caravan passes on!" তার দিকেও কার্জনী প্রভুদের দৃষ্টির মোড় ফিরবে;—বুঝবে তারা কুকুর শুধু ঘেউ ঘেউই করেনা,—কামড়ায়ও।"

শান্তভাবেই নরেন বাবু বললেন, "হ—এইডা ঠিক কইছেন। আমাগো প্রত্যেক কর্মই বিচাব করণ লাগব বৈপ্লবিক মূল্য দিয়া। অগ্রগতি আমাগো সব কাজের কষ্টিপাথর। এই কাজ দ্বারা যদি বিপ্লববাদের প্রচার বা প্রসার হয়,—নিচ্চয় তাতে হাত দিমু আমরা।"

সকলেই হৃষ্টচিত্তে রাসবিহারীর প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। তিনি আর শচীন বাবু কয়েকটি বোমা নিয়ে ফিরে গেলেন উত্তর ভারতে।

দিল্লী দরবারের দিন। বিরাট মিছিল। কাতারে কাতারে লোক মিছিল দেখতে এসেছে। ছাদের উপর পুরনারীরা বিচিত্র বসনে সজ্জিত হয়ে মিছিল দেখছে। রাসবিহারীও এসেছেন মিছিল দেখতে। তাঁর সাথে নারীবেশে বসন্ত বিশ্বাস। বসন্ত একটি ছাদের ওপরে উঠে মহিলাদের মধ্যে মিশে গেল।

হাতী চড়ে লেডী হার্ডিঞ্জ সহ বড়লাট আসছেন। অজস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে—"Long live the king—God save the king," ব্যাগপাইপেও বেজে উঠছে ইংলণ্ডের জাতীয় সঙ্গীত। ছাদ থেকে নারীরা হুলুধ্বনি দিচ্ছে,—পুষ্পবর্ষণ করছে বড়লাট দম্পতির উপর।

বড়লাট ঠিক যখন বসন্তর মুখোমুখী এসেছেন বসন্তর আঁচল নড়ে উঠল। পাশের একটি মহিলা সে দিকে চাইতেই বসন্ত বলল—"কেয়া তামাশা দেখো বহিন—সামনে নজর রাখো।" মহিলাটি যেমনি সামনে তাকিয়েছেন—অমনিই প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ ও আর্তনাদ। ভীতি বিহ্বল নরনারী হুড়দাড় করে পালাতে লাগল। বসন্তও নেমে এসে দূরে বাসবিহারীর সাথে মিলিত হ'ল।

বোমার বিস্ফোরণে ঘর বাড়ী সব কেঁপে উঠেছিল। সেই সাথে কেঁপেছিল ইংরাজের সুখের ঘর।

পুলিশ মহলের পীলে চমকে উঠেছে। বাংলা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্তা বসন্ত চাটুয্যে উঠে পড়ে লেগেছেন বিপ্লবী-নিধনে। পূর্ববঙ্গে তখন জোর চলেছে কাজ। চাটুয্যে মশাই ছুটে এসেছেন ঢাকায় ষড়যন্ত্রের মূল সূত্র আবিস্কার কোরতে। কিন্তু ব্যাপারটা যতই গোপন হোক নরেন সেনের কানে আগেই পৌঁছেছে। হঠাৎ সদর ঘাটে সন্ধ্যার সময় দু'জন সি, আই, ডি কর্মচারীর সাথে চাটুয্যে মশাই আক্রান্ত হলেন। একজন পড়ে গেল গুলী খেয়ে—চাটুয্যে মশাই বুড়ীগঙ্গায় ঝাঁপ মেরে সে যাত্রা বেঁচে গেলেন।

কিন্তু এখানেই আক্রমণের সমাপ্তি ঘটল না। একদা সন্ধ্যায় কোলকাতার মুসলমানপাড়া লেনে অবস্থিত তাঁর বাসায় বোমা পড়ল। তিনি দৈবক্রমে রক্ষা পেলেন। কিন্তু আক্রমণকারীদের একজন—নগেন সেন—আহত হয়ে অজ্ঞান অবস্থায় ধরা পড়ল। ত্রৈলক্য চক্রবর্তী, কালী মৈত্র, সতীশ পাকড়াশী কোনও ক্রমে বেঁচে গেলেন অলি গলি ঘুরে।

এর পরেই কোলকাতার গ্রীয়ার পার্কে আলোচনারত নরেন সেন আর আদিত্য দত্ত ধরা পড়েন—বীরেন চ্যাটার্জি ল্যোমান সাহেবের হাত মটকে দিয়ে কোনপ্রকারে পালিয়ে যান।

অনেক দিন পরে। গৌহাটির মামলায় তিন বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ নিয়ে তারাপ্রসন্ন দে আর প্রভাস লাহিড়ী এলেন

প্রেসিডেন্সী জেলে। এসেই তাঁরা জানলেন এক স্বদেশী সাধু পাগল হয়ে গেছেন। তিনি জেলার বড় সাহেব সকলকেই যখন তখন গালিগালাজ করেন,—আর বলেন "মানিনে তোগো ইংরাজের রাজত্ব।"

জেলার বড় রায়ান হেসে উত্তর দেন—"একা না মানলে কি ক্ষতি হবে আমাদের রাজত্বের? আপনি একা কি করতে পারেন?" সাধু উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠেন। বলেন, "চক্ষু রইতে যারা অন্ধ তাগো দেখামু ক্যামন কইরা! জান সাহেব আমি কি দেখত্যাছি?"

"কি?" রায়ান সাহেব প্রশ্ন করেন।

"আমি দেখত্যাছি তোমাগো অত্যাচার সীমা ছাড়াইয়া গ্যাছে গিয়া। কাঁদলেও তোমরা গুলি কর। মানুষরে পশু বানাইতে চাও। তার ফলে আগুন জ্বলছে সমস্ত দ্যাশটায়। হাজারে হাজারে লাখে লাখে ভারতবাসী চীৎকার কইরা বলত্যাছে মানিনা ইংরাজের শাসন;—দস্যুর রাজ্য ধ্বংস হউক। তোমাগো বেত, বন্দুক, বেয়নেট হে চীৎকার থামাইতে পারত্যাছেনা,—তোমরা পাগলের মতন ছুটাছুটি করত্যাছ—ক্ষ্যাপা কুকুরের মতন ফালাফালি জুইড়া দ্যাছ। অখন বুঝছ আমি একা না?"

জেলার সাহেব হাসতে হাসতে ফিরে যান্—আর বলেন, "একদম পাগল হো গিয়া।"

পাগলা সাধু তিন আইনের রাজবন্দী। তাঁকে যেসব ফলমূল খেতে দেওয়া হয় সে সব তিনি ছুড়ে ছুড়ে ফেলে দেন বাইরে। সেপাইরা তা কুড়িয়ে নিয়ে পাগড়ীর ভেতর গোঁজে,—কয়েদিরা কুড়িয়ে নিয়ে মুখে গোঁজে আর হাসে। একদিন চটকল থেকে কাজ করে শালকিয়া স্যুটিং কেসের বন্দী শ্রীযুগল কিশোর দত্ত যাচ্ছেন ষ্টেট ইয়ার্ডের সামনে দিয়ে। হঠাৎ কাগজে মোড়া একটা বেদানা পল তাঁর সামনে। মোড়ক খুলে তিনি দেখেন বেদানাটা মাঝামাঝি কাটা আর তার ভেতরে একটুকরো কাগজে লেখা আছে "খবর

পেয়েছি প্রভাস আর তারা এসেছে। কেমন আছে? একবিল্লা কানা জামাদারের মারফত খবরাখবর হবে।"

যুগলবাবু হাসলেন। মনে ভাবলেন "আচ্ছা পাগল তো! জ্ঞানের নাড়ী টন্‌টনে।"

১৯২০ সালে সকলের সাথে মুক্তি পেয়ে পাগলা সাধুও এলেন বাইরে। দেশে তখন আগুন লেগে গেছে। অমৃতসরের হত্যালীলার প্রতিবাদে ভারতের অন্তরাত্মা হুঙ্কার দিয়ে উঠেছে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে। দলে দলে নরনারী অস্বীকার করছে ইংরাজের অধিকার। দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত হচ্ছে—"ধ্বংস হোক সাম্রাজ্যবাদ,—মানিনা ইংরাজের অধিকার।" নরেনবাবু, প্রতুলবাবু, রবি সেন, প্রভাস লাহিড়ী, আশু কাহিলী প্রভৃতি দলপতিরা অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। নরেন বাবু ভারী খুশী। বলেন, "জেলে সক্কলে আমারে পাগল বানাইছিল। অখন ছ্যাখ আমি ঠিক কইছিলাম কি না।"

সমিতির ছোট বড় কর্মী প্রায় সকলেই কংগ্রেসে যোগ দিলেন। দিলেন না শুধু পুলিন বাবু। তিনি অহিংস আন্দোলনের ঘোর বিরোধী। নরেন বাবু, প্রতুল বাবু প্রভৃতিকে ডেকে তিনি বললেন--"তোমরা অসহযোগে মাতছ দেখত্যাছি। কিন্তু তোমাগো উদ্দেশ্য বিপ্লব না? হের তরে কি চাই তাও তোমাগো অজানা নাই। অস্ত্র, অর্থ, আর বাছা বাছা কর্মী আমাগো যোগাড় করতেই হইব। সে কাজ যে পথে হইব সেই পথ আপাতদৃষ্টিতে নীতিবিরুদ্ধ হইলেও আমাগো নীতিতে আটকায় না। আমি ঠিক করছি অসহযোগ নয়--সম্পূর্ণ সহযোগ করুম্—গভর্ণমেণ্টের কাছ হইতে টাকা লমু।"

নরেন বাবু বললেন—"কিন্তু জনসাধারণ আমাগো উপর বিশ্বাস হারাইব। দেশ জাইগগা উঠছে—এতে বাধা দেওন উচিত নয়। আমার মতে বিপ্লবের পথে এ নীতি—দুর্নীতি।"

পুলিন বাবু কোন দিনই প্রতিবাদ সহ্য করতে পারেন না। শ্লেষের

সাথে বললেন, "ডাকাতি কোন সুনীতি ছিল তোমাগো ? ভুল,— নরেন ! ভুল। লোকের বাহবা, হাততালি, ফুলের মালা তোমাগো পাইয়া বইছে। সর্বদা খেয়াল রাখবা বিপ্লবীর লক্ষ্য—শেষলক্ষ্য। বিপ্লবীর নীতি—End justifies the means. আজ যদি দ্যাশের সব লোকও আমারে দেশদ্রোহী মনে করে,—কুচ পরোয়া নাই—যদি আমি স্থির জানি আমার পন্থায় আমি লক্ষ্যে পৌঁছামু। আমার শ্যাষের দিনের আত্মদান-সব অপবাদরে ম্লান কইবা দিব গিয়া আমার শ্যাষের পরিচয় দ্যাশে বিস্ময় আনব. -আমার শ্যাষেব আঘাত স্তম্ভিত কইরা দিব দ্যাশবাসীরে। যারা অখন আমাগো শালা কইব তারাই হেদিন মালা দিব।"

আর কেউ প্রতিবাদ করল না। পুলিন বাবুর নেতৃত্বে "ভারত সেবক সঙ্ঘ" স্থাপিত হল। দলের অন্যতম নায়ক কৃতী লেখক শ্রীনলিনী কিশোর গুহের শক্তিশালী লেখনী প্রসূত অসহযোগের বিরুদ্ধে বেনামী প্রচারপত্র 'হক্ কথা" দেশে প্রভূত বিস্ময়ের সঞ্চার করল। এ ধরণের যুক্তি তর্ক দিয়ে রাজনৈতিক আলোচনামূলক ইস্তাহার আগে আর দেখা যায়নি। প্রথম প্রথম কেউ ধারণাই করতে পারেনি কোথায় "হককথার" জন্ম। কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল পরে সন্ধান পেল "ভারত সেবক সঙ্ঘের" বেনামীতে অনুশীলন সমিতিই এটা চালাচ্ছে। দেশবন্ধু দাসের কানেও পৌঁছাল এ কথা। আরও তিনি খবর পেলেন তাঁর কল্পিত "হিন্দু মুসলমান প্যাক্টের" বিরুদ্ধেও অনুশীলন সমিতি।

১৯২৩ সালে সিরাজগঞ্জ কনফারেন্সে দেশবন্ধু অনুশীলনের নেতাদের আহ্বান করলেন। দলের পক্ষ থেকে শ্রীআশুতোষ কাহিলী গেলেন তাঁর কাছে। সুরু হল ঝগড়া। দেশবন্ধু উত্তেজিত স্বরে বললেন, "তোমরা দেশদ্রোহী। তোমরা জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছো,—তোমরা সরকারের কাছ থেকে টাকা খেয়ে মীরজাফরী অভিনয় সুরু কোরেছো,—তোমরা আমার প্যাক্টের

বিপক্ষে ক্যানভাস্ কোরছো।” আশুবাবু বললেন—“শ্যাষ হইছে আপনার কথা? এইবারে আমি কই। প্রথমেই একটা কথার প্রতিবাদ করি। আমরা সরকারের কাছ হইতে টাকা লই,—খাইনা। এই দ্যাখেন গায়ে জামা নাই—পেটে ভাত নাই।” একটু থেমে আবার সুরু করলেন—“হঃ—টাকা আমরা লইছি। কারণ আপনারা আমাগো উদ্দেশ্য জাইন্যাও আমাগো একপয়সা সাহায্য করেন নাই। দ্যাশের নেতারা তাগো উপরে উঠার সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করতে চায় আমাগো। নাগপুরে যখন লাঠি চলছিল আপনার মাথার উপর তখন আমাগো আদর ছিল আপনার কাছে। অখন আপনাগো চাই ফুলের মালা। তাই মালীগো আদর হইছে। আমরা যা' ছিলাম তাই আছি। আগে টাকার লাইগা ডাকাতি করতাম,—অখন ভাঁওতা দিয়া গবর্ণমেন্টের কাছে টাকা লই। কংগ্রেসের টাকা লইয়া কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যাওনের চাইতে,—সরকারের টাকা লইয়া সরকারের বিরুদ্ধে যাওন ঢের ভাল বইলা বুঝি।”

হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন দেশবন্ধু।

“গবর্ণমেন্ট বেকুব? তোমাদের উদ্দেশ্য জানেনা,—না? কেন তোমাদের টাকা দেয়?”

“তাগো সুবিধার জন্য”—উত্তর দেন আশুবাবু। “আমাগো সুবিধার জন্য আমরা টাকা লই। সরকার ভাবছে আমাগো দিয়া অসহযোগরে শ্যাষ কইরা আমাগো শ্যাষ কোরব। তাই আমাগো হাতে টাকা দেয়,—পাছে স্পাই লাগায়। আমরা জানি দ্যাশ জাগত্যাছে। আমরা —বিপ্লবীরা যদি আজ প্রস্তুত না হই, মিথ্যাই হইব এ জাগরণ। কারণ জনগণ যাইব আগাইয়া, আজের নেতারা পড়ব পিছাইয়া। আর আপনার প্যাক্ট?”—একগাল হেসে আশুবাবু বললেন—“আপনারে মানি, আপনার ত্যাগরে মানি, আপনার পার্লামেন্টারি প্রতিভাবে মানি—কিন্তু আপনার প্যাক্টরে মানিনা। প্যাক্টে কি স্বাধীনতা

আইব? কনতো কি করুম আমরা প্যাক্ট দিয়া! আপনার প্যাক্টে মিনিস্ট্রির রদবদল হইতে পারে, কর্পোরেশন দখল হইতে পারে, কিন্তু স্বাধীনতা—হাঃ—হাঃ—হাঃ—আমারে মাফ করবেন—আমি চললাম।"

দেশবন্ধুকে নমস্কার করে আশুবাবু চলে এলেন।

ঠিক এই সময়েই সিরাজগঞ্জের একজন সভ্য—নরেন ভট্চাযের—গৃহে বিভিন্ন প্রদেশ ও অঞ্চল থেকে বিপ্লবীরা সমবেত হয়েছেন! কিছুদিন আগেই নরেন সেন, ত্রৈলক্য চক্রবর্ত্তী, রমেশবাবু প্রভৃতি অনেকেই ফেরারী হয়েছেন। বিপ্লবীদের এই মিলনীতে নরেনবাবু বলছেন—"অসহযোগ আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণতি হয় আপোষ রফা—নয়—হিংসাত্মক বিপ্লব। যাঁরা আজ এই আন্দোলনের নায়ক তাগো দিয়া বিপ্লবের আশা করিনা আমরা—অসহযোগ আন্দোলনের বৈপ্লবিক অংশটুকু আমাগো গ্রহণ করতে হইব। জনগণের উত্তেজনা উন্মাদনারে বৈপ্লবিকরূপ দিতে হইব! তার জন্য চাই জোর প্রস্তুতি। আমরা যদি জনচেতনারে—এই টাইম ফোর্সরে কাজে লাগাইতে না পারি—বিপ্লবী হিসাবে ব্যর্থ হমু আমরা,—অযোগ্য প্রমাণিত হমু আমরা। জোয়ার আইয়া ফিইর‍্যা যাইব ব্যর্থতার ছাপ রাইক্ষ্যা।"

আশুবাবু এসে দেশবন্ধুর সাথে তর্কাতর্কির সবিস্তার বিবরণ দিলেন। নরেনবাবু বললেন, "ইসে ঠিকই কইছো তুমি। কিন্তু জবাবটা বড়ই ঠোঁটকাটা হইছে। আমাদের সম্পর্কে অবিচার করলেও দেশবন্ধু সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। আমাগো তরে করছেনও ঢের। সকলের উপরে হইত্যাছে—তাঁর সবল নেতৃত্বে বাংলা জাগ্‌ছে। তাঁর নীতি আমরা না লইতে পারি—তাঁরে অশ্রদ্ধা করতে পারি না।"

ঠিক এই সময়েই পূর্ববঙ্গের জনৈক কংগ্রেস নেতা দেশবন্ধুকে বলছেন—"এতবড় স্পর্দ্ধা ওগো—আপনার লগে ঝগড়া করে—আপনারে শুনায় কথা—ঝাল ঝাড়ে! হুকুম ছান—ওগো পিষ্যা মারুম্ আমরা।"

জবাবে দেশবন্ধু বললেন—"এটা কি বলেন আপনি! আমি যে ওদের বেশ করে জানি। ওরা দধীচি আর সব্যসাচির Combination. আমি জানি বহু চোর বদমাইস আমাকে ঘিরে বসে আছে—আমার দল ভারী করেছে। আর ওরা জনে জনে নিষ্কলুষ খাঁটি সোনা। যারা প্রাণটা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে—নিজেদের ভুলভ্রান্তি ছাড়া তাদের পিষে মারতে কেউ পারে না। আমরা ওদের নীতির সাথে একমত না হতে পারি, কিন্তু ওদের অশ্রদ্ধা করতে পারি না।"

প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনের অন্তরালে এই রকম একটা বিপ্লবী মিলনীর আশঙ্কা পুলিশ করেছিল। সন্ধানও তারা পেয়েছিল। কিন্তু বিপ্লবীরাও পুলিশের কৃপাদৃষ্টির হাওয়া পেয়েই সরে পল। নরেনদা লাহিড়ীমোহনপুরে (পাবনা জেলা) মণীন্দ্র ওরফে জল্লেশ লাহিড়ীদের বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। সেখানেই অবশিষ্ট আলোচনাটুকু সেরে তিনি জিতেশ লাহিড়ীর সাথে সাথে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাচ্ছেন। মাঠে একটি ক্ষেতে প্রায় ষাট-সত্তর জন কৃষক ধানের জমি নিড়াচ্ছে। হিন্দু মুসলমান দুই-ই আছে। নরেনদা জিজ্ঞেস করলেন, "এতলোক একখান ভুঁইয়ে ক্যান্ জমা হইছে ?"

জিতেশ বললে—"গাঁতা করে কাজ করছে। গ্রামের সমস্ত চাষী--হিন্দু মুসলমান—নির্বিশেষে—আজ একজনের, কাল অপরের—এইভাবে সকলের জমিই নিড়িয়ে দেবে।"

"অর্থাৎ সমবায় প্রথায় ক্ষেতের কাজ। সকলে মিইলা সকলের কাজ করে। উৎপন্ন ফসলের বণ্টনটাও যদি এই নীতিতে হয় তা হইলে চমৎকার হয়।"

গাছে গাছে আম-জাম পেকে আছে। গাছের তলায়ও প্রচুর পড়েছে। নরেনদা প্রশ্ন করলেন—"এই সব আমের গাছ কাগো ?"

"গ্রামের লোকদের!"—জবাব দেয় জিতেশ।

—"কোন পাহারা রাখে না ?"

—"না।"

—"কেউ পাড়ে না—চুরি করে না ?"

—"প্রত্যেকেরই এত আছে যে চুরি করার দরকার হয় না।"

নরেনদা হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে বললেন—"দেখছ—দেখছ! সাপ্লাই যদি ডিমাণ্ডরে অতিক্রম করে—অর্থাৎ অভাবে না থাকে—তা হইলে সামাজিক অপরাধ লোপ পায়। সাধারণের জীবনযাত্রার অনিবার্য প্রয়োজনের মান রাইখ্যা যদি প্রোডাকশানরে বাড়ান যায় তবেই তো সেডা শান্তিপূর্ণ সুখের রাজ্য হইতে পারে। অভাবও নাই—বাহুল্যও নাই।" কিছুক্ষণ নীরবেই পথ চললেন নরেনদা। জিতেশ যায় আগে আগে—নরেনদা পিছে! হঠাৎ তিনি ডাক দিলেন—"জান জিতেশ! নূতন একটা ভাবের বন্যা আইত্যাছে পৃথিবী জুইড়্যা। এই বন্যায়—এই নীতিতে ছুনিয়া ভাইস্যা যাইব গিয়া। আমাগো এই সমাজ ভাইঙ্গ্যা চুইর‍্যা নূতন সমাজের প্রতিষ্ঠা হইব। এই নীতির Experiment চলত্যাছে রুশদ্যাশে। তাই Study করণের লাইগ্যা গোপেনরে পাঠাইছি সেখানে। দেখি সে আমাগো লাইগ্যা কি আনে—আগুন-না-ছাই।"

কিছুদিনের মধ্যেই নরেনদা ধরা পড়ে জেলে গেলেন। এবারে পুরোপুরি পাগল তিনি। মলমূত্রের বিচার নেই। নির্বিকারে পড়ে থাকেন তারই মধ্যে। সি, আই, ডিরা কাছে এলে ভিরমি লাগে। কেবলমাত্র ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী আর দু'চার জনের সাথে ফিস্‌ফাস্ আলাপ করেন। কেউ প্রশ্ন করলে বলেন, "যাদুবাবু সাধন পথে অনেকদূর আগাইছেন,—বিশ্বনাথ (মুখার্জী), যতীন (দাস), আশু—এরাও সাধন ভজনের লোক।"

একদিন প্রাতে নরেনদা বেজায় বমি করতে লাগলেন। রাজবন্দী সাথী ভাই আর জেল কর্মচারীরা সকলেই ব্যস্ত হয়ে পলেন। ছুটে এলেন জেলার, ডাক্তার। নরেনদা হাসেন আর বলেন—"আরে তামাসা ছাখ! কি হইছে আমার?—কিচ্ছুনা। এডা হইত্যাছে Sea-Sickness জাহাজে চড়ছি—সি, আই, ডি অক্ষয় রইছে আমার

লগে,—জাহাজের দোলায় গায় মোচ্চড় দ্যায়—বমি আহে। ওষুদপত্তর লাগবনা,—ওষুদে কিচ্ছুই হইত না।”

সকলেই ভাবল এ পাগলামি। কিন্তু দুইদিন পরেই সি, আই, ডি শ্রীঅক্ষয় দত্ত পরোয়ানা নিয়ে জেলগেটে হাজির হন। নরেনবাবুকে যেতে হবে ব্রহ্মদেশের জেলে—রেঙ্গুনে। জেল কর্মচারীরা অবাক। ভেবেই পায়না তারা নরেনবাবু পাগল—না—অলৌকিক শক্তিশালী সত্যদ্রষ্টা!

১৯২৮ সালে মুক্তি পেয়ে নরেনদা রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়েছেন। একেবারে সাধুমহারাজ। দলের লোকজন তাঁর কাছে গেলেই বলেন, “তোমরা ধর্ম্মচ্যুত হইছ—তোমাগো দল টিকব না,—নীতিরে হারাইয়া রাজনীতি হয় না। বিপ্লবীর ধর্ম্ম হইল গিয়া বিপ্লবের লাইগগ্যা ছটফটানি। সেই ভাবতো তোমাগো ভিতব দেখি না। তাই তোমাগো রাজনীতি ইলেকশান্-নীতিতে নামছে।”

আগেই গোপেন চক্রবর্তী ফিরে এসেছে রুশদেশ থেকে যোল আনা কম্যুনিষ্ট হয়ে। ইংলণ্ডেব কম্যুনিষ্ট পার্টির মারফতে রুশদেশের সাথে যোগাযোগের প্রস্তাব এনেছে সে। দলপতিরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন নবেনমহারাজের কাছে, খুলে বললেন সব কথা। সাধুমহারাজ নীরবে কিছুটা আত্মস্থ হয়ে বসে রইলেন। তারপর বললেন—“তোমরা তো চিনির স্বরূপ জানতে চাইছিলা,—মনে ধরলে চিনিই হইতে চাইছিলা। কদমা বাতাসা তো হইতে চাও নাই। তোমরা লইবা বিপ্লবের নীতি,—কোন বিপ্লব দলের লেজুর হইবা ক্যান!”

ফিরে এলেন সকলে।

এর পর বহুদিন নরেনমহারাজের পাত্তা নেই! তিনি মিশনের আলমোড়া, কাশী, রাঁচি আশ্রমে থাকেন। কোন যোগাযোগ নেই দলের সাথে।

এদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হয়েছে। বিপ্লবীরা দলে দলে ধরা পড়ছে। সুভাষবাবু উধাও হয়েছেন দেশ থেকে। জাপানীরা আক্রমণ করে দখল করেছে মালয়, সিঙ্গাপুর—আক্রমণ করেছে ব্রহ্মদেশ। ইংরাজরা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার চালিয়েছে জাপানী বর্ব্বরতার কাহিনী ;—আর তারই পোঁ ধরে একদল মোহাবিষ্ট যুবক পথে পথে টহল মেরে শ্লোগান দিচ্ছে "জাপানকে রুখতে হবে—জাপানকে রুখতে হবে।" কিন্তু তাদের পিছে পিছেই ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী নরেন মহারাজ ছুটে বেড়ান ঢাকা সহরের পথে পথে—আর পরিচিত কর্মী দেখলেই বলেন—"তোমরা ওঠো—তোমরা জাগো! ইংরাজের চর গো কথা তোমরা শুনোনা। আমি সাধু, আমি কইত্যাছি জাপানীগো লগে লগে সিঙ্গাপুরে আইছে আমাগো রাসবিহারী বোস—গইড়া তুলছে ভারতের মুক্তি ফৌজ! আমি দেখত্যাছি সে ফৌজেরও নেতৃত্ব লইব আমাগো সুভাষ—নেতাজী সুভাষ—আর এখানে—ভারতের জনতা—ভারতের অন্তরাত্মা গর্জ্জন কইরা উঠব দাসত্ব মোচনে,—লাখে লাখে মাইত্তা উঠব বিপ্লব অভিযানে ;—তোমরা প্রস্তুত হও—তোমরা প্রস্তুত হও—"

এই পাগলা সাধুর মরমী আহ্বান দেশবাসীর কানে গেল না,—কিন্তু গোয়েন্দা বিভাগের কানে গেল। পাগলের প্রলাপ বলে দেশবাসী সে আহ্বান উপেক্ষা করলেও সরকার উপেক্ষা করল না। কেউ সাড়া না দিলেও আই, বি সাড়া দিল। ১৯৪২ সালের আগষ্টের তৃতীয় সপ্তাহে তারা গ্রেপ্তার করে নরেন মহারাজকে নিয়ে এল জেল গেটে। খবর পেয়েই অবরুদ্ধ রাজবন্দীরা ভিড় জমাল গেটের কাছে! দেখল তারা নরেন মহারাজ রেগে কাঁই হয়েছেন। ক্রুদ্ধস্বরে সি, আই, ডি আর জেল কর্মচারীদের সম্বোধন করে ইংরাজের উদ্দেশ্যে বলছেন—"সাধুর গায় হাত দিছে ইংরাজ,—ধ্বংস হইব তাগো রাজত্ব। মহাত্মা গান্ধী আর কংগ্রেসের নেতাগো গ্রেপ্তার কইরা মূর্খ ইংরাজ ভাবছে গ্রেপ্তার করছে বিপ্লবরে। কিন্তু

ইসে ঠিক জানবা ভারতের জনতাই বাজাইব বিপ্লবের বিষাণ,—আর ভারতে পূর্ব সীমানায় নেতাজী সুভাষের নেতৃত্বে উড়ব স্বাধীন ভারতের বিজয়-নিশান। অখন বেলা পাঁচড়া। আমি দিব্যচক্ষে দেখত্যাছি আজ হইতে পাঁচ বছরের মধ্যে ইংরাজের রাজত্ব শ্যাষ হইব। সূর্য যদি পশ্চিমেও উঠে আমার কথা মিথ্যা হইবার নয়। ইসে সাধুর অভিশাপ—ভারতের মর্মবেদনা,—বিপ্লবীর আজীবন নিষ্কাম তপস্যালব্ধ দিব্য-দৃষ্টি।”

বন্দী

ভারতের এক হতাশাময় অন্ধকার যুগে একদল তরুণ দেশপ্রেমের হোমাগ্নিতে আত্মবিসর্জন করে দিকে দিকে মুক্তির আগুন জ্বালতে চেয়েছিল। জাতীয় মুক্তির ইতিহাসে সেই যুগটি 'অগ্নিযুগ' নামে পরিচিত। এই যুগে একদিকে যেমন বহু সুশিক্ষিত মেধাবী কর্মীর নিরক্ষরের ছদ্মবেশে বিপ্লবায়োজনে আত্মনিয়োগ করতে হয়েছে,—অন্যদিকে তেমনি বহু অল্পশিক্ষিত কর্মী—দেশপ্রেমের দমকা হাওয়ায় যাদের পাঠ্যজীবনের আলো নিভে গিয়েছে—তাদেরও পণ্ডিতের ভূমিকা অভিনয় করতে হয়েছে। উচ্চ শিক্ষিতের পক্ষে অশিক্ষিতের ভূমিকা অভিনয় করা কিছুটা সহজ সাধ্য হলেও অল্পশিক্ষিতের পক্ষে প ণ্ডিতের ভূমিকায় মানিয়ে চলা কতটা ভয়ঙ্কর সেই কথাই বলছি!

১৯১৩ সালে বিপ্লবসমিতির উত্তরবঙ্গের নায়ক বিরজাবাবু (মহারাজ) ধরণীকে আদেশ দিলেন, "জেলার অর্গানিজেশনের ভার লইয়া তোমারে যাইতে হইব মালদহ।"

প্রতিবাদের ক্ষেত্র নেই। নেতৃমণ্ডল থেকে যে আদেশই আসুক না কেন সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকেই সার্থক করে তুলতে হবে। ধরণী শুধু জানতে চাইল, "সেখানে কিছুটা আছে তো?"

—"মনে কর নাই। সব তোমারেই গড়তে হইব।"

—"আমার থাকনের কি ব্যবস্থা হইব?"—ধরণী প্রশ্ন করলে।

—বিরজাবাবু উত্তর দিলেন—"সেডা তুমি পাইবা। একটা পোলার নামে একখানা Introduction letter দিত্যাছি তোমারে। সেই তোমার থাকনের সব ব্যবস্থা কইরা দিব। ছয়মাস পর আমি যামু সেখানে। কদ্দূর আগাইছ দেখুম গিয়া।"

বিরজাবাবুর কাছে বিদায় নিয়ে ধরণী মালদহ রওনা হল।

কাটিহার হয়ে চলেছে ট্রেনে। গাড়ীতে এক ভদ্রলোকের সাথে আলাপ হল তার। মাঝের একটা ষ্টেশন থেকে তিনি ট্রেনে চেপেছেন। বাক্স, বিছানা, পোঁটলা, পুঁটুলি নিয়ে যতটা না বিব্রত হয়েছেন তার চেয়ে ঢের বেশী বিব্রত হয়েছেন জীবন্ত পুঁটুলি বিশেষ বউ ঝিদের নিয়ে।

আধুনিকা মা লক্ষ্মীরা রাগ করবেন না,—এটা ছত্রিশ বছর আগেকার কাহিনী। সে দিনের মা লক্ষ্মীরা অচলা অবলাই ছিলেন, প্রগতির পরশে আজের মত—সচলা, হরবোলা হয়ে ওঠেননি। স্বামীর নাম ধরে ডাকা তো দূরের কথা নামের আদ্যক্ষর উচ্চারণ করলেই সে দিনের মেয়েরা আঁৎকে উঠে জিভে কামড় খেত।

ধরণী ভদ্রলোককে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। সুতরাং মুহূর্তেই সে তাঁর আত্মীয় হয়ে উঠল! ভদ্রলোক বললেন, "খুব করেছ বাবা!" —কণ্ঠে কৃতজ্ঞতার সুর।

—"হুঁ—তোমার নাম? যাবে কোথায়? কি কর?"

ধরণী কুণ্ঠিত ভাবে উত্তর দিল, "কি আর করেছি! এতো সাধারণ কর্ত্তব্য।"

—"আরে—আজকালকার দিনে সাধারণ কর্তব্য করতে যে এগিয়ে আসে—সে তো অসাধারণ। যাক্—তোমার নাম?"—জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক।

"আমার নাম শ্রীধরণী ধর রায়,—আমি ষাইতাম মালদহে"—

—"বেশ—বেশ! কি কর তুমি?"—

—"আইগ্যা—মালদহ কলেজে আই, এ পড়ি।" ধরণী উত্তর দিল।

—মালদহ কলেজ। বিস্মিত ভাবে ভদ্রলোক ধরণীর মুখের দিকে চাইলেন। মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন—"মালদহে তো কোন কলেজ নাই।"

ধরণী থতমত খেয়ে বললে—"আইগ্যা কলেজিয়েট স্কুল।"

—"কলেজই নাই,—তার আবাব কলেজিয়েট স্কুল!" ভ্রূকুঞ্চিত কবলেন ভদ্রলোক। সন্দিগ্ধস্বরে প্রশ্ন করলেন—"কি কি Subj ·ct নিয়েছ।"

—"সমস্কৃত, এবিথমেটিক, সায়েন্স"—চটপট জবাব দিল ধবণী।

ভদ্রলোকটিব মুখে হাসিব ঝিলিক খেলে গেল। স্বব যথাসম্ভব নীচু কবে তিনি প্রশ্ন কবলেন—"কোন দলেব?"

ধবণী সন্ত্রস্ত হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। আশ্বাস দিয়ে ভদ্রলোক বললেন—"কিছু ভয় নাই আমাব কাছে। বুঝতে পেবেছি। তুমি এনার্কিষ্ট পার্টিব লোক। আমি রিটাযার্ড পুলিশ ইনস্পেক্টাব কিনা। তোমাব পবোপকাবেব মনোবৃত্তি, আবোল তাবোল জবাব আব ঢাকাই কথা থেকেই বুঝেছি তুমি স্বদেশী দলের ফেবাবী।"

ধবণী যেন কি বলতে যাচ্ছিল। মাথা নেড়ে ভদ্রলোক বল লন —"উহু—কোন কথা না—আমাব কথা আগে শোনই। আমি বুঝেছি তুমি স্কুল কলেজে পডনি। বোধহয় অবসব পাওনি। কিন্তু ছাত্র হিসাবে কেন পরিচয় দিতে চাও? ব্যবসাযী বা জমিদাবেব চাকবী কব, বাজাব সবকাব, শিক্ষানবীশ—নিদেন ভবঘুবে কোন কিছুই কবনা—যা হোক কিছু বললেই তো চলে। ভবিষ্যতে সতর্ক না হলে বিপদে পড়বে।"

ধবণী একদম বেকুব বনে গেল। তাব আড়ষ্ট ভাব কাটানোব জন্যে এক ষ্টেশনে ভদ্রলোক বললেন—"এক ঘটি জল আন না বাবা।" ধবণী হাতে স্বর্গ পেল।

মালদহ ষ্টেশনে ভদ্রলোকেব পাযেব ধূলো নিয়ে ধবণী নেমে গেল।

গেট দিয়ে বেকতেই সে দেখতে পেল একটি যুবক হলদে বংয়েব একখানি রুমাল নাড়াচাডা করছে। ধরণীও পকেট থেকে নীল রুমাল বের কবল। এই ছিল সাঙ্কেতিক চিহ্ন। দুজনে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল ষ্টেশন হাতা থেকে। একটু দূবে এসে ধবণী সাথীকে প্রশ্ন করলে—"আপনারে কি নামে ডাকুম?"

—"হংস" - উত্তর দিল সাথী।

—"হংস, রাজ না পাতি ?'—ধরণীর চোখে মুখে কৌতুক উপচে পড়ে।

—"রাজ—পাতি কিছুই না, -একেবারে পরম" -মৃদু হেসে জবাব দেয় সাথী। একটু থেমে আবার বললে —"আমি সত্যিই হংস তবে ডানাওয়ালা না—আগরওয়ালা। আমার নাম হংসগোপাল আগরওয়ালা! এখানেই বাড়ী।"

—"ঠোকা মারবেন না তো ?" —রহস্য করে ধরণী।

—"বোকা হলেই ঠোকা খেতে হবে"—হেসে জবাব দেয় হংস।

"তবে জেলার লীডারশিপের লাঠি হাতে আছে—তাড়া লাগাবেন —হংসের বংশও কাছে ঘেঁষবে না।"

পরদিন হংস ধরণীকে এক উকিল বাড়ী নিয়ে গিয়ে বললে— "রামগোপাল কাকা! এই যে আপনার খোকার মাষ্টার মশাইকে নিয়ে এসেছি।"

মাষ্টার মশাই! বলে কি। ধরণীর মাথার মধ্যে রীতিমত কামারশাল,—ঠন্ ঠন্ বেদম হাতুড়ি চলছে। তার মনে হল লীডারশিপের লাঠি হাতে নেবার আগেই বিশ্বাসঘাতক হংস অতর্কিতে ঠোকা মেরেছে। মনে মনে বিরজা বাবুর উপর বিষম বিরূপতা আর হংসের ঠোঁটকর্তনের সঙ্কল্প নিয়ে অসহায় অবস্থার চাপে ধরণী অগত্যা রামগোপাল বাবুর খোকার মাষ্টার মশাই হয়ে গেল।

বিপ্লবী দলের বিশিষ্ট কর্মী সে। খুন, ডাকাতি, বোমা তৈরী প্রভৃতি বহু বিপজ্জনক কর্মে সে লিপ্ত হয়েছে, অন্ততঃ আট দশবার মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে অকুতোভয়ে। কিন্তু এমন সাংঘাতিক কর্মে সে ইতঃপূর্বে হাত দেয় নি। তার মনে হল সশস্ত্র সেপাই,— পুলিশ, মিলিটারী—ভীষণদর্শন গোরা সার্জেন্ট,—বসন্ত চাটুয্যে, টেগার্ট, ডেনহাম, লোম্যান, কলসন,—এমন কি স্বয়ং কৃতান্ত অপেক্ষাও

সমধিক ভয়ঙ্কর এই আট নয় বছরের প্রিয়দর্শন খোকাটি। এ যেন মায়াবী শিশু! এর কম-কান্তির অন্তরালে ভীষণ দর্শন, হিংস্র, শস্ত্র-পাণি দৈত্য ধরণীর ধ্বংসের তরে আত্মগোপন করে আছে। হাসি, খেলাধূলা, মিষ্টি কথা—সব মায়া—সব ছলনা। বই-এর দপ্তর এই মায়াবী দৈত্যের তূনীর। তা'তে রক্ষিত অগ্নি, সর্প, ক্ষুরূপা, বৈষ্ণব, ব্রহ্মশির প্রভৃতি ভীষণ ভীষণ প্রাণঘাতী শরনিচয়কে মায়াবলে সাহিত্য চয়ন ব্যাকরণ, পাটিগণিত, কিং রীডার প্রভৃতি সহজ মোলায়েম, মনোহর রূপ দেয়া হয়েছে। সব চেয়ে সাংঘাতিক কিং রীডার। একেবারে সর্পবাণ! জ্যা-মুক্তির সাথে সাথেই শত সহস্র নাগ-নাগিনী ফণা মেলে বিল্‌বিল্ করে তেড়ে আসে। ছেলেটি ও তার দপ্তরেব দিকে ধরণী চেয়ে চেয়ে দেখে আব আতঙ্কে শিউবে ওঠে। মাঝে মাঝে তার ভারী রাগ হয় কবিদের উপর—যারা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের খতিয়ান দিতে গিয়ে প্রভাত ও সন্ধ্যাকে স্তবস্তুতি করে স্বর্গে তুলেছে! দিবসেব যে যে অংশে মায়াবী দৈত্যের আক্রমণ প্রখব হয়—তার রূপ নাকি অতীব মনোহর। যত সব ভণ্ডের দল! আব রাগ হয় বিরজা-বাবুর উপর,—যিনি ধরণীকে বর্তমান ফ্যাসাদে ফেলেছেন। চার পাঁচ দিন পর পর সে তাঁকে নিয়মিত ভাবে পত্র লিখে প্রার্থনা জানায়—আমাকে বদলী করুন। বিরজা বাবুর কাছ থেকে জবাবও নিয়মিতই আসে—তোমাকে ওখানেই থাকতে হবে। ধরণী নিরাশ হয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে,—আর মনে মনে বলে—একেরে পাষাণহৃদয় বিরজা বাবু,—খুনী, ডাকাতগো সর্দার কিনা!

অনেক ভেবে চিন্তে মায়াবী শিশুর মায়াজাল থেকে উদ্ধার লাভের জন্যে ধরণী মহামায়ার শরণ নিল। বাড়ীর কর্ত্রীকে সে মা বলে ডাকতে লাগল। মা'র মুখ থেকে কথা বেরুতে পায় না। কিছু বলতে না বলতেই সুসন্তান ধরণী তড়াক করে তা' সম্পন্ন করে। ফলে মা'র মুখে ধরণীর সুখ্যাতি আর ধরে না। বড়ই ভাল ছেলেটি! আহা! বাছার 'মা' ডাক কত মিষ্টি!

কিন্তু একদা মায়াবী শিশুর ভীষণ আক্রমণে পরাজিত, পর্যুদস্ত হয়ে ধরণী মরমে মরে গেল।

রবিবার। খোকা বৈঠকখানায় বাবার সামনেই পড়তে বসেছে। ধরণী পড়াচ্ছে কিং-রিডার। ম্যাট মানে মাদুর ঠিকই হ'ল। কিন্তু বিপদ এল প্যাট্ আর ভ্যাট্ নিয়ে। অনেক গবেষণা করে ধরণী বুঝালে—"প্যাট্—প্যাট্,—প্যাট্ মানে জান না? কি কই তোমারে। প্যাট্ মানে ইসে (ধরণী হাত দিয়ে নিজের পেট নাড়লে) যারে কই উদর। আর ভ্যাট্ মানে—কি কমু—ভ্যাট্ মানে—ডালি! ডালি দ্যাওনের কথা শুন নাই? ডালি ইসে জজ ম্যাজিষ্ট্রর গো যা দেয় কাম বাগাইন্যার লাইগ্যা—ঘুস্—ঘুস।"

হঠাৎ রামগোপাল বাবু খোকার দিকে যোগ দিলেন। ভ্রূ কুঁচিয়ে বললেন—"উহু—হ'ল না। খোকা! প্যাট্ মানে আদর করা,—ভ্যাট্ মানে জ্বালা—জলের ট্যাঙ্ক জাতীয় বড় আধার।"

আবার এল ক্রাই, ট্রাই, ফ্রাই। প্রথম দুটোর মানে ঠিক ঠিক হ'ল। কিন্তু ফ্রাই নিয়েই ধরণী ড্রাই হয়ে গেল। সে কেবলই আওড়ায়—ফ্রাই মানে—ফ্রাই মানে,—আর ঢোক গেলে। অবশেষে রামগোপাল বাবু বলে দিলেন—"ভাজা—ভাজা।"

ধরণী মনে মনে বলে—হায় ভাজা! আজ তুমি তাজা মানুষডারে ভাজলা দেখত্যাছি!

অবস্থা দেখে রামগোপাল বাবু বললেন—"খোকা। পড়া এখন থাক্। বিকেলে মাষ্টার মশায়ের সাথে বেড়িয়ে এসে পরে পোড়ো।

ধরণীর মনে হ'ল ফাঁসির আসামী King's Pardon পেয়েছে। উঃ—কি দয়াব শরীর রামগোপাল বাবুর,—একেবারে দয়ার সাগর—বিদ্যাসাগর! বাছুরের কষ্ট দেখে দুধ খাওয়া ছাড়লেই বেঁচে যাই!

আবার বিরজা বাবুর কাছে পত্র গেল—বদলী চাই। কিন্তু একই উত্তর বিরজাবাবুর—নড়চড় নেই।

পাটিগণিতেও ইংরেজীর অবস্থা। খোকাটা খুলে বসেছে ল-সা-গু, গ-সা-গু! সাগুকে ধরণী চিরকাল ভয় করে! জ্বর জ্বালা হ'লে সাত দিন উপোস্ ঠুকে প'ড়ে থাকে,—সাগুর ধারে কাছে যায় না। কিন্তু পাটিগণিতের সাগু যে আরও ভয়ঙ্কর। পুনশ্চ বদলীর প্রার্থনা।

দয়াময় রামগোপাল বাবু সব অবস্থা বুঝে খোকাব পড়ানো থেকে ধরণীকে বেহাই দিলেন। সে এখন কর্ত্রীমার প্রাইভেট সেক্রেটারী। হাট-বাজার করে, খোকাকে নিয়ে বেড়ায়, ঘরকন্নার অনেক বিষয় তদারক করে।

অখণ্ড অবসর পেয়ে এবাব সে অর্গানিজেশনে মন দিয়েছে। বিদ্যা বিশেষ না থাকলেও লোকজনের সাথে মেলা মেশার একটা স্বাভাবিক দক্ষতা আছে তার। তারই জোরে একটি দুটি কবে প্রথমে শহরে—পরে গ্রামাঞ্চলেও অর্গানিজেশন বিস্তার করল সে। সফলতায় এল তন্ময়তা। ধরণী ডুবে গেল বৈপ্লবিক সংস্থা সংগঠনে।

সৃষ্টিতে আনন্দ আছে। আর সে সৃষ্টি যদি অসাধ্য সাধন হয় তার আনন্দের পারাপার নেই। যতই অর্গানিজেশন বিস্তার লাভ কবে—ততই ধরণীর আনন্দের পরিধি বাড়ে। অবশেষে ধরণীর সৃষ্টি তাব অন্তরকে আচ্ছন্ন করল। তার নিজস্ব সত্ত্বা এক হ'য়ে গেল অর্গানিজেশনের সাথে।

হঠাৎ একদিন বিরজা বাবু এসে হাজির হলেন। ধরণীর হাতে গড়া অর্গানিজেশন দেখে চমৎকৃত হলেন তিনি। প্রশংসা করে বললেন—"বাঃ—পূর্ণ! বেশ করছ তুমি।"

পূর্ণ ডাক শুনে চমকে উঠল ধরণী। মনে হ'ল সেটা তার পূর্ব জন্মের নাম। পূর্ণ ডাকের সাথে সাথেই যেন জাতিস্মব বিহঙ্গমের স্মরণে উদিত হ'ল পূর্ব জন্মের স্মৃতি। পূর্ণ চক্রবর্তী-নামে একটি বালক ছিল। আত্মীয়স্বজন সকলেই ডাকত তাকে 'পুনা' নামে। বাবা মা আদর করে ডাকতেন 'পূর্ণ'। বিমূঢ়ের মত সে বিরজা বাবুর দিকে বার বার ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখল। একি মাতা?

—একি পিতা? পূর্ণ ডাকের মাঝ দিয়ে বাল্যের সেই স্নেহময় আহ্বান ভেসে আসে তার কানে। তার পরেই তার মনে হল পূর্ণ —বালক পূর্ণ চক্রবর্তী মরে গিয়ে বৈপ্লবিক নবজন্ম গ্রহণ করেছে। এ জন্মের নাম ধরণী রায়। এখন সে মালদহের ধরণী—আর তার সম্মুখে মাতা নয়, পিতা নয়,—নায়ক—অথবা তিনেরই সমন্বয়।

রাতে খেয়ে দেয়ে শোবার আগে বিরজা বাবু বললেন—"হ—তুমি না বদলী চাইছিলা?"

বদলী? চমকে উঠল ধরণী।

—"হ্যাঁ—না—তা ইসে তখন যখন হইলই না—অখন আর দরকার নাই"—সঙ্কোচের সাথে বলে ধরণী।

—"এডা কি কও? তোমার বদলী যে মঞ্জুর হইছে! তোমারে যাইতে হইব ত্রিপুরায়"—বললেন বিরজা বাবু।

—"না—না—আমি এখানেই থাকি—অখন সব ঠিক হইয়া গেছে গিয়া,"—আবার বলে ধরণী।

—"তাই তো তোমারে যাইতেই হইব। ত্রিপুরায় ভাল লোক চাই"—বিরজা বাবু জোর দিয়ে বলেন।

পূর্ণর মন বিষাদে ভরে গেল। ক্ষোভে, দুঃখে সে মনে মনে বললে—"যখন বদলী চাইছিলাম তখন না করল। অখন চাই না—আর ইসে ঘাড়ে চাপায়! এক্কেরে পাষাণ হৃদয়! খুনী ডাকাত গো সর্দার কি না!"

শালগ্রামের আত্মদান

রাজসাহী কলেজের দুইজন ছাত্র—প্রবোধ ভট্‌চায্ আর প্রভাস লাহিড়ী। পড়া শোনায় বেশ ছেলে এরা। আই, এ পড়ে। কিন্তু ১৯১৪ সালে সেকেণ্ড ইয়ারে কোথায় আই, এ পরীক্ষার জন্যে হন্যে দিয়ে পড়বে—না দেখা গেল পড়াশোনায় রীতিমত শিথিলতা স্বরু করেছে। দিনরাত ফিসফাস্ গল্প করে। সন্ধ্যার পর পদ্মার ধারে আরও কয়েকটি ছেলের সাথে আড্ডা দেয়—এমন কি কলেজও কামাই করে মাঝে মাঝে। একদিন কেমিষ্ট্রী প্র্যাক্‌টিকাল ক্লাসে প্রফেসর অধিকারী রোল্‌কল্ করছেন। মাথা গুঁজে তিনি হেঁকে যাচ্ছেন টুয়েন্টি ফোর, টুয়েন্টি ফাইভ ইত্যাদি। ঠিক যখন থার্টি টু ডাক পড়েছে প্রবোধ উঠে জবাব দিল—"Yes Sir"

প্রফেসর অধিকারী আবার হাঁকলেন "থার্টি টু?"

প্রবোধ আবাব জবাব দিল—"Yes Sir"

"Your name?" হাঁকলেন প্রোঃ অধিকারী।

"প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী"—উত্তর দিল প্রবোধ।

এইবার প্রফেসর অধিকারী হেসে উঠে বললেন—"I know Pravash more than you. He is my co-villager, almost next-door neighbour"

ক্লাস সমেত হাসির ধুম পড়ে গেল। বেকুব হয়ে প্রবোধ চন্দ্র সুট্ করে সরে পল ক্লাস থেকে।

সন্ধ্যার পব দুই বন্ধুতে দেখা হতেই প্রবোধ সবিস্তারে বর্ণনা করল ঘটনাটি। প্রভাস হাসতে হাসতে বলল, "আমি তো তোকে কেমিষ্ট্রী প্র্যাক্‌টিকাল ক্লাসে প্রক্সি দিতে বলিনি।"

দুজনে একচোট হেসে নিল।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে প্রবোধ গম্ভীর হয়ে প্রভাসকে

জানাল, "একাডেমী ইস্কুলের একবেটা মাষ্টার ভয়ানক বেয়াদপী সুরু করেছে। বেনামী চিঠি দিয়ে কয়েকবার শাসিয়েছিও। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী! হতভাগা বদের হাঁড়ি, ছেলেদের সর্বনাশ না করে ছাড়বে না। একটু ধমকিয়ে দিতে হল দেখছি।"

জমকালো ধমকানোর ব্যবস্থা হল। সন্ধ্যার পর মাষ্টার মশাই পদ্মার ধার থেকে মেসে ফিরছেন। ঠিক সামনে থেকে কে যেন তাঁকে লক্ষ্য করে বন্দুক ছুঁড়ল। লোক দেখা গেল না। শুধু শব্দ আর আগুনের ঝলক্ মাষ্টার মশায়ের বোধগম্য হল। চীৎকার করে দৌড়াতে দৌড়াতে মেসে ঢুকে তিনি নিজের রুমে ধড়াস করে পড়ে গেলেন। ছাত্রেরা "কি হ'ল কি হ'ল স্যার" করে তাঁকে ঘিরে ধরল। তিনি শুধু কাঁপতে কাঁপতে বললেন—"বন্দুক—খুন – জল!"

ছেলেরা হৈ হৈ করে এটা ওটা বলল। একটি ছেলে মাষ্টার মহাশয়ের টেবিল থেকে আবিষ্কার করল একখানি কাগজ। তাতে লাল কালিতে লেখা আছে—"মাষ্টার! হুঁসিয়ার! ফের যদি ছেলেদের সাথে মিশেছো—কি—গিয়েছো!"

এধারে উল্লাসিত চিত্তে প্রবোধ এসে বন্ধু প্রভাসকে জানাল— "Operation successful!"

"খুন টুন হয়নি তো?"—প্রশ্ন করল প্রভাস।

"আরে ছোঃ"—ঘৃণা ভরে জবাব দেয় প্রবোধ। "ছারপোকা মেরে হাত নষ্ট করব আমি? বলিস কি? একটা মাত্র ব্ল্যাঙ্ক কার্টিজ খরচ করেছি। তাতেই মাষ্টার মশাই খাবি খাচ্ছেন।"

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে প্রবোধ এসে প্রভাসকে বললে— "এই তুই বই কিনেছিস্? দিতে পারিস কিছু? বাবা তো বেজায় চটিতং। ধুতি, জামা, বই কেনার জন্যে তিনি প্রায় আশী টাকা দিয়েছিলেন। আমি তো সবটাই জ্যোতিবাবুকে (শ্রীযোগেন্দ্র দাস ভট্টাচার্য্য) দিয়ে দিয়েছি। এখন বাবা বলেন কোথায় তোর বই, কোথায় জামা, কোথায় ধুতি? দেখা বই;—ভ্যালা বিপদরে ভাই!"

প্রভাস জিজ্ঞাসা করল—"একেবারেই কিনিস্ নি?"

"কিনে কি হবে? আর ক'দিন থাকব আমরা এ পৃথিবীতে? জানিস তো বিরজাবাবু (শ্রীত্রৈলক্য চক্রবর্তী—মহারাজ) বলে গেছেন চার পাঁচ মাসের মধ্যেই সারা ভারতে বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠবে। এই বিপ্লবে বাঙ্গালীর করতে হবে সব চেয়ে বেশী ত্যাগ। বাংলাদেশে পলাশীর মাঠে ভারতে বিদেশীরাজ প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হয়। সিপাহী-বিদ্রোহে সারা ভারতের মুক্তি-আহবে বাঙালী যোগ দেয় নি। তাই বাঙ্গালীর রক্তে ধুয়ে নিতে হবে পলাশীর কলঙ্কের কালি,—সিপাহী বিদ্রোহে নিষ্ক্রিয়তার পাপ।" কিছুটা থেমে আবার হাসিমুখে বলল— 'আরে—দুটি মাস পরে যে হবে বিপ্লবী বাহিনীর নায়ক,—সে কিনা আগে পিছে হেলে দুলে মাদুরে বসে মুখস্ত করেই চলবে—

টা ভ্যাম্ ভিস্, অসি ভ্যাম্ ভস্—অথবা—

No father—no mother did Lucy know—এটা নিতান্তই অসহ্য। তার জন্যে যথেষ্ট গো-বেচারী ভাল ছেলে আছে, পাশে পাশে বিয়ের বাজারে যাদের দর বাড়ে,—সরকারী চাকরীর দিকে হা করে চাতকের মত যারা দিনরাত হাঁকছে—ফটিক জল—ফটিক জল।"

দুই বন্ধু প্রাণ খুলে হেসে নিল। প্রভাস বলল—"সত্যিই ভাই! আমি তো একদম পড়তে পারিনে। ডিনামিকস খুলে যতই আওড়াই

$VT = UT + \frac{1}{2} + FT^2$ ততই আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে

রেস কোর্স আর পুলিশ স্কয়ার।" আবার হাসি।

এই ভাবেই দিন কাটছে তাদের। প্রায়ই আড্ডা বসে প্রভাসের ঘরে। সেখানেই মালদহের ফেরারী শ্রীহংসগোপাল আগরওয়ালা, মৈমনসিংহের ফেরারী যোগেন ভটচায ওরফে পণ্ডিত, ফেরারী দীনেশ বিশ্বাস, মনোরঞ্জন গুহ প্রভৃতি এসে উপস্থিত হয়। মাঝে মাঝে দলের স্থানীয় নায়ক যোগেন্দ্রদাস ভট্টাচার্য ওরফে জ্যোতিবাবু, উত্তর

অমৃতলাল সরকার ওরফে পরেশ বাবু প্রভৃতিও এসে উপস্থিত হন। প্রভাসের ঘরে দুটো কৌটায় ভরা থাকে চিড়ে আর মুড়কি—নিদানের সম্বলরূপে। সারাদিন অনাহারের পর এই চিড়ে-মুড়কি চিবিয়ে কতদিন কত ফেরারী খিদের জ্বালা মিটিয়ে পরম তৃপ্তির সাথে বলেছে 'আঃ—বাঁচা গেল!'

১৯১৪ সালের শেষ ভাগ। বিপ্লবীদের আসন্ন অভ্যুত্থানের জন্যে প্রচুর টাকা চাই। নাটোর মহকুমার ধরাইল গ্রামের জমিদার বাড়ীতে ডাকাতি হচ্ছে। প্রবোধও জুটেছে সেখানে। সকলের মুখেই মুখোস। তাই নিজ নিজ ব্যাচের পাঁচ ছয় জন ছাড়া আর কে কে এই য়্যাকশানে অংশ গ্রহণ করেছে তা' জানার উপায় নেই। প্রভাস এই কাজে আছে প্রবোধ তা জানে না, প্রভাসও জানে না প্রবোধ আছে। কাজ শেষ হয়ে গেছে। পূর্বনির্দিষ্ট আলাদা আলাদা পথে সকলে সরে পড়েছে। প্রবোধ যে ব্যাচে রয়েছে সেই ব্যাচটি এসে হাজির হয়েছে মাধনগর ষ্টেশনে।

ভোর হয়ে গেছে। ডাউন প্যাসেঞ্জার আসতে দেরী নেই—ঘণ্টা হয়েছে। শেষরাতেই ষ্টেশনে ষ্টেশনে ধরাইল ডাকাতি সম্বন্ধে মেসেজ এসেছে। এই সময় প্রবোধদের ছয় জনকে দেখে ষ্টেশন মাষ্টারের মনে সন্দেহ হল। তিনি থানায় খবর পাঠালেন। গাড়ীও এল—পুলিশও এল। প্রবোধরা যেমনি গাড়ীতে উঠবে অমনি পুলিশদল তাদের গ্রেপ্তার করল। হৈ-চৈ হট্টগোলে একমাত্র পরেশবাবু পাশ কাটিয়ে ট্রেণে চাপলেন।

রাজসাহী শহরে হৈ-হৈ পড়ে গেল। সরকারী কর্মচারী শ্রীশবাবুর ছেলে প্রবোধ ধরাইল ডাকাতি সম্পর্কে গ্রেপ্তার হয়েছে। সঙ্গে আরও চারজন। ত্রিপুরার ক্ষেত্র সিং, রাজসাহীর ললিত মৈত্র—আরও দু'জন। তাদের মধ্যে আছে রাজসাহী একাডেমীর ছাত্র—দেবেন।

ঘোড়া খুব ছুটতে ছুটতে হঠাৎ যদি থেমে যায়, আরোহীর দেহের অধমাংশের গতিও সাথে সাথেই থামে। কিন্তু উত্তমাংশের গতি

চলতেই থাকে পূর্ববৎ। তাই পাকা সওয়ার না হলে সে মুখ থুবড়ে পড়ে যায় ঘোড়া থেকে। যারা প্রচণ্ড কর্মী তাদের যদি ছোঁ মেরে ধরে এনে আবদ্ধ করা যায় রুদ্ধ গৃহে,—মনের দিক দিয়ে অতিশয় সংযমী ও স্থিতধী না হলে অনেক সময় তারা তাল সামলাতে পারে না। মনের দিক দিয়ে কাঁচা কর্মীরা এরূপ ক্ষেত্রে হয় হতাশ,—নয় পাগল হয়ে যায়। আত্মহত্যাও আসে এই থেকে।

নিঃসঙ্গ কারাজীবন দেবেনের মাথা দিল বিগড়ে। সে আবোল তাবোল বকতে লাগল—অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে মানুষের সঙ্গ কামনা করতে লাগল। দুর্বলতার এই রন্ধ্রপথে সি, আই, ডিদের আনাগোনা সুরু হয়ে গেল। ব্যাপার বুঝে প্রবোধ আর তার সাথীরা প্রমাদ গণলো।

মাঝে মাঝে কোমরে দড়ি, হাতে হাতকড়ি লাগিয়ে বিচারের জন্যে সকলকে একসাথে জেল থেকে কোর্টে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হত। এরই মধ্যে প্রবোধ একদিন ফলাও করে দেবেনকে শুনিয়ে দিল আলীপুর জেলে বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে হত্যার কাহিনী। আরও জানাল রুশ দেশের নিহিলিষ্ট আর ইতালীর কার্বোনারো দলের মত ভারতীয় বিপ্লবীদের রোষাগ্নি থেকে অব্যাহতি পাবার পথ জল, স্থল, অন্তরীক্ষে কোথাও নেই।

একদিন প্রবোধ এক সিপাহীর মারফত খবর পেল জেল গেটে একজন হোমরা চোমরা সি, আই, ডি অফিসার এসেছে—আর দেবেনকে—তখনই তার কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। স্নানাহারের জন্য সেলের কয়েদীদের সেলের সমুখের প্রাচীরঘেরা আঙ্গিনাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। হঠাৎ দেখা গেল সেই আঙ্গিনার প্রাচীরের উপরে প্রবোধের করাল মূর্তি। উস্কো খুস্কো চুল বাতাসে উড়ছে, রোষ-কষায়িত নয়নে বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছে; কণ্ঠে বজ্রের কড় কড়ানির মত ধ্বনিত হল "দেবেন!" দেবেন সেই সংহারমূর্তির দিকে চেয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠে চোখ বুঁজল।

অবশ্য এই অপরাধের জন্য প্রবোধকে কয়েক রাত 'হাতকড়ি' সাজা দেওয়া হয়েছে।

প্রমাণ কিছুই না পেয়ে বিচারক আসামীদের বেকসুর খালাস দিলেন। কিন্তু পুলিশ তাতে হতাশ হল না। ফৌজদারী কার্যবিধি হাতড়ে তারা আবিষ্কার করল ১০৯ ধারা শুধু দাগী চোর বদমাইসদের ডাণ্ডা মারার জন্যই তৈরী হয়নি –এর দ্বারা রাজনৈতিক কর্মীদেরও ঠাণ্ডা করা যায়। মামলা চলল। জামীনে প্রবোধ বাইরে এল বলিষ্ঠ গঠন—রাজপুত্রের মত চেহারা, মাথার চুল ক্লিপ দিয়ে মোড়া। ফর্সা রং—টোকা দিলেই যেন রক্ত ঝরে পড়ে। শহরময় ঘুরে বেড়ায় —সি আই, ডি, চরেরা পাছু পাছু যায়। প্রবোধ মাঝে মাঝে হুকুম চালায়—এটা ওটা কিনে আনার জন্যে ওদের বাজারে পাঠায়। আদেশ অমান্য করলে থাপ্পড়, গাট্টা অথবা অন্তর্ধানের যে কোন একটিতে বিপন্ন হতে হবে বিবেচনায় আই, বি, চরেরা আনত মস্তকে হুকুম পালন করে। এই অবসরে প্রবোধ দলের এব ওর সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে।

প্রভাসের বিক্রুট বিশু মৈত্র (পরলোকগত) একদিন প্রবোধের সাথে দেখা করে বললে—"ধীরেনদা (ঘটক) তো খুব পপুলার হয়ে পড়েছেন। রোগীর সেবা, শব-সৎকার, আগুন নেবানো আরও অনেক ভাল ভাল কাজ করছে তাঁর দল। ধীরেনদা বিউগল্ বাজালে শত শত ছেলে ছুটে আসে তাঁর সামনে।"

প্রবোধ হেসে উত্তর দিল—"আমরাও ওসব করি। কিন্তু ওটা আমাদেব লক্ষ্য নয়। আমরা জানি স্বাধীনতা সঞ্জীবনী সুধা—যা পেলে জাতির সব ব্যাধি সেরে যায় এক নিমিষেই—যার অভাবে জাতির সবদেহ ক্রমশঃ বিষিয়ে যায়। বিষের জ্বালায় জীবন যেখানে প্রতি মুহূর্তে মরণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, সেখানে কোন বিশেষ অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গকে চকচকে করবার চেষ্টার নাম 'পরাধীনের সমাজ সেবা'— মূঢ়তারই নামান্তর। এতে আত্মপ্রসাদ লাভ করা যেতে পারে,— কিন্তু এটা দেশ সেবা নয়—Diversion."

বিশু জিজ্ঞেস করে, "কেন, রামকৃষ্ণ মিশন কি কোন কাজ করছে না ?"

"করছে। কিন্তু সেটা সেবাব্রতী রামকৃষ্ণ মিশনেরই কাজ—বিপ্লবী যুব-সমাজের কাজ নয়। আমরা জানি জাতির চরম কল্যাণ আসবে না ওতে। আজ দুচার জনের ব্যাধিতে—বিপদে, স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন, মহামারীতে সেবার্থীদের হৃদয় কাঁদছে, কিন্তু স্বাধীনতা না পেলে দেশ জুড়ে কান্নার রোল উঠবে। কে কাকে দেখে। স্বাধীনতাই এর একমাত্র প্রতীকার"—বুঝিয়ে বলে প্রবোধ।

কিন্তু বেশী দিন সে এইভাবে থাকতে পেল না। তখন Defence of India Act জাবী হয়েছে। সরকার বিপ্লবী সন্দেহে একে ওকে ধরছে আর অন্তরীণ করছে। প্রবোধকে প্রথমে রাজসাহী জেলায় তানোর থানায় অন্তরীণ করা হল। কিন্তু সেখানেও শহরের বিপ্লবীদের সাথে সংযোগের গন্ধ পেয়ে সরকার তাকে মালদহ জেলার এক থানায় অন্তরীণ করল।

প্রভাস তখন দলের নির্দেশে কলকাতার সিটি কলেজে পড়া সুরু করেছে। অখিল মিস্ত্রি লেনে একটি মেসে থাকে। একদিন সন্ধ্যার পর প্রভাস মেসে ফিরছে। গলির মুখে একটি লোককে দেখে সে চমকে উঠল। দেখতে মনে হয় যেন প্রবোধের প্রেতাত্মা। রুক্ষ এলোমেলো পাগলের মত মাথার চুল, মলিন বস্ত্র, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, গায়ে জামা নেই, ময়লা ছেঁড়া ধুতির আঁচল গায়ে দিয়ে—এ বাড়ী সে বাড়ী চেয়ে চেয়ে দেখচে পাগলের মত।

প্রভাস আরো কাছে গেল এই বিকট মূর্তির! এইবারে পাগলটা ফিরে চাইল প্রভাসের দিকে,—তার মুখে আনন্দের হাসি ঝিলিক মেরে গেল। প্রভাসের অবস্থাও বর্ণনাতীত। ইচ্ছে হয় জড়িয়ে ধরে;—কিন্তু পথচারীর দল! কেউ যদি দেখে। এই বিবেচনা সংযত করল হৃদয়াবেগ। আকস্মিক মিলনের আনন্দপ্লাবনে নীরবেই ভেসে গেল দু'টি তরুণের প্রাণ।

প্রভাস যায় আগে আগে,—পিছে পিছে প্রবোধ! মেসে ঢুকেই হাত ধরে প্রবোধকে প্রভাস নিজের ঘরে নিয়ে গেল। তারপর আলো নিভিয়ে দুজন দুজনকে প্রাণভরে আলিঙ্গন করল। কিন্তু মুহূর্তমাত্র বিলম্বের অবসর নেই। মেসের অন্য কেউ দেখার আগেই প্রবোধকে রীতিমত ভদ্রলোক সাজাতে হবে। আলো জ্বেলে ক্ষিপ্রতার সাথে চলল দাড়ি কামানো—তেল সাবানের সাহায্যে চেহারাটি মোলায়েম করা আর বেশ পরিবর্তন। আধ ঘণ্টার মধ্যেই প্রবোধ রীতিমত ভদ্রলোক। মুড়ি আর দই খিদের জ্বালা কিছুটা মিটালো। এইবার প্রভাস জিজ্ঞাসা করলো—"এখন বল ব্যাপার কি?" প্রবোধ বললে, "ব্যাপার অত্যন্ত সাধারণ.—চলে এলাম।"

"চলে যে এসেছিস তা' তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু কেমন করে এলি? তোর জুতো জামা কোথায়? পাগল সেজেছিস্ কেন?"

বাধা দিয়ে প্রবোধ বললে—"আর বেশী জেরা করিসনে। সব বলছি। আগে আর এক গেলাস জল দে। গলাটা মাঝে মাঝে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে। কয়েকদিন পর খাওয়া কিনা!"

এক নিঃশ্বাসে আর এক গ্লাস জল শেষ করে প্রবোধ সুরু করল কাহিনী।—"ওরা ভেবেছিল অন্তরীণের আদেশ দিয়েই আমাকে দাবিয়ে রাখবে। অর্থাৎ এক টুকরো কাগজে "The Governor-General-in-Council is pleased to make the following orders" লিখে আমার বুকে সেঁটে দেবে আর তারই চাপে আমি দেবে যাব। কিন্তু গভর্ণর জেনারেলকে প্লীজ করার ইচ্ছে আমার মোটেই ছিল না। তাই একদা নিশীথ রাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেম। বৃষ্টি হচ্ছে। তারই মধ্যে হন্ হন্ করে হেঁটে হাজির হলেম মহানন্দার ধারে। ভাবলেম যদি একখানা নৌকো পাই তাতে চেপে 'অকূলে দেব তা ভাসায়ে.' কিন্তু সংসারের নিয়ম 'যাহা চাই তাহা পাইনে।' তাই জামা জুতো মহানন্দাকে উপহার দিয়ে জলে নামলেম। বেশী কষ্ট হলনারে প্রভাস! মাথার উপর টুপ টাপ থাকায় সাঁতারের ঝুপ ঝাপ

ঢাকা পড়ে গেল। কিছুক্ষণ মহানন্দে মহানন্দায় সাঁতার কেটে এক চরে এসে ঠেকলাম। হাঁটা সুরু করলেম। বোধ হয় প্রায় মাইল দেড়েক এসেছি। মাঝে মাঝে ঝাউয়ের জঙ্গলে পথ আটকায়। বড়ই কষ্ট হল এর ভিতর দিয়ে যেতে। এই ত্যাখ গা কত ছড়ে গেছে। ধুতি খানাও মাঝে মাঝে ছিঁড়ে গেল। মনে হল শূয়োর শেয়াল আশ পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দে মাঝে মাঝেই চমকে উঠেছি। কিন্তু ওরাও বোধ হয় আমাকে ওদের চেয়ে বলশালী কোন জানোয়ার ভেবেছে। তাই ছুটে পালিয়েছে পাশ দিয়ে—আক্রমণ করেনি। সব চেয়ে বেশী ভয় করছিল সাপের। নদী-চরের ঝাউবনে কত সাপ থাকে জানিস্‌তো। যাহোক চর পার হয়ে এলেম আর একটা নদীর তীরে। তার তর্জন গর্জন শুনেই বুঝলেম ইনি আমাদের চিৎপরিচিতা জননী পদ্মা!”

প্রভাস মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনে যাচ্ছিল প্রবোধের কাহিনী। হঠাৎ সে প্রশ্ন করলে—“পদ্মাতেও ঝাঁপ দিলি নাকি?”

“হ্যাঁ, দিলাম”—জবাব দিল প্রবোধ।

“তবে আত্মহত্যার জন্যে নয়—সাঁতরে পার হবার জন্যে। হলামও। কি জানিরে কে যেন আমার মনে যুগিয়েছে অদম্য প্রেরণা—দেহে দিয়েছে অসুরের শক্তি। আমি ভাবি আর অবাক হয়ে যাই। তখনকার প্রবোধ যে কত বড় শক্তিশালী ভেবে ঠিক পাই না। তুই তো ফিলসফার। বলতো—বলতো—এ কিসের প্রেরণা—কার শক্তি?”

“প্রেমের”—

হা হা করে বিকট হেসে উঠল প্রবোধ। হাসে আর বলে—“প্রেম? প্রেম কিরে? আমি প্রেমিক? বিল্বমঙ্গল নাতো?” বাধা দিয়ে প্রভাস বলে, “হ্যাঁ—হ্যাঁ—তুই প্রেমিক। তবে দেশপ্রেমিক! দেশপ্রেমই তোকে প্রেরণা যুগিয়েছে।”

“যাক—খুব বাঁচিয়েছিস্‌ যা হোক। শেষে যে “কই সই। কোথা

চিন্তামণি”—বলে পথে পথে বেড়াতে হয়নি এই ঢের! তারপর শোন্! পদ্মাতো পার হলেম। কিন্তু পাড়ের ওপর উঠতে পারিনে। হাত পা একদম অসাড়। কিছুটা শুয়ে থাকলেম। এ দিকে ভোর হয়ে আসছে। আর বেশী দেরী করা যায় না। হয়তো ধরা পড়ে যাব। তাই হামাগুড়ি দিয়ে কোন প্রকারে উপরে উঠলেম। আঁধারটা তখন ফিকে হয়ে এসেছে। একটা পথের দাগ ধরে চলতে লাগলেম। কিছুদূরে যেয়ে একটি জঙ্গল পেয়ে তাতে ঢুকলাম। আশশ্যাওড়ার ফল আর করঞ্চা যে এত মিষ্টি লাগে—তা তো আগে জানতেম না। এর পর থেকে দিনের বেলা জঙ্গলে লুকিয়ে থাকি আর রাতে পথ চলি। বিপদ হল এই চেহারা নিয়ে। তোরা হামেশাই বলেছিস্—প্রবোধ চেহারায় রাজপুত্তুর। কিন্তু এই রাজপুত্তুরই শোত্তুর হয়েছে আমার। কালো কদাকার হলে মিশে পড়তাম চাষী-মজুরের দলে। এত কষ্ট পেতে হত না—বেশ আসা যেত।”

পরদিন প্রত্যূষে প্রভাস প্রবোধকে দলের নেতা রাজেন বাবুর বাসায় নিয়ে গেল। রাজেন বাবু জিজ্ঞেস করলেন, “দলের নির্দেশ না লইয়া চইল্ল্যা আইলেন যে?”

গম্ভীর হয়ে প্রবোধ জবাব দিল—“অর্থাৎ শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয়েছে। তা হয়েছে। কিন্তু শৃঙ্খলের শব্দটা কাণে বড়ই বাজছিল। তাই রেগে-মেগে ভাঙ্গতে গিয়ে শৃঙ্খল,—ভেঙ্গে ফেলেছি শৃঙ্খলা।”

রাজেন বাবু, জ্যোতি বাবু, প্রভাস সব একসাথে হেসে উঠলেন। রাজেন বাবু বললেন—“Good! অখন আপনারে কি কাজে লাগাই—কয়েন তো! একটা জিলার অর্গানিজেশনের ভার লইয়া যান্ গিয়া।”

—“অর্থাৎ শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্যে শাস্তি দিতে চান। ভার দিলে মাথা পেতে নিতে হবে। কিন্তু আমার যে একটা মস্ত দোষ আছে। কেউ যদি একবার কথা না শোনে দ্বিতীয়বার বলার আগেই আমার হাত চলে যায়।”

রাজেন বাবু জবাব দিলেন—“যে ভার দিত্যাছি, এইবার দেখুম

হাত চলে—না মুখ চলে।”

ত্রিপুরা জেলার ভার নিয়ে প্রবোধ চলে গেল কুমিল্লায়। সেখানে সকলে তাকে রঞ্জনদা নামে ডাকে। ছেলে মহলে রঞ্জনদা ভারী প্রিয়। বিশিষ্ট ছাত্রকর্মী অতীন রায়, যোগেশ চ্যাটার্জি, ভটচায্ ভ্রাতৃদ্বয়, অমূল্য মুখার্জি, সুরেন রায়, মনীন্দ্র চক্রবর্তী সুযোগ পেলেই তাঁর চার পাশে ভিড় করে আসে। ছেলেরা বলে—“রঞ্জনদা! আপনাগো ভ্যাশের কথা খুব খারাপ। একবার কয়েন তো শুনি ‘খাল্যাম— যাল্যাম এঠি ওঠি”—সব একসাথে হেসে ওঠে।

রঞ্জনদা বলেন—“আমার কথা তো খারাপই লাগবে। আমি যে বলতে পারিনে—মাছের জুল - কোরতাম পাবতাম না—খাইতাম না ক্যারে—”

ছেলেরা জোর করে রঞ্জনদার মুখ চেপে ধরে।

কেন্দ্র থেকে খবর এসেছে—টাকা চাই, বিশেষ প্রয়োজন। Violence Department এর অন্যতম অধিনায়ক জামাইবাবু তখন কুমিল্লায়। তিনি একটা Swift action এর ব্যবস্থা করলেন।

ত্রিপুরা জেলার ললিতাসর গ্রামে এক মহাজনের গৃহে ছয়জন সাথী সহ তিনি হানা দিলেন। রঞ্জনদাও ছিল এই দলে। দুটি মশার পিস্তল, দুটি রিভলভার, ছেনি, হাতুড়ী মাত্র সম্বল নিয়ে তাঁরা হাজার দশেক টাকা লুটে নিলেন। কিন্তু বাড়ীর বাইরে এসেই চক্ষু চড়কগাছ। দলে দলে গ্রামবাসী হৈ হৈ করে ছুটে আসছে তাঁদের দিকে। রঞ্জনদা’রা মাঠ ভেঙ্গে দৌড় দিলেন। কিন্তু কাঁচা টাকার থলে ঘাড়ে করে দৌড়ানো এক হাঙ্গামার ব্যাপার। ওধারে লাঠি, সোটা, বর্শা—যে যা পেয়েছে তাই নিয়েই গ্রামবাসীরা ছুটে আসছে তাড়া করে। মাঠ পেরিয়ে গ্রামান্তরে ঢুকতেই সেখানকার লোকরাও ‘ডাকাত’ ‘ডাকাত’ হৈ হল্লা শুনে পথরোধ করে দাঁড়ায়। অনুসরণকারী জনতা যেই কাছাকাছি আসে অমনিই রঞ্জনদা’রা ফেলে দেন

এক থলে টাকা। জনতা থমকে দাঁড়ায়—এই অবসরে রঞ্জনদারা এগিয়ে যান। এই প্রকারে প্রায় মাইল তিনেক এসেছেন তাঁরা। কিন্তু ততক্ষণে পাঁচ সাত গ্রামের লোক পথে বেরিয়েছে। গত্যন্তর না দেখে স্বদেশী ডাকাতরা একটি জঙ্গলে আশ্রয় নিলেন। অনুসরণকারী জনতা জঙ্গলের নিকটবর্তী হতেই জামাইবাবু চীৎকার করে বললেন—"ভাই সব ফিইরা যাও। আমাগো সোনার ছ্যাশ যারা লুটট্যা খায় তাগো তাড়ামু আমরা ছ্যাশ হইতে। হের লাইগা টাকা চাই। তাই লুটছি মহাজনরে। হের লাইগা তোমরা জান দিবা? আমাগো হাতে পিস্তল আছে—বন্দুক আছে। তোমরা আর আগাইলে গুলি করুম। ক্যান্ মিছামিছি জান দিবা—কওতো? তাই আবার কই—ফিইরা যাও—ভাই সব! ফিইরা যাও।"

সঙ্গে সঙ্গেই রিভলভার ও পিস্তল গর্জে উঠল। জনতা থমকে দাঁড়াল। কিন্তু কে একজন চীৎকার করে বলল, "পটকা রে—পটকা।" আবার বিরাট কোলাহল সুরু হল, জনতা মার মার শব্দে এগিয়ে আসতে লাগল। এবারে রঞ্জনদারা সত্যই গুলি চালালেন। কিন্তু মশার পিস্তলের ছোট্ট শব্দ। ফলে গুলি খেয়ে লোকও পড়েছে—ভ্রূক্ষেপহীন ভাবে জনতাও এগিয়ে চলেছে। স্বদেশী দল গুলি চালায় আর জঙ্গলের ভিতরে ধীরে ধীরে পিছু হটে। এইভাবে কিছুটা এসেই রঞ্জনদা বললেন, "একি? আমি যে আর দাঁড়াতে পারিনে। আমার সারা শরীর ঝিম ঝিম করছে। পায়ে কিসে যেন কামড়েছে—নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।"

সর্দার (শ্রীহট্টের প্রফুল্ল রায়) আর ষ্টার এসে রঞ্জনদাকে বয়ে নিয়ে চলল। এধারে অপর চার জন সমানেই চালাচ্ছে গুলি। ক্রমে রঞ্জনদার কথা জড়িয়ে এল। জড়িত কণ্ঠে তিনি বললেন—"ভোজালী দিয়ে আমার মাথাটা কেটে নিয়ে সরে পড়ুন। সর্পাঘাত—সর্পাঘাত! আমি বাঁচব না—আপনারা বাঁচুন—"

সর্দার বলে উঠলেন—"আমাগো প্রাণ রইতে ছাড়ুম না আপনারে।"

বয়েই নিয়ে চললেন তাঁরা।

কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। নিয়তির আঘাত রোধ করা গেল না। রঞ্জনদার দেহ এলিয়ে পল,—মুখ দিয়ে ফেনা বের হতে লাগল। হৃার আর সর্দার তাঁকে শুইয়ে দিলেন জঙ্গলের মধ্যে। নাকের কাছে হাত ধরে বুঝলেন নিঃশ্বাস চলছে না। আর কোন আশা নেই দেখে উভয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে নীরবেই বিদায় নিলেন মহানিদ্রিত বন্ধুর কাছে।

পরদিন বৈকালে দশটি লাশ এসে পৌছিয়েছে কুমিল্লার মর্গে। শহরময় গুজব রটেছে—ডাকাত মরেছে—তার লাশ এসেছে।

অমূল্য, মনীন্দ্র আরও কয়েকটি ছেলে মর্গে ডাকাতের লাশ দেখতে গেছে!—দশটি লাশ পড়ে রয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে একটিকে দেখেই তারা চমকে উঠলো। সর্বাঙ্গে আঘাতের চিহ্ন, বিবর্ণ—কালো—চেনাই যায় না। পড়ে আছেন রঞ্জনদা।

১৯ ২ সাল। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ছোট ফিলসফার (জিতেশ লাহিড়ী) পার্টির সংগঠনে গিয়েছেন বগুড়ায়। তার পিছু পিছু স্পাই ঘুরছে। কোন মতে তাঁদের এড়িয়ে সে গেল কংগ্রেস নেতা শ্রীসুরেশ দাশগুপ্তের গৃহে। চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলো—"সুরেশদা! যতীনদা কোথায়?"

সুরেশবাবু বিস্মিত হলেন তাকে দেখে। বললেন, "ইঃ—তোমার সারা শরীর যে ভিজে গেছে বৃষ্টিতে! আচ্ছা—বলতে পার তোমাদের এই গোপন তপস্যার ফল কি? এতে লাভ?"

—"লাভ স্বাধীনতা"—হেসে উত্তর দিল ছোট ফিলসফার। "আগে স্বাধীনতা লাভ হোক—তখন আমাদের তপস্যার ফল জনতার প্রতিনিধিদের হাতে সঁপে দিয়ে বিদায় নেব আমরা!—যাকগে—যতীনদার বাসাতেই যাই।"

যতীনদা বৈঠকখানায় একাই বসে ছিলেন। ছোট ফিলোকে দেখেই মুখ ফিরিয়ে নিলেন। একটি কথাও বললেন না। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল ছোট ফিলসফার। তারপর আহত স্বরে বলল—"আমাকে কি ফিরেই যেতে হবে? সারাদিন খাওয়া হয়নি। এখন সন্ধ্যা ছয়টা। এখানেও কি দুমুঠো ভাত জুটবে না?—যাক—

"ও তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে—
তা বলে ভাবনা করা চলবে না"—

ছোট ফিলো ফিরে যাচ্ছিল। হঠাৎ যতীনদা রাগে ফেটে পলেন। চীৎকার করে বললেন—"বেরিয়ে যা—বেরিয়ে যা—আমার সুমুখ থেকে। খুনী ডাকাতের দল—তোরা শুধু খুন করতেই জানিস্ ডাকাতি করতেই জানিস! তোরা কি করে জানবি দেবতার মর্যাদা? তোরা প্রবোধকে ডাকাতিতে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলেছিস, —তোরা শালগ্রাম শিলা দিয়ে বাঁটনা বেঁটেছিস্!"

তারপর কিছুটা থেমে আবার বললেন—

"ওরে—ওরে! আমি যে কল্পনাও করতে পারিনে প্রবোধ ডাকাতিতে গিয়ে মারা গিয়েছে। যদিও সে ভিন্ন দলের কিন্তু সে যে সর্বদাই আমার মনশ্চক্ষে ভেসে উঠেছে বিপ্লবী জনতার নায়করূপে—বিপ্লবী বাহিনীর সেনাপতি-মূর্তিতে! ওরে! আমি যে ভাবতেই পারিনে প্রবোধ ডাকাত! তোরা বর্বর—তোরা দস্যু! তোরা দেবতাকে ডাকাত বানিয়েছিস্—তোরা দেবতার অমর্যাদা করেছিস্ - তোরা করেছিস শালগ্রামের অপমান।"

জল ঝরতে লাগল যতীনদা'র চোখে। এই উচ্ছ্বাসের মুখে ছোট ফিলো খেই হারিয়ে ফেলেছিল। যতীনদার চোখের জলে তার অন্তরও ছলছলিয়ে উঠেছিল। কোনরূপে আত্মসম্বরণ করে সে যতীনদার পদধূলি নিয়ে ধীরে ধীরে বলল—"যতীনদা! এতো শালগ্রামের অপমান নয়,—এযে শালগ্রামের আত্মদান।"

মাসীমা

বীরভূম জেলাব নলহাটি থানার ঝাউপাড়া গ্রামে মাইনিং ক্লাশের ছাত্র শ্রীনিবারণ ঘটকের মাসীমা দুকড়িবালা দেবীর বাড়ী। মাসীমা বড়ই ভালবাসেন নিবারণকে,—নিবারণও তাঁকে মায়ের মতই দেখে। অবসর পেলেই নিবাবণ মাসীমার বাড়ী যায়—কখন কখনও পাঁচ সাতদিন থাকেও সেখানে। ইদানীং তার যাতায়াত বড়ই ঘন ঘন হয়েছে। মাঝে মাঝে দু'একজন বন্ধুও যায় তার সাথে। মাসীমা তাতে খুশীই হন। কেউ কেউ মাসীমাকে "মাসীমা" বলে ডেকে ডেকে নিবারণের মতই নিকটে গেছে তাঁর—বড় সুবোধ ছেলে এরা। কোন দেমাক নেই, হৈ হল্লা নেই,—শাকচচ্চড়ি যা' পায় তাই খায়। কিছুদিন এইভাবে আনাগোনার পর নিবারণের আচরণ ক্রমেই যেন মাসীমার কাছে হেঁয়ালীর মত ঠেকতে লাগল। নিবাবণ ব্যাপাবেব মধ্যে বই লুকিয়ে আনে—জিজ্ঞেস করলে বলে— "ও একখানা মাইনিং বই মাসীমা!" কিন্তু একদিন তো তিনি দেখেই ফেলেছেন বইখানাব নাম "দেশের কথা"—প্রণেতা সখাবাম গণেশ দেউস্কব। তাবপর লুকিয়ে চুরিয়ে আবো আসে বই। মাসীমার দৃষ্টি এড়ায় না। চুপি চুপি আনা বই চুপি চুপিই তিনি দেখেন। অবশেষে একদিন একখানি বইয়ের ভাঁজে "যুগান্তর" শীর্ষক ইস্তাহার দেখে তিনি বীতিমত শঙ্কিত হলেন। নিবারণকে ডেকে বল্লেন—"নিবারণ! এসব তোমাব হচ্ছে কি? তুমি স্বদেশীদলে ঢুকেছ। জান এতে তোমার সমূহ বিপদ?"

নিবাবণ একগাল হেসে জবাব দিল—"তোমার যেমন বুদ্ধি মাসীমা! আমি যোগ দেব স্বদেশীদলে! আমি জানি ওরা খুন করে —ডাকাতি করে—সরকারের বিরুদ্ধে তলে তলে ষড়যন্ত্র করে। আমি

মাইনিং-এর ছাত্র। কালে হব কয়লাখনির ম্যানেজার। আমি ঐ ডাকাত দলে যোগ দিয়ে নিজের ভবিষ্যত খোয়াব? কি যে বল!"

তবু মাসীমার মন থেকে সন্দেহ যায় না। নিবারণের সাথে আরো অনেকে আসে তাঁর বাড়ীতে। নিবারণকে জিজ্ঞাসা করলেই বলে—"এঁকে চেন না মাসীমা? বা—রে! বেশ মজাতো! এ যে আমাদের সুধাদির দেওর,—সেই যে দেখা হয়েছিল বোলপুরে!" এমনি কত কি বলে সে অর্থাৎ জোর করেই চেনাতে চায়। মাসীমা হাসেন আর বলেন—"থাক্ থাক্—ঢের হয়েছে। আর পরিচয়ে দরকার নেই; দয়া করে এইবার বল খাওয়া হয়েছে তো?"

একদিন এক বয়স্ক লোক এসে হাজির হলেন নিবারণের সাথে। সদাপ্রসন্ন—সাদাসিদে অথচ গম্ভীর। মাসীমা জিজ্ঞেস করার আগেই নিবারণ পরিচয় দিল--"ইনি আমাদের মাষ্টার মশাই। খুব ভালো লোক - আর খুব ভালবাসেন আমাকে। তোমাকে দেখাব বলে নিয়ে এসেছি!"

সহসা মাসীমা চটে গেলেন। রাগত স্বরে বললেন—"সব তাতেই তোমাদের ছেলেমানুষি! মাষ্টার মশায়কে আনছো, আগে কেন জানাওনি আমাকে? পাড়াগাঁ, এখন কি করি আমি!"

"কিচ্ছু করতে হবে না মাসীমা! স্রেফ ডাল আর ভাত—" নিবারণ হাসিমুখে জবাব দেয়।

খাবার সময় নিবারণ সবিস্ময়ে দেখল মাসীমা বিরাট আয়োজন ক'রে ফেলেছেন। মাষ্টার মশাই তা' দেখে বল্লেন—"একি নিবারণ! এ যে রাজভোগ। অভাগার পেটে সইলে হয়!" তারপর মাসীমাকে ডেকে সস্নেহে বললেন—"শোন মা! বৃটিশ ভারতের বাইশ কোটি লোকের মধ্যে প্রায় সাড়ে দশকোটি অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। কুকুর বিড়ালের মত জীবন যাপন করছে তারা। অশন বসনের বিলাস তো আমাদের শোভা পায় না মা। আজ আমার জন্য যে আয়োজন করেছ তুমি তাতে অন্ততঃ চারজন ভারতবাসীকে অনাহারে থাকতে

হবে। তাই. আমি যদি সব না খাই তুমি দুঃখ করো না। মনে করো তোমার ক্ষ্যাপা ছেলের এ একটা ক্ষ্যাপামি।"

কথাগুলি এত মিষ্টি লাগল মাসীমার যে তিনি কোন প্রতিবাদের কথাও খুঁজে পেলেন না। মনে হল যেন কোন ঐন্দ্রজালিক মুহূর্তেই দিয়ে গেলেন দিব্যদৃষ্টি ;—তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল ভারতের রূপ। কোটি কোটি কঙ্কালসার নরনারী নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ছুটে চলেছে দলে দলে। মুখে হাসি নেই, ভাষা নেই, নয়নে নেই দীপ্তি, বুকে নেই আশা। —কে যেন কেড়ে নিয়েছে সব। দীর্ঘশ্বাস আর অশ্রু সম্বল ক'রে এই জীবন্মৃতের দল ধুঁকে ধুঁকে অতিক্রম করছে জীবনের পথ। জল এলো মাসীমার চোখে।

বিদায়ের সময় —"বাবা! আবার আসবেন"—বলেই যেমন তিনি মাষ্টার মশাইকে প্রণাম করতে গিয়েছেন অমনিই কিছুটা পিছিয়ে মাষ্টার মশাই বলে উঠলেন—"কর কি—কর কি, আমি শুদ্দুর—কায়েত—আর তোমরা যে বামুন! তারপর আমি যে তোমার ছেলে—বুড়ো ছেলে—ছেলেকে কি প্রণাম করতে হয়?" মাষ্টার মশাই ক্ষিপ্রতার সাথে মাসীমাকে প্রণাম করলেন।

মাসীমার মনে হ'ল কোন এক দেবতার স্নেহস্পর্শ সর্বদেহে এনেছে রোমাঞ্চ—আশীষের পুষ্পবৃষ্টি হয়েছে তাঁর শিরে,—অন্তর গিয়েছে ভরে।

এরই কয়েক দিন পরে। কোনক্রমে বাইরের ঘরের দোর খুলে গভীর রাতে নিবারণ ছয় সাতটি বন্ধু সহ ঢুকেছে ঘরে। মাসীমা যেন না জানেন। ভোরের আগেই সরে পড়বে সকলে—থাকবে একা নিবারণ। ফিসফিস করে কথা চলেছে তাদের। হঠাৎ মাসীমার শব্দ পেয়ে, ফিসফাস গেল থেমে—নিঃশ্বাস প্রশ্বাসও যেন আর চলে না। তবু তারা রক্ষে পেল না। মাসীমা দোরের কাছে এসে অনুচ্চস্বরে বললেন—"দোর খোল।" উপায় নেই—খুলতেই হ'ল দ্বার। আলো নিয়ে ঘরে ঢুকেই মাসীমা অবাক হ'য়ে গেলেন। একটি

ছেলের অবস্থা দেখে তিনি শিউরে উঠলেন। ছেলেটির শরীরে দুই তিন স্থানে গভীর ক্ষত। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটেছে—কাপড়-চোপড় ভিজে লাল হয়ে গেছে—অথচ মুখে একটি কাতর শব্দ নেই—দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে রয়েছে সে। "আমার মরণ হয় না!" বলেই মাসীমা চোখে আঁচল দিলেন। ছুটে নিজের ঘরে গিয়ে ফিরে এলেন আইডিনের শিশি আর খানিকটা তুলো নিয়ে। ক্ষতস্থানগুলিতে আইডিন ছুঁইয়ে তার উপর দিলেন গাঁদার পাতা থেঁতো করে। তার উপর তুলো চেপে নিপুণ হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন। বাঁধা শেষ হলে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন আলো নিয়ে। প্রায় ঘণ্টা খানেক বাদে আবার ফিরে এলেন তিনি। নিবারণকে সম্বোধন করে বললেন—"পিণ্ডি গিলবে এসো।" আদেশের স্বরে বললেন—"নিয়ে এসো ওদের।" বিনা বাক্যব্যয়ে সকলেই চলল মাসীমার পিছে পিছে। খেতে বসিয়ে দিয়ে ধমকিয়ে বল্লেন—"খাওয়া হয়নি বলতে পার না তুমি? এতগুলি ছেলে অনাহারে থাকবে খেয়াল নাই তোমার? বেশ বাহাদুরীর কাজ করে এসেছ—নচ্ছার কোথাকার!"

ভোরের আগেই সকলে সরে পড়েছে—মায় ঐ আহত ছেলেটি পর্যন্ত। দু'একদিনের মধ্যেই মাসীমা শুনতে পেলেন সিয়ারসোল খনির কাছে এক পল্লীকুটীরে বিস্ফোরণ উপলক্ষ ক'রে পুলিশ আবিষ্কার করেছে এক বোমার কারখানা। কেউ ধরা পড়েনি তবে প্রচুর বোমার খোল ও মাল মশলা পুলিশের হস্তগত হয়েছে। জোর চলেছে অনুসন্ধান। অঞ্চলটি ছেয়ে ফেলেছে সি, আই, ডি। মাসীমা মনে মনে প্রমাদ গণলেন। পাছে যদি ধরা পড়ে ওরা। বারবার ঐ আহত ছেলেটির মুখখানি তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে—মনে হয় কি কঠিন প্রাণ এদের। মরণের মুখেও যন্ত্রণা প্রকাশ নেই।

এই সহানুভূতি, এই করুণা ক্রমে ক্রমে আগুন জ্বালল মাসীমার মনে। নিবারণ, মাষ্টার মশাই, নিবারণের সঙ্গীরা, দেশের কথা, যুগান্তর সবটায় মিলে তাঁর অন্তরে এক দুর্বোধ্য জ্বালার দাবানল সৃষ্টি

করল। কিছুই ভাল লাগে না মাসীমার। পিতা, পতি, পুত্র, ঘর, সংসার সবই অসার বোধ হতে লাগল। দেহ মন ক্রমেই রুক্ষ হতে লাগল—সংসারের ভাল কথাটাও যেন আর তাঁর গায়ে সয় না। এই জ্বালার একমাত্র শান্তি-প্রলেপ ছিল নিবারণ। নিবারণ এলে মাসীমা শান্ত হন,—মাসী বোনপোতে মিলে দেশের কথা আলোচনা করেন।

সেই সময় সিয়ারসোল রাজবাড়ীতে একজন নূতন কর্মচারী এসে জুটেছেন। নাম তাঁর রণেন বাবু। রণেন বাবু লাঠিখেলা, মুষ্টিযুদ্ধ, ছোরাখেলায় ভারী ওস্তাদ। তরুণ মহলে তাঁর অসীম প্রতাপ তিনি সকলকে লাঠি খেলা শেখান। নিবারণ ভারি প্রিয় তাঁর। নিবারণ মাঝে মাঝে মাসীমাকে সিয়ারসোল নিয়ে যেত—লাঠিখেলা, মুষ্টিযুদ্ধ, অসিখেলা দেখতে। ক্রমে মাসীমার সাথে রণেন বাবুর পরিচয় হল। তাঁর শৌর্য, বীর্য, সাহসিকতা ও আত্মপ্রত্যয় দেখে মাসীমা মুগ্ধ হলেন।

কিন্তু বেশী দিন গেল না। ক্ষুদিরামের গ্রেপ্তারকারী নন্দলাল ব্যানার্জি কোলকাতায় নিহত হলেন। সেই সম্পর্কে সি, আই, ডিরা ছুটে এল সিয়ারসোলে রণেন গাঙ্গুলীর সন্ধানে। সিয়ারসোল আর পার্শ্ববর্তী গ্রাম সমূহের অধিবাসীরা শুনে স্তম্ভিত হল রণেন গাঙ্গুলী রাজষ্টেটের নিরীহ কর্মচারী নয়—সে হচ্ছে মুরারীপুকুর বোমা মামলার ফেরারী আসামী প্রখ্যাত বিপ্লবী শ্রীবিপিন গাঙ্গুলী।

এরপর এক সমস্যা দেখা দিল। নিবারণের বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হবার মধ্যে। নিবারণ ঘোরতর আপত্তি তুললে। কিছুতেই রাজী হয় না বিয়ে করতে। তাকে রাজী করানোর ভার সকলে মিলে দিল মাসীমাকে। মাসীমা বোনপোতে প্রবল তর্ক সুরু হল। সর্ত রইল, যে হারবে তাকে অপরের অনুসৃত পথ ও মত বরণ করতে হবে। মাসীমা বোঝান গার্হস্থ্য ধর্ম,- বোঝান সতীকে পতির অনুগামিনী করে নেবার শিক্ষাদানের কথা,—নিবারণ বলে দেশসেবার কথা,—বিবাহে সে পথে সম্ভাব্য বাধা বিপত্তির কথা। অবশেষে তর্কযুদ্ধে

মাসীমা হেরে গেলেন। কিন্তু এই পরাজয়ে তাঁর মনে এল না কোন গ্লানি,—এল অপার আনন্দ। মনে হল পরাজয় দিয়েছে তাঁর ঈপ্সিতের সন্ধান, বহু দিনের কামনার পথে হাত ধরে নিয়ে এসেছে। এই পরাজয়ই যেন তিনি কামনা করেছিলেন মনের কোণে সংগোপনে।

মাসীমা বল্লেন—"নিবারণ! এইবার দলে ভর্তি করে নাও।" নিবারণ চিন্তিত হল। সন্দেহের সুরে বলল—"এ পথ অত্যন্ত ভীষণ, —পদে পদে বিপদ। গেরস্ত ঘরের বৌ,—ছেলেপুলের মা,—তুমি কি পারবে এ পথে চলতে? বড় বড় বীরপুরুষেরা হিম সিম খেয়ে যায়! নাই বা এলে।"

সহসা মাসীমাব অন্তরের জ্বালা ফুটে বেরুল চোখে মুখে। দৃপ্ত কণ্ঠে তিনি বললেন—"আত্মম্ভরিতায় অন্ধ হয়েছ তোমরা। জনা, বিহুলা, দুর্গাবতী, লক্ষ্মীবাঈ—এ দেশের মেয়ে নয়? মনে রেখ, তুমি যদি জীবন দিতে পাব দেশের জন্যে, তোমার মাও পারে। সিংহের জননী সিংহিনীই হয়।" মাসীমা বিপ্লবদলেব সভ্যা হলেন।

মাসীমার মনে অমিত তেজ। অভূতপূর্ব সাড়া তাঁর অন্তরকে চঞ্চল করে তুলেছে। দলেব সব কাজেই তাঁর উৎসাহের অন্ত নেই। মাতা ও সন্তান সহকর্মী। দুজনের মনেই আনন্দ আর ধরে না।

একদিন নিবারণ একটা বাক্স এনে মাসীমাকে দিয়ে বলল,—"খুব সাবধানে রেখ, মাসীমা। ধরা পলে একদম কালাপানি।"

বাক্সের ভিতর ছিল সাতটি মশার পিস্তল। রডা কোম্পানীর খোয়া যাওয়া মাল। মাসীমা নেড়ে চেড়ে দেখলেন। গুলিভরা, বেব কবা, সেফ্‌টি রেঞ্জ—সব শিখে নিলেন নিবারণের কাছে। বেশ যত্নে জিনিষগুলো রাখলেন তিনি।

১৯১৭ সালের জানুয়ারী মাস। মাসীমা ঘুম থেকে উঠে পাকঘরে যেতেই দেখতে পেলেন প্রাচীরের উপর দুই তিনটি পুলিশের সেপাই। খিড়কীর দোর জানালা খুলেই তিনি বুঝলেন সমস্ত বাড়ীখানি পুলিশ

ঘিরে ফেলেছে। মাসীমা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। তাঁর সমস্ত অন্তর আর্তনাদ করে উঠল। কিন্তু এই আর্তস্বরের মাঝে নিজের চিন্তা কিছুই ছিল না। নিবারণ, বিপ্লবদল ও জিনিষগুলি—এই তিনটিই তাঁর হাহাকার জুড়ে রয়েছে।

অনেক তল্লাসীর পর পুলিশদল বের করল মশার পিস্তলের বাক্সটি। সি, আই, ডি অফিসার সুবোধ চক্রবর্তী মাসীমাকে জিজ্ঞেস করলেন—"চাবি কোথায় ?"

"জানি না"—উত্তর দিলেন মাসীমা।

তালা ভেঙ্গে বাক্স খোলা হল। সাত সাতটি মশার পিস্তল দেখেই পুলিশ দল আনন্দে নৃত্য করতে লাগল। সুবোধ বাবু মাসীমাকে প্রশ্ন করলেন—"কোথায় পেলেন এই বাক্স ?"

মাসীমা ততক্ষণে কর্তব্য স্থির করে ফেলেছেন। নিবারণকে বাঁচাতেই হবে। সে তাঁর বোনপো বলে নয়। যে কটি মুষ্টিমেয় ছেলে নিজের সুখ, সমৃদ্ধি, ভবিষ্যত পায়ে দলে স্বেচ্ছায় তেত্রিশ কোটি মানবের মুক্তির দায়িত্ব গ্রহণ করেছে—নিবারণ তাদেরই একজন। নিবারণের এই বিরাট রূপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠল মাসীমার দৃষ্টিতে। মাসীমাকে নীরব দেখে পুনরায় প্রশ্ন হল—"কোথায় পেলেন এসব ?"

"বলব না"—উত্তর দিলেন মাসীমা।

"সত্যি বলুন। নিবারণ দিয়েছে ? সব খুলে বলুন কিছু হবে না আপনার। নৈলে জেল হবে।"

"নিবারণ এর কিছু জানে না—এর বেশী কিছু বলব না"—শান্তকণ্ঠে উত্তর দেন মাসীমা।

ভীতি-প্রদর্শন, প্রলোভন, মিষ্টকথা কোনটাতেই কোন উত্তর না পেয়ে অবশেষে পুলিশদল মাসীমাকে গ্রেপ্তার করল। কোলে তাঁর শিশু সন্তান। আর আর ছেলেরা ও আত্মীয়স্বজন কাঁদতে লাগল। পুলিশের কর্তা বললেন—"কোলের ছেলেটিকে আপনি সাথে নিতে পারেন।"

নিছক মনের জোরেই অশ্রুরোধ করে মাসীমা বল্লেন "না—না—ও যাবে না আমার সাথে। আমি একাই যাব—একাই যাব।" তারপর শিশুটিকে একটু আদর করলেন তিনি। আত্মীয়স্বজনকে ডেকে বল্লেন—"আমার ছেলেদের দেখো তোমরা। ওরা যখন মা মা বলে কাঁদবে—তোমরা বুঝিয়ে বোলো—তোদের মাকে বৃটিশ সরকার ধরে নিয়ে গেছে জেলে।"

তারপর পুলিশ-পরিবেতা মাসীমা, বাংলার নিভৃত পল্লীর বধূ দুকড়িবালা অগ্রসর হলেন সিউড়ির পথে। স্পেশাল ট্রাইবুনালের বিচারের কালে তিনি যখন দেখতে পেলেন নিবারণও বেহাই পায়নি—সেও ঐ একই মামলার আসামী,—তখন আর তিনি অশ্রুরোধ করতে পারেননি। এতো করেও বাঁচানো গেল না নিবারণকে।

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে মাসীমা আর বোনপো। মৃদুস্বরে মাসীমা জিজ্ঞেস করলেন—"নিবারণ! মাষ্টার মশাই ঠিক আছেন তো ?"

ঈষৎ হেসে নিবারণ উত্তর দিল—"তিনি আগেই গেছেন।"

"এবার বলবে তিনি কে ?"

নিবারণ কিছুটা নীরব থেকে পরে চাপা গলায় উত্তর দিল—"অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ।"

বিচারে নিবারণের পাঁচ বছর ও মাসীমার তিন বছর সশ্রম কারাবাসের আদেশ হ'ল। হাসিমুখে দুইজনই ১৯১৭ সালের জেলের ভীষণতা বরণ করে নিল। দুইজনেই বদলী হল প্রেসিডেন্সি জেলে। ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের এই প্রথম নারী সৈনিক সে কালের কারাগারের দুর্বিসহ পরিবেশের ভেতর থেকে পিতার কাছে প্রথম পত্র লিখলেন—"আমি বেশ আছি। কিছুই ভেব না আমার জন্যে। দেখতে দেখতে তিন বছর কেটে যাবে। বাচ্চাদের ভুলিয়ে রেখ। তারা মা মা করে কাঁদলে আমি এখানেই চঞ্চল হ'য়ে উঠব। প্রণাম নিয়ো।—

ইতি সেবিকা

দুকড়িবালা।"

বন্ধু

গৌহাটির ফ্যান্সিবাজার মহল্লায় একখানি ছোট্ট টিনের ঘর—বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা। এই বাসায় কয়েকটি তরুণ যুবক আনাগোনা করে—বেশীর ভাগ সন্ধ্যাব পরেই। দিনের বেলায় বাইরের বারান্দায় হু'এক-খানা ধুতি-শাড়ী রোদে শুকাতে দেখা যায়, কোনদিন বা একটি ছেলেকে ইংরাজী পাঠ মুখস্থ করতেও শোনা যায়। এর বাড়া মানুষের সাড়া বড় একটা পাওয়া যায় না। রাতে কিন্তু অন্য প্রকার,—অনেক বাত পর্যন্ত আলো জ্বলে—মানুষেব আনাগোনা ও সংযত কণ্ঠের কথাবার্তায় চঞ্চল হয়ে ওঠে বাসাখানি। বাসার স্থায়ী বাসীন্দা তিনজন,—কেউ কাউকে চেনে না—অথচ প্রত্যেকেই প্রত্যেককেই পরমাত্মীয় জ্ঞান কবে। মৈমনসিংহের মণী রায় দলের আদেশে ফেরারী হয়ে জুটেছে এখানে, অপব বন্ধুরা জানে তাকে রণেশ বলে। আব একজন উত্তরবঙ্গের লোক—তার পবিচয় নৃপেন নামে। তৃতীয় ব্যক্তি একটু বেশী বয়সের—এই পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে। তিনি সমিতির প্রাদেশিক পবিচালক—ডাকে সকলে কর্তা বলে।

কর্তা একদিন বিকেলে রণেশকে ডেকে বল্লেন—"আজ সন্ধ্যায় আপ ট্রেনে তিনজন লোক আসাব কথা আছে। তাদেব একজনের বাঁ হাতে হলদে মলাটেব একখানা বই—ডানহাতে একটি পেয়ালা থাকবে। আপনি একটি মোমবাতি হাতে ক'রে ষ্টেশনে গিয়ে তাদের খুব সাবধানে নিয়ে আসবেন বাসায়।"

সত্যিই এল তিনজন লোক। একজন ছিপছিপে, লম্বা, ময়লা রং, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি,—চোখে চশমা—বয়স আন্দাজ ছাব্বিশ-সাতাশ। অপর হু'জন অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের। ফ্রেঞ্চকাট সরাসরি রণেশের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনি কি কর্তার বাড়ী থেকে

আসছেন ?" রণেশ শুধু হাসল। আগন্তুকদের নিয়ে সে চলে এল বাসায়।

এরপর থেকেই বাসা সরগরম। প্রায় প্রত্যহই দু'একজন অপরিচিত লোক বাসায় আসে। মাঝে মাঝে রণেশকে সাঙ্কেতিক চিহ্ন নিয়ে যেতে হয় ষ্টেশনে,—আবার কাউকে কাউকে পৌঁছিয়েও দিতে হয় সেখানে। পাকশাক নিজেদেরই করতে হয়,—অবশ্য তা' একদম সাদাসিদে গোছের। ডাল আর ভাত ; যদি একটা ভাজা বা একটা তবকারী থাকে, তবে তো সেদিন নেমন্তন্নের খাওয়া। বাসায় কুয়ো নেই। জলের কল থেকে রাতে আট-দশ কলসী জল আনা হয়,—তাতে পাকশাক ও খাওয়া চলে, স্নান সকলের হয় না। তাই লটারী ক'রে স্নানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একদিন যার নাম উঠল—পরের দিন তার নাম বাদ দিয়েই লটারী করা হয়।

একদিন বাসায় লোক সংখ্যা হ'ল আট। একজন বাইরের ঘরে পাহারায় থাকল। সাতজন বসল খেতে, খবরের কাগজ হ'ল আসন। মাঝখানে ভাতের হাঁড়ি আর মাছের ঝোলেব কড়াই,—দুপাশে দুখানা এনামেলের থালার পাশে বসে গেছে সাতজন। কাছেই গুলি ভরা চার-পাঁচটি রিভলভার কাগজ দিয়ে ঢাকা। ফ্রেঞ্চকাট বলে উঠলেন—"সাবধান, যেন একের হাত অন্যেব মুখে না যায়।" সকলে হেসে উঠতেই তিনি বললেন—"আস্তে।"

স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দও সংযমের চাপে আধমরা হয়ে যায়। সাধারণ মানুষের জীবন এতে হাঁফিয়ে ওঠে,—কিন্তু এদের জীবনের গতি অতি বিচিত্র। দুর্জয় সংকল্প এদের মনে—প্রকাশ তার বিঘ্নবহুল কর্মে—ভাষায় নয়। এরা যেন কর্মময় বোবারাজ্যের বাসিন্দা। সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বিষাদ, শঙ্কা, সংশয়, কিছুই যেন এদের মনে রেখাপাত করে না।

মাছ হয়েছে সেদিন। মণী রায় ওরফে রণেশ মৎস্য আহারে কৃতিত্ব দেখিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিল। চাকা চাকা মাছ পুরে

দেয় মুখে—আর কয়েক সেকেণ্ড পরেই মুখ থেকে টেনে বের করে কাঁটা কয়টি। ঠিক যেন আখমাড়াই কল—রস ভেতরে যায়, আর ছোবড়া বেরিয়ে আসে। সকলেই অবাক হয়ে দেখছে কাণ্ডখানা—হঠাৎ ফ্রেঞ্চকাট রণেশের হাত চেপে ধরে বললেন—“থাক থাক, ঢের হয়েছে, বন্ধু! আমরাও কিছু খেতে চাই।” আবার হাসাহাসি।

সেইদিন থেকে ফ্রেঞ্চকাট রণেশকে বন্ধু বলে ডাকতে সুরু করলেন, রণেশও তাকে বন্ধু বলে ডাকতে লাগল।

কয়েকদিনের মধ্যেই দুজনের মধ্যে বেশ হৃদ্যতা দেখা দিল। ঠাট্টা-ইয়াকিও চলে মাঝে মাঝে—আবার তর্কাতর্কিও হয়।

একদিন ফ্রেঞ্চকাট রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে শোনাচ্ছেন। রণেশ কবিতার ঘোর বিরোধী; বলে উঠল—“খোল-করতাল আর কবিতা—এই দু'টিই করেছে বাংলার সর্বনাশ। যে দেশে চাই বীর্যবান যুবশক্তির উদ্দাম জাগরণ, সেখানে এই সব কবিতার ভাবালুতা এনে দিয়েছে তন্দ্রার আবেশ। ঝেঁটিয়ে দূর কর একে দেশ থেকে। স্বামীজী সত্যিই বলেছেন—তোদের দেশে কি জয়ঢাক নেই—তূরী-ভেরী নেই?”

এরপর সুরু হল বিষম তর্ক। রণেশ প্রমাণ করতে চাইল বিপ্লবীর পক্ষে কবিতা পাঠ রীতিমত অপরাধ। ফ্রেঞ্চকাট রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা আবৃত্তি করে তার শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করতে গেলেন। রণেশ আরও চটে গিয়ে বলে উঠল—“আপনি একটি অপদার্থ লোক,—বিয়ে থাওয়া করে সংসারী হওয়াই আপনার উচিৎ ছিল। এই ভীষণ পথে আসা আপনার ভুল হয়েছে। তার উপর যারা আপনাকে ফেরারী করেছে, তাদের ভুলও মার্জনার অতীত।”

এরপর থেকেই বন্ধুর সম্বন্ধে বড় হীন ধারণা রণেশের মনে জমাট হয়ে উঠতে লাগল। অপদার্থ লোকটি—সারাদিন পড়ে পড়ে ঘুমোয় কোথাও নড়তে চড়তে চায় না। একদিন সে কর্তাকে বলেই বসল—“এসব লোককে কেন ফেরারী করা হয়েছে? কিছুই করে না যে! দিনরাত ঘুম—আর জাগলেই একে ওকে তাকে খোঁচা মেরে

কথা,—টিপ্পনী। সকলে রাতে পাহারা দেয়—ও কেন ঘুমুবে? ওকে পাঠিয়ে দিন না বাড়ীতে!"

কর্তা হেসে বললেন—"তাই তো। বড়ই ভুল হয়েছে ওকে এনে। আচ্ছা দেখি, কি করা যায়।"

কয়েকদিন পরের কথা। বিকেলের দিকে ফ্রেঞ্চকাট পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন বড়ই বিষণ্ন চিত্তে। রণেশ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে —"এত গম্ভীর কেন, বন্ধু?"

বন্ধু নিরুত্তর। পরে অনেক পীড়াপীড়ির পর বললেন—"কারো কাছে বলো না বন্ধু।—আমার মন আজ বড় খারাপ—বাড়ীর কথা চিন্তা করে। স্বপ্নে দেখেছি ছোট বোনটির অসুখ।"

রণেশ মনে মনে শঙ্কিত হল। এই প্রকার দুর্বলচিত্ত লোককে কোন কারণেই উচিৎ হয়নি ফেরারী করা। এতে দলের সর্বনাশ হতে পারে। সান্ত্বনার সুরে বলল—"স্বপন নিয়ে মাথা ঘামাতে আছে? পাগল আর কি!"

তারপর দলের নেতা নলিনী ঘোষের দৃঢ়চিত্ততার কাহিনী শুনিয়ে বন্ধুর মনে শক্তি সঞ্চারের প্রয়াস পেল রণেশ।—

"আমাদের নেতা নলিনী ঘোষ—যাঁর ডাক নাম রাজেন বাবু—তাঁর উপর চলেছে অমানুষিক উৎপীড়ন,—দিনের পর দিন চব্বিশ ঘণ্টা ধরে torture করে তাঁর চোখে জল আনতে পারেনি। মুখ দিয়ে একটি কথাও বের করতে পারেনি। লক্ষ লক্ষ টাকার প্রলোভন দেখিয়েছে তাঁকে,—তাঁর সেলের মধ্যে রাতে সুন্দরী মেয়েমানুষ রেখে তাঁকে আদর্শভ্রষ্ট করতে চেয়েছে,—অবশেষে পিশাচেরা পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। দালান্দা হাউসের ষোলজন প্রহরীর মাঝ থেকে পালিয়ে নলিনী ঘোষ প্রমাণ করে দিয়েছেন—বিপ্লবীর মানসিক ও দৈহিক গতি দুর্জয়,—দুর্বার।"

অতিশয় বিস্ময়ের সাথে ফ্রেঞ্চকাট জিজ্ঞাসা করলেন—"বন্ধু, দেখেছ তুমি নলিনী ঘোষকে?"

রণেশ উত্তর দিল,—"একদিন আঁধার রাতে দেখেছিলাম রাজেন বাবুকে। তাঁর গ্রেপ্তারের পর জেনেছিলাম রাজেনবাবুই নলিনী ঘোষ। বন্ধু! চেষ্টা কর তাঁরই মত হতে,—মনে বল পাবে।"

সেদিন ফ্রেঞ্চকাটের কোন আপত্তিই না মেনে রণেশ সন্ধ্যায় তাঁকে নিয়ে বেড়াতে বেরুল। কিন্তু কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই তার মন বিরক্তিতে ভরে গেল। ফ্রেঞ্চকাট কেবলই বলে—"চল বন্ধু! বাসায় ফিরে যাই!" অগত্যা বাসায়ই ফিরতে হল। কিন্তু ফেরার সময় পথের মাঝে অনাবশ্যক দেরী করতে লাগল এই অপদার্থ লোকটি। রাস্তায় কেবলই এপাশ—ওপাশ করে—আর মোড়ে মোড়ে প্রস্রাব। রণেশের মনে সন্দেহ হতে লাগল—কোন ব্যারাম নেইতো? যে রকম চেহারা, চাল চলন,—অসম্ভব নয়।

সেইদিন রাতেই সে কর্তাকে বন্ধুর দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতার কাহিনী সবিস্তারে জানাল;—এও বলল—"আর বেশীদিন একে এখানে রাখলে বিপদ হবে। সুতরাং একে বিদায় দিয়ে বাসা পরিবর্তন করাই সঙ্গত।"

কর্তা চিন্তিতভাবে বললেন—"তাই তো! সত্বরই একটা কিছু করতে হবে।"

ইতিমধ্যে নৃপেন বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। জ্বর আটদিন ছাড়ে না। ফ্রেঞ্চকাট তার মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দেন। অবশেষে কর্তাকে বললেন একজন ডাক্তার ডাকতে। পাশাপাশি দুটি কামরার দুয়ারে পর্দা ঝুলান হল। ডাক্তার আসার ঠিক আগে ফ্রেঞ্চকাট রণেশকে ভিতরের কামরায় নিয়ে গিয়ে কয়েকখানি কাঁচের চুড়ি স্যুটকেশ থেকে বের করে তার হাতে দিয়ে বললেন—"এগুলি পরে নাও, বন্ধু!"

"বকামো রাখ! অপদার্থের ডেঁপোমি ঢের হয়েছে!" রাগত-স্বরে এই বলে রণেশ বন্ধুর দিকে চেয়ে দেখে—তাঁর চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে পড়ছে। শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে তিনি বললেন—"নাও, আর

দেরী করোনা!"—এই স্বর, এই দৃষ্টি রণেশের সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। বিমূঢ়ের মত সে চুড়ি হাতে পরে নিল। শান্তকণ্ঠে বন্ধু তাকে বল্লেন —"ডাক্তার এলে চুড়ির শব্দ করবে।"—এইবার রণেশ এর প্রয়োজন অনুধাবন করলে। তারপর ডাক্তার এলো,— তার সাথে ফ্রেঞ্চকাট অসুখ সম্বন্ধে যে আলাপ জুড়ে দিলেন,—তাতে রণেশের কিছুমাত্র সংশয় রইল না যে—তার বন্ধু চিকিৎসা শাস্ত্রে কিছু দখল রাখেন। ডাক্তার চলে গেল,—সুরু হল যমে-মানুষে টানাটানি। ফ্রেঞ্চকাট যেভাবে শুশ্রূষা করতে লাগলেন দিনরাত, তাতে রণেশের মন থেকে তাঁর প্রতি গভীর অশ্রদ্ধার ভাব ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগল। কিন্তু এই অনুকূল ভাব স্থায়ী হবার অবকাশ পেল না। একদিন ফ্রেঞ্চকাট রণেশের হাতে একখানা চিঠি দিয়ে বললেন—"বন্ধু! এখানা পোষ্ট করে দিও, কেউ যেন না জানে। বোনের কাছে লিখছি—কর্তার কাণে যেন না যায়।"

সর্বনাশ! দুর্বলচিত্ত লোকের কৃতকর্মে হয়ত দলের ভরাডুবি হবে। রণেশের মনটা তিক্ততায় ভরে গেল—ভাবটি প্রকাশ পেল তার চোখে মুখে। কিছু না বলে সে চিঠিখানি পকেটে রেখে দিল এবং কর্তাকে একান্তে ডেকে নিয়ে চিঠিখানি তাঁর হাতে দিয়ে বলল—"দলের নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে ইনি বাড়ীতে চিঠি লিখেছেন—একেবারে কাঁচা ফেরারী! এখনও জানে না এইরকম চিঠি থেকেই সমূহ বিপদ আসতে পারে। আর মনের দিক দিয়েও তো এটা তাঁর অযোগ্যতাই প্রমাণ করে।"

"থাক্ চিঠিখানা আমার কাছে—দেখিয়ে দিচ্ছি মজাটা।"—বলে কর্তা পত্রখানি পকেটে রাখলেন।

কে কোন জেলার লোক মাঝে মাঝে এ সম্বন্ধে ফেরারীদের মধ্যে কৌতুককর গবেষণা চলত। একদিন ফ্রেঞ্চকাট রণেশকে

বললেন—"পাঁপর ভাজার গন্ধ যাবে কোথায় ? বন্ধু ! তোমার কথা থেকেই বুঝতে পারছি যে তুমি ঢাকার লোক।"

এইবার রণেশ রাগে ফেটে পড়ল—"কেন পরিচয় জানার জন্যে এত অন্যায় আগ্রহ ! আজ এখানে থাকত যদি নলিনী ঘোষ তো চাবকিয়ে তোমায় লাল করে দিত !"

উপেক্ষাভাবে বন্ধু জবাব দিলেন—"ওঃ—ভা—রি তোমার বড় অর্গানাইজার নালনী ঘোষ। ও আমাকে লীডার করলে আমিও তার চেয়ে ভালই কাজ চালাতে পারি।"

এবারে রণেশ ভদ্রতার সীমাও ছাড়িয়ে গেল। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বন্ধুর মুখের কাছে ধরে মুখ ভেংচিয়ে বলল—"তুমি পার এই কলাটি ! তুমি দিনরাত কেবল ভোঁস ভোঁস করে ঘুমুতেই পার ! তুমি নলিনী ঘোষের জুতোর হাফসোলের যোগ্যও না।"

এরপর থেকে রণেশ বন্ধুর কাছে বড় একটা ঘেঁষে না। এই অপদার্থ লোকের ঠাট্টা বিদ্রূপ আর মোটেই সহ্য হত না। বলে কিনা নলিনী ঘোষের সমান হতে পারে ! ইতরটাকে দলে জুটালে কে ? কর্তাই বা কেন জেনে শুনে একে এখানে এতদিনও রেখেছেন ?

রোগীর শুশ্রূষায় যে শ্রদ্ধা তার মনে দানা বেঁধেছিল তার স্থানে জমা হল অপরিসীম ঘৃণা।

কয়েকদিন পরের ঘটনা। শীতের রাত। চারজন ফেরারী কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে। কয়েকদিন আগে এসেছেন একজন—সকলে ডাকে বড়দা বলে। সুন্দর চেহারা—দেখলেই ভক্তির উদ্রেক হয়। তাঁর পাশেই শুয়ে ফ্রেঞ্চকাট। শেষরাতের পাহারা, মণী রায় ওরফে রণেশ জানালা ঈষৎ ফাঁক করে চুপচাপ বসে আছে,—আর মাঝে মাঝে বড়দা ও বন্ধুর দিকে চেয়ে দেখছে। মনে তার খেলছিল তুলনামূলক বিচার। একজন ফর্সা—আর একজন কালো। একজন হৃষ্টপুষ্ট—আর একজন র‍্যাংলা ক্যাংলা। একজনের চেহারায় মনে জাগে শ্রদ্ধা

ও সম্ভ্রম—অপরের চেহারায় আনে বিরক্তি! কিন্তু ওকি! একদল লোক যেন ওভারকোট গায়ে দিয়ে বাসার দিকে আসছে! কাছেই ছিল ফ্রেঞ্চকাট ঘুমিয়ে,—তাঁকে ধাক্কা দিয়ে রণেশ বলল—"বন্ধু! পুলিশ—"

তড়াক করে তিনি উঠে পড়লেন—জানালার কাছে এগিয়ে গিয়ে বুঝলেন সমূহ বিপদ। চকিতে সকলকে জাগান হল,—ততক্ষণ পুলিশ দল দুয়ারের কাছে এসে পড়েছে।

বাইরে থেকে দুয়ারে পল ধাক্কা—পুলিশদলের নেতা ফেয়ার-ওয়েদার সাহেব হেঁকে বল্লেন—"দুয়ার খোল, নয় ভেঙ্গে ঢুকব।"

ফ্রেঞ্চকাট এগিয়ে গেলেন,—বজ্রকণ্ঠে জবাব দিলেন- "সাধ্য থাকে চেষ্টা কর—তারপর মর।" সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর রিভলভার উঠল গর্জে—গুড়ুম -গুড়ুম—

সঙ্গে সঙ্গেই ফিলসফার আর প্রবোধ দাসগুপ্ত ওরফে দাস্থ বন্ধুর দুপাশ থেকে সুরু করে দিলে গুলিবর্ষণ। পুলিশদল গেল পিছিয়ে—দূর থেকে তারা চালাতে লাগল রাইফেল। রাইফেল ও রিভলভারের শব্দে নিশাবসানেব নিস্তব্ধতা গেল ভেঙ্গে; গৌহাটির অতি শান্ত নিভৃত অঞ্চলে সুরু হল আগুনের হোলি খেলা;—বিস্মিত নরনারী নিদ্রাভঙ্গে ভেবেই পেল না—অকস্মাৎ কেন এই বজ্রপাত। রণেশ মন্ত্রমুগ্ধের মত দেখে যায় বন্ধুর ক্ষিপ্রকারিতা, দেখে তাঁর সাহস, দেখে তার দৃঢ়তা। একি সেই বন্ধু, যাঁকে এতদিন ভেবেছে সে অপদার্থ জড়ভরত? বাঁশের বেড়া ভেদ করে অবিরাম চলেছে শাঁই শাঁই গুলি—রাইফেল ও রিভলভারের গর্জনে সারা সহর হল মুখরিত। কখন যে একটি গুলি এসে বিদ্ধ করেছে রাজসাহীর প্রভাস লাহিড়ী ওরফে ফিলসফারের উরুদেশে, খেয়ালই নেই তার। বড়দা বল্লেন —"ওকি, রক্তে যে তোমার সারা কাপড় ভিজে গেছে!" বিস্মিত নেত্রে প্রভাস দেখল চেয়ে—এইবার তার মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগল। সহসা বন্ধু বলে উঠলেন—"গুলী নাই—কার্টিজ শেষ, মাত্র ছয়টি আছে। প্রস্তুত হও বন্ধুগণ। আমি তোমাদের দেব না ছেড়ে

পুলিশের হাতে,—বিপ্লবীর দেহ পাবে তারা—কিন্তু প্রাণহীন দেহ।”

বন্ধু দাস্থর দিকে তাক্ করে রিভলভার উঁচিয়ে ধরলেন—প্রভাস বুক উঁচু করে দাঁড়াল দাস্থকে পেছনে ঠেলে। চক্ষের নিমিষে সব হয়ে যাবে শেষ,—ভাস্কর পণ্ডিত নিজ হাতে দেবীর প্রতিমা দেবে অষ্টমীতে বিসর্জন। চকিতে বন্ধুর হাত চেপে ধরলেন বড়দা,—বললেন—“মৃত্যু নয়,—বাঁচতে হবে আমাদের··· ··আগুনের মন্ত্র নিয়ে ছুটতে হবে দিকে দিকে। পুলিশের বেষ্টনী অসম্পূর্ণ—পেছনের পথ নিরাপদ। পালাও....পালাও···”

বন্ধু বললেন—“তবে তাই হোক—পালাও সকলে, আমি মোহড়া নিচ্ছি।” বন্ধুর রিভলভার আবার উঠল গর্জে,—বড়দা অর্থাৎ শ্রীঅমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অপর তিনজন নিঃশব্দে আঁধারের আবরণে বেরিয়ে এল পথে।—রণেশ ভাবে—কে এই বন্ধু!—

কয়েকদিন পরের কথা। স্পেশাল ট্রিবিউনালের কাঠগড়ায় রণেশ এই প্রথম দেখতে পেল—শুধু সে-ই নয়—ফিলসফার, তারাপ্রসন্ন দে ওরফে সুলতান, কর্তা এবং বন্ধুও ধৃত হয়ে বিচারের জন্য আনীত হয়েছেন। বন্ধু তার দিকে চেয়ে চেয়ে হাসছেন। প্রথমেই এল সনাক্তকরণের পালা। একজন বড়দরের গোয়েন্দা কর্মচারী এসে কর্তার দিকে আঙ্গুল উচিয়ে বলল—“ইনি হচ্ছেন কাশী ষড়যন্ত্র মামলার ফেরারী, শচীন সান্যালের সহকারী নরেন ব্যানার্জি।” তারপর ফ্রেঞ্চকাটকে দেখিয়ে বলল—“আমি এঁকে সনাক্ত করছি। ইনি হচ্ছেন অনুশীলন সমিতির নেতা—প্রায় দেড় বছর আগে দালান্দা হাউস থেকে পালিয়েছেন—নাম নলিনী ঘোষ।”

নলিনী ঘোষ? বন্ধু নলিনী ঘোষ? রণেশের মাথা ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল—তার আর শক্তিই রইলনা দাঁড়িয়ে থাকার,—বিমূঢ়ের মত সে বসে পড়ে—জড়িতস্বরে বলল—“বন্ধু তুমি – আপনি নলিনী ঘোষ—”

বন্ধু তাকে উঠিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বল্লেন—“দূর্ত্তোর নলিনী ঘোষ! আমি বন্ধু।”—

চপল-রুদ্র

আসামের শেষপ্রান্তে নাহোরকাটিয়া ষ্টেশন,—একেবারে তিনসুকিয়ার কাছাকাছি। ত্রিপুরা জেলার এক ভদ্রলোক সেখানকার ষ্টেশন মাষ্টার। ১৯১৭ সালের মাঝামাঝি মাষ্টার মহাশয়ের বাসায় দুটি ছেলে এসে উপস্থিত হল। একজনের নাম চপলাকান্ত রায়,—আর একজনের নাম রুদ্রনাথ চৌধুরী। চপলার বয়স ষোল-সতের—রুদ্রনাথের কুড়ি-একুশ। পরিচয়ে জানা গেল চপলা, মাষ্টার মহাশয়ের ভাগ্নে—আর রুদ্রনাথ মাসতুতো ভাই। উভয়ে খুব গরীব—আর্থিক অনটনে পড়াশোনা হ'ল না—তাই এসেছে এখানে টেলিগ্রাফী শিখতে,—মাষ্টার মহাশয়ের চেষ্টায় যদি রেলের চাকরীতে ঢুকতে পারে। ষ্টেশনে মাত্র তিনজন বাঙ্গালী কর্মচারী। আশেপাশের চা বাগানগুলিতে, পোষ্টাফিসে, ডাক্তারখানায় ও দূরে থানায় আরও কয়েকজন বাঙ্গালী আছে। চপলা ও রুদ্রের আগমনে ষ্টেশনের আড্ডাটা বেশ একটু দানা বেঁধে উঠল। হৈ হল্লা ত আছেই—তার উপর বৈকালে ব্যাড্‌মিণ্টনও সুরু হয়ে গেল। ছেলে দু'টি যেন প্রাণরসে ভরপুর,—চুপচাপ বসে থাকে না—একটা না একটা করেই চলেছে আপন মনে। এরই মধ্যে একটা কাণ্ড ঘটে গেল। নাহোরকাটিয়া চা বাগানের সাহেব ম্যানেজার মিঃ জনষ্টনের ঘোড়া চরছে ষ্টেশন-সংলগ্ন মাঠে। চপল বললে—"রুদ্রমামা! ধরুন না একটু প্র্যাকটিশ করে নিই!" আর যায় কোথায়! রুদ্র ঘোড়া ধরে—পায়ের ছাঁদ খুলে লাগাম বানিয়ে নিল এবং চড়ে বসল তার পিঠে। ছুটিয়ে দিল ঘোড়া। একবার সে—একবার চপল! পালা করে ঘোড়দৌড় চালাতে লাগল তারা। ওধারে সাহেব খবর পেয়ে বেরিয়ে এল হাণ্টার নিয়ে। তখনকার দিনে চা-বাগানের সাহেব যে কালা-আদমীর পক্ষে কৃতান্তের যমজ ভাই এখবর বোধ হয় বেচারারা রাখত

না। দূর থেকে সাহেবের চীৎকার 'পাকড়ো" "পাকড়ো" শুনেই ওদের চমক ভাঙ্গল। একলাফে ঘোড়া থেকে নেমেই দুজনে ছুটল ষ্টেশনের দিকে।—পিছে পিছে ধেয়ে আসছে অগ্নিশর্মা জনষ্টন। এক দৌড়ে ষ্টেশন মাষ্টারের কোয়ার্টারে ঢুকেই আবার বেরিয়ে এল চপল। সাহেবও হৈ হৈ করে ষ্টেশনে উপস্থিত। মাষ্টারমশাই ষ্টেশনেই ছিলেন—গোলমাল শুনে হাজির হলেন সাহেবের সামনে। ব্যাপার শুনে ভদ্রভাবে বললেন—"ছেলে দুটি আমার আত্মীয়। না জেনে শুনে করে ফেলেছে অন্যায়"—

সাহেব এবার কিছুটা শান্ত হয়ে বললেন—"ওদের নিয়ে এস আমার সামনে।"

চপল ও রুদ্র আসতেই সাহেব সুরু করলেন উপদেশ—"অবল জানোয়ারকে কষ্ট দিতে নেই, বুঝলে?"

সাহেব চলে যেতেই চপল হেসে বললে—"এই জন্যই বুঝি চা-বাগানের সাহেবেরা বোলা জন্তুদের কষ্ট দিয়ে থাকেন। বেটা আর একটু এগুলেই দেখিয়ে দিতাম মজাটা।" রুদ্র তাকে ধমক দিয়ে বললে—"থামো। বাসায় চল।' মাষ্টার মশায়ও ওদের পিছে পিছে চলে এলেন কোয়ার্টারে। এসেই বুঝলেন, চপল সাহেবের সম্মুখে এগিয়েছিল সশস্ত্র,—রিভলভার পকেটে নিয়ে। মুহূর্ত মধ্যে এমন অঘটন ঘটে যেত যাতে নিভৃত অঞ্চলের শান্ত পরিবেশ কম্পিত হত প্রচণ্ড বিস্ফোরণে। অতি শান্ত ভাবেই তিনি রিভলভারটি চপলের কাছ হতে নিয়ে বাক্সে বন্ধ করে রাখলেন।

চপল বললে—"ওকি করেন? নিরাপত্তার জন্য অস্ত্র চাই যে আমাদের।"

হেসে মাষ্টার মশায় বললেন—"অর্থাৎ বাজারে মেছুনীর সাথে দাম নিয়ে বচসা করে তাকে বসিয়ে দেবে গুলি। ওটা এখন থাক আমার কাছে।"

চপল ভারী ক্ষুন্ন হল মনে মনে। রুদ্রও গেল চেপে। দুজনে

টেলিগ্রাফের যন্ত্র নিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে শিখছে তারা—টরে টক্কা—টক্কা টরে। কয়েকদিন অধ্যবসায়ের ফলে তারা কিছু কিছু শিখেওছে। একদিন চপল মহা উৎসাহে মাষ্টার মশায়কে বললে—"মাষ্টার মামা—দেখুনতো কলে কি যেন বলে।—আমি পাঠাচ্ছি মেসেজ—আর বরহুপি ষ্টেশন থেকে কেবলই বলছে—"F—L" "G. T. F"—এসবের অর্থ কি?"

মাষ্টার মশায় কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সাথে তার-বাবুকে ডেকে বললেন—"দেখুন তো দেবেনবাবু—এতো বড় মজার কথা—বুঝিয়ে দিন চপলকে।"

দেবেনবাবু হেসে বললেন—"তাই নাকি F. L. বলছে? আবার G. T F? এর অর্থ হচ্ছে—Fool—go to the field. অর্থাৎ অরে বেকুব, সিগন্যালিং ছাইড়া হলকর্ষণ কর্!"

সকলে হো হো করে হেসে উঠল।

এইভাবেই হাসিঠাট্টার মধ্য দিয়ে দিন কাটছে তাদের। মাঝে মাঝে রুদ্র ও চপল বের হয় ভ্রমণে। জঙ্গলের পর জঙ্গল পার হয়ে যায় তারা। কোথাও দেখতে পায় দূরে নদীর ওপারে বুনো হাতী জঙ্গলের ডালপালা মড়্ মড়্ করে ভেঙ্গেচুরে আসছে নদীর ধারে,—প্রাণভয়ে হরিণের দল ছুটে পালাচ্ছে। অহমীয়ারা সাবধান করে দেয়, বলে -"এ ডাঙ্গুরিয়া! লাহে লাহে ফিরি যোয়া ঘরত-হাতী ওলাইছে—না যোয়া ঐ ধারত।" ফিরে আসে তারা। এইরূপে নাহোরকাটিয়ার দশ মাইল পরিধি তাদের পরিচিত হয়ে পড়েছে। কখনও কখনও তারা ডেহিং নদীতে নৌকা চালায়—অগভীর পার্বত্য নদীর স্রোতের টানে ভেসে যায় বহুদূর। স্ফটিক স্বচ্ছ জলের ভিতর দিয়ে দেখা যায় নদীর তলে মোটা মোটা বালির দানা,—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পাথরের টুকরো। দেখা যায় রং-বেরংয়ের চাঁদা মাছ, মহাশোলের পোনার ঝাঁক ছুটে পালাচ্ছে দাঁড়ের শব্দে। ওপারে কোথাও দেখা যায় বাঘ এসেছে নদীর ধারে,—একজাতীয় বানর কেবলই—হুক্কু—হুক্কু—রবে ডাকতে থাকে। শ্রান্ত, ক্লান্ত হয়ে রুদ্র ও চপল সন্ধ্যায়

ফেরে বাসায়,—চাপায় রান্না। নৈশ ভোজনের পর অনেক রাত পর্যন্ত উভয়ে পড়াশোনা করে। এই ত'াদের দৈনন্দিন কার্যসূচী। ভাল লাগে না চপলের এ জীবন। কৃতী ছাত্র ছিল সে। স্বেচ্ছায় ছেড়ে এসেছে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আকর্ষণ। সমাজকে ভালবেসে নির্বাসিত হয়েছে সমাজ জীবন থেকে! কর্মের প্রেরণায় চঞ্চল হয়ে ওঠে সে ক্ষণে, ক্ষণে। রুদ্রের কাছে গিয়ে চুপি চুপি বলে সে—"কর্মহীন বিজন সাধনাতেই কি হবে এ জীবনের সমাপ্তি? কাজের জন্যই ছাড়লেম সংসার—ফিরেও চাইনি আত্মীয় স্বজনের দিকে--নিজের দিকে। কিন্তু কবে পড়বে ডাক কাজের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ার,— প্রত্যাশায় আর কতদিন অতিবাহিত করব?"

রুদ্রেব মনেও সেই একই বেদনা। দালান্দা হাউস থেকে পালিয়েছে সে,—নির্যাতনের ভয়ে নয়—কর্মের প্রেরণায়। তবু সে প্রবোধ দেয় চপলকে। বলে—"চঞ্চল হলে চলবে না তো ভাই। আসামের শেষ প্রান্তে একান্ত নিবাপদ স্থানে পার্টি রেখেছে আমাদেব পাঁচ সাতজনকে রিজার্ভ হিসাবে। যদি কেন্দ্রে ঘটে কোন বিপদ, যদি অতর্কিত আক্রমণে কেন্দ্র হয়ে যায় ছিন্নভিন্ন—সেইদিন পড়বে আমাদের কাজ। সারা ভারতের সাথে যোগাযোগের সন্ধান তাই গচ্ছিত আছে আমাদের কাছে।—পার্টির সেই দুর্দিনে যোগসূত্রের সাংকেতিক ঠিকানা সেইদিন উদ্ধার করব আমরা,—তারই সাহায্যে আমাদেরই করতে হবে দলের শাখা প্রশাখার সাথে পুনরায় সংযোগ স্থাপন। সেই সাঙ্কেতিক সংযোগ যখের ধনের মত পাহারা দিয়ে বসে আছি পার্টিরই প্রয়োজনে। তাই আমাদের কর্মবিহীন বিজন সাধনা বরণ করে যে নিতেই হবে ভাই।" চপলের মন কতকটা হাল্কা হয়ে আসে। আবার স্ফূর্তি পায় তার উচ্ছল সজীবতা স্বাভাবিক ধারায়।

একদিন চপল পায়খানায় গিয়ে দেখে যে চকখড়ি দিয়ে লেখা আছে—"আরামের স্থান।" বুঝে নিল সে, যে বিকৃত হরফে হলেও লেখাটি রুদ্রের। তৎক্ষণাৎ তার তলায় চপল লিখে দিল—"কিন্তু আমাশয় হবে"

মাষ্টার মহাশয় পায়খানায় গিয়েই হো হো করে হেসে উঠলেন,—একদম ছেলেমানুষ সব।

এরই কয়েকদিন পরের কথা। ষ্টেশনের কাছাকাছি একটি বুড়ো অহমীয়া Back shunting এর সময় ট্রাকের ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেছে। তার একখানি পা কাটা পড়েছে,—রক্তে রক্তারক্তি।

খবর পেয়েই রুদ্র ও চপল ছুটল সেখানে। লোকটি তখনও বেঁচে আছে—কিন্তু সংজ্ঞাহীন। দুজনে লেগে গেল তার পরিচর্যায়। দুই ঘণ্টা চেষ্টার পর আহত বৃদ্ধের সংজ্ঞা ফিরে এল। ক্ষীণস্বরে সে বলে উঠল—"মৈ আরু ন বাঁচিম্। ঘরত মোব পোয়ালীব কি হইব রে ভগমান।" তার চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পল। চপলেব চোখেও জল—রুদ্রের চোখও ছল ছল করে উঠল। সত্যিই বুড়োটা মারা গেল। উভয়ে বিষণ্ণ চিত্তে ফিরে গেল বাসায়। কয়েকদিন ধবে কেবলই বুড়োর কথা, তার চোখেব জল তাদের মনে ভেসে ওঠে,—অপসারিত হতেই চায়না বিষাদের ছায়া। মাষ্টাব মশায় তা' লক্ষ্য করলেন—হেসে বললেন—"বিপ্লবীব মন এত কোমল।"

রুদ্র চমকিয়ে উঠল সত্যিই কি? তাই তো! এই ভাবকে তো আর প্রশ্রয় দেওয়া চলে না চপলের সাথে ফিস্ ফিস্ করে সে কি যুক্তি করল। পরের দিন মাষ্টার মশায় যখন ডিউটীতে গেছেন, তখন তারা একটি কুকুরেব দুটী পা দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল একটি গাছের সাথে। তারপর দু'জনে দুখানা চাবুক নিয়ে কুকুরটীকে বেদম "সপাং" "সপাং" লাগিয়ে চলল। কুকুর বেচারা নিশ্চয় বুঝতে পারেনি যে দুইজন ভীষণ বিপ্লবী তারই মারফতে কোমল প্রাণ দৃঢ় করে নিচ্ছে। পারলে হয়ত সে এই দুর্দান্ত বৈপ্লবিক আতিশয্যে প্রতিবাদ না জানিয়ে নীরবেই সহ্য করত এই অত্যাচার দেশপ্রেমের আঙ্গিক হিসাবে। কিন্তু বেচারা কুকুর এই সব গভীর তত্ত্বনিচয় জানবে কোথা থেকে? তাই সে "কেঁউ কেঁউ" রবে তার অসহায় প্রতিবাদ জ্ঞাপন করতে লাগলো ক্রমাগত। চপলের মনে যদি দয়া হয়—রুদ্রের কাছে সে খেলো হবার

ভয়ে সমানেই চালায় চাবুক। অবশেষে নির্যাতিতের রোদন আকর্ষণ করল ষ্টেশনের কর্মচারীবৃন্দের মনোযোগ। সকলে সরজমিনে গিয়ে তাজ্জব বনে গেল ব্যাপার দেখে। ঢাকাই তার-বাবু তারস্বরে বলে উঠলেন—"ক্ষ্যাপ্ছে—নিচ্চয় ক্ষ্যাপ্ছে। মাষ্টারবাবু! আরে ত্বাহেন কি—এগো বাইন্ধ্যা বহরমপুরে পাঠান।"

মাষ্টার মশায়ের ধমক খেয়ে রুদ্র ও চপল রণে ভঙ্গ দিয়ে চলে গেল বাসার মধ্যে। হয়তো বা তাদের হৃদয় আধা দৃঢ় হয়েই রইল—কে জানে।

কয়েকদিন পরের কথা। দুর্গা পূজা এসে পড়েছে। প্রতি বৎসর নাহোরকাটিয়ায় যে কয়জন বাঙ্গালী আছেন তাদের উদ্যোগেই সমারোহে দুর্গা পূজা হয়। এবারও তারি উদ্যোগে ডাকা হয়েছে বাঙ্গালীদের মিটিং। ষ্টেশন মাষ্টারের ঘরেই বৈঠকের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। দুপুর বেলা। চা বাগানের বাবুরা, ডাক্তার, পোষ্ট মাষ্টার, দুই একটি ব্যবসায়ী অনেকেই এসেছেন। থানার দারোগাবাবু,—সার্কেল ইনস্পেক্টারবাবুও এসেছেন। ফাঁকা মাঠের মধ্যে মাষ্টারের কোয়ার্টার। ঝির্ঝিরে হাওয়ায় রুদ্র পড়েছে ঘুমিয়ে,—চপল তার পাশেই বসে। আড্ডা জমে উঠেছে প্রসঙ্গক্রমে বাংলার বিপ্লবীদের কথাও আলোচনা হচ্ছে। ইনস্পেক্টরবাবু পুলিশের বড় অফিসার। পদাধিকার বলে বিপ্লবীদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার দাবী সবচেয়ে বেশী তাঁরই। সুতরাং তিনি জোর গলায় বলে চলেছেন মন গড়ানো আজগুবি কাহিনী!

"বসন্ত চাটুয্যের murder? আমি সেদিন কলকাতায়। মাঠে খেলা দেখতে যাব—চৌরঙ্গী ক্রশ কচ্ছি—এমন সময় এক বেটা খোঁড়া —বসন্ত চাটুয্যের গাড়ীর সামনে লাঠি ধরে এসে "একটি পয়সা ভিক্ষে দিন বাবু"—বলে তারস্বরে চীৎকার করতে লাগল। চাটুয্যে মশাই যেমনি বলেছেন—"হঠ যাও উল্লু কাহেকার"—অমনি মশাই বললে বিশ্বাস যাবেন না—ভিক্ষুকটি পিস্তল বের করে চেঁচিয়ে উঠল—"I murder Basanta Chatterjee for his crime against the

country—"তারপরই গুড়ুম,—গুড়ুম—আমি তো দে ছুট—"

কাহিনী শুনে চপলের বুকটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। ঠিক সেই সময়ে নিদ্রিত রুদ্র হঠাৎ ডান হাতখানি উঁচু করে বিড়্ বিড়্ করে বলতে লাগল—"রক্ত"—"রক্ত"—;—স্বপনের ঘোর।

পুলিশ ইনস্পেক্টর জিজ্ঞাসা করলেন—"কিসের রক্ত রুদ্রবাবু?"

সমূহ বিপদ বুঝে চপল সকলের অলক্ষিতে রুদ্রের গায়ে লাগাল এক চিমটি! ফলে রুদ্র "উঃ" শব্দে সিধে উঠে বসে পল। ইনস্পেক্টরবাবু আবার জিজ্ঞাসা করলেন—"কিসের রক্ত রুদ্রবাবু?"

জবাব দিলেন ষ্টেশন মাষ্টার।

"সেদিন ষ্টেশনে accidentএ লোকটা কাটা পড়ার পর প্রায় সাতদিন রুদ্র ভাল করে খায়নি—দিনরাত ঐ কথাই ভেবেছে—তাই স্বপনে দেখছে আর কি!"

খুব বাঁচিয়েছেন তো মাষ্টার মশায়। চপল মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

এরই কিছুদিন পরে গৌহাটীর সহরে ও প্রান্তরে বিপ্লবীদের সাথে সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর হল সংঘর্ষ,—সমগ্র আসাম কেঁপে উঠল এই অপ্রত্যাশিত বিস্ফোরণে। নাহোরকাটিয়ায় রুদ্র ও চপল তার আভাস পেল ট্রেন চল্‌তি লোকের আলাপ আলোচনায়। শুনল তারা, অহমীয়ারা বলাবলি করছে—"গৌহাটি ও ভারী কাণ্ড হৈ গৈছে। পুলিশের আরু মিলিটারী লোক গৈছিলো স্বদেশী দাকাত ধরিবলে—আরু দাকাতদল জেবর পরা পিস্তল ওলাই দম্ দম্ করি পুলিশকে মারি দিল্।"

বসে গেল মন্ত্রণা সভা। কি করবে চপল আর রুদ্র অবিলম্বে স্থির করা প্রয়োজন। প্রকৃত ঘটনা কি তাও তো জানা নেই। রাজেনবাবু, করতা, সুলতান, ফিলসফার, স্কলার সকলেই কি ধরা পড়েছেন? যদি তাই হয়ে থাকে তবে তো সমিতির এই দুর্দিনে সব গুছিয়ে নেবার ভার তাদেরই। চলে যাবে তারা বাংলাদেশে?

সন্ধ্যার পরে অভাবনীয় ব্যাপার ঘটে গেল। গৌহাটির সমর ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে—দাসু অর্থাৎ প্রবোধ দাসগুপ্ত এবং স্কলার ক্ষত বিক্ষত দেহে শতছিন্ন বস্ত্রে নাহোরকাটিয়ায় এসে উপস্থিত হল। সাইডিং-এর একখানি মাল-গাড়ীতে সারারাত কাটিয়ে ভোরের আগেই ডেহিং নদীর অপর পারে বিরাট জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলল তারা চারজন তিনসুকিয়া অভিমুখে।

ভোরের ট্রেনেই কিন্তু পুলিস এসে হাজির। গ্রেপ্তার করল তারা ষ্টেশন মাষ্টার শ্রীযামিনী দত্তকে। তার-বাবুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল—"এখানে দুটি ছেলে ছিল—একটি কালো আর একটি ফর্সা?"

অসন্দিগ্ধ তার-বাবু জবাব দিলেন—"হ—আমাগো রুদ্র আর চপলের কথা কন বুঝি—"

মুখ ভেংচিয়েআই, বি, ইনস্পেক্টর কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠলেন—"আমাগো চপল আর রুদ্র! জানেন তারা কে? খুনী ডাকাত। একটি,—ঐ কালো বেটা হচ্ছে বসন্ত চাটুয্যের হত্যাকারী—প্রবোধ বিশ্বাস —দালান্দা হাউস থেকে নলিনী ঘোষের সাথে পালিয়েছে। আর ঐ ফর্সাটা হচ্ছে অনুশীলনের বালক নেতা, "স্বাধীন ভারতের" লেখক ছোট ফিলসফার, ও ব্যাটাও ট্রেন থেকে লাফিয়ে পালিয়েছে পুলিশ পাহারার মাঝ থেকে। একেবারে বিচ্ছু শয়তান!"

প্রৌঢ় তার-বাবু অবিশ্বাসের সুরে হাসিমুখে বললেন—"কি যে কন্! আরে, ওগো তো আমি ছয়মাস ধইরা দেখত্যাছি,—একেরে পাগল! কুকুরের পায় দড়ি বাইন্ধ্যা চাবুক লাগায়,—রেলে মানুষ কাটা দেইখ্যা কাইন্দ্যা খুন,—হেরা আবার করব মানুষ খুন!—কিই যে কন্!"

অজর—অমর

ঢাকা জেলায় আবদুল্লাপুরে ভীষণ ডাকাতি হয়ে গেছে। সকলের মুখে ঐ একই কথা। হাজার হাজার লোকের সামনে ডাকাতরা বাড়ী লুটে নিল,—তিনতুড়ি মেরে সিন্দুক ভেঙ্গে প্রচুর টাকা নিয়ে উধাও হল, অথচ একটি লোকও কোন কথা কইল না,—মোমের পুতুলের মত চুপটি করে বসে রইল সকলে! এ যেন ভোজবাজী।

আসলে ঘটনাটা এই। ১৯১৭ সালে পূজোর সময় আবদুল্লাপুরে এক ধনী মহাজনের বাড়ীতে ৺দুর্গাপূজা উপলক্ষে যাত্রাগান হচ্ছে। মণ্ডপ বাড়ীর প্রশস্ত আঙ্গিনায় লোক ভর্তি। মণ্ডপ ও সংলগ্ন ঘরের বারান্দাগুলিতে মেয়েরা বসে গান শুনছে। গৃহস্বামীর ফরমাইশ মত নাটক হচ্ছে দক্ষযজ্ঞ। প্রজাপতি দক্ষ শিবের অপমান করেছেন,— অভিমানে সতী করেছেন দেহত্যাগ। নন্দীর মুখে বার্তা পেয়ে সংহারের দেবতা ধেয়ে এলেন দক্ষপুরে। সুরু হল শিবতাণ্ডব। দলে দলে ভূত, প্রেত আবির্ভূত হয়ে মার মার রবে যজ্ঞ পণ্ড করছে। অভিনয় উঠেছে জমে। এমনই সময় একটি বাঁশীর শব্দ,—আর সঙ্গে সঙ্গেই রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হল আটজন যুবক সমগ্র আঙ্গিনাটি ঘিরে। মুখে তাদের মুখোস—পরিধানে হাফপ্যাণ্ট ও হাফসার্ট। হাতে তাদের আগ্নেয়াস্ত্র। দর্শকবৃন্দ ভাবলে এ বোধহয় অভিনয়েরই এক দৃশ্য।

কিন্তু মুহূর্তেই তাদের ভুল ভেঙ্গে গেল। দেখল তারা আটটি পিস্তল গর্জে উঠল একসাথেই।—তারপর দলের নেতা এক বলিষ্ঠ কৃষ্ণকায় যুবক বললে—"যে যেমনটি আছেন তেমনই থাকুন চলতে থাকুক অভিনয়—কোন ভয় নেই। যে ওঠার চেষ্টা করবে তাকে জীবন দিতে হবে।" এই বলেই দস্যু নেতা রচনায় ঝুলানো একটি শশা লক্ষ্য করে গুলী ছুড়লেন। গুলীবিদ্ধ হয়ে শশাটি ভেঙ্গে পল মাটীতে।

চিত্রার্পিতের ন্যায় সকলে রইল বসে—গান চলতে লাগলো যথারীতি। ওদিকে অন্দরের লোহার সিন্দুকগুলি হাতুড়ির ঘায়ে গেল ভেঙ্গে। চল্লিশ হাজার টাকা লুটে নিয়ে সার বেঁধে ডাকাতরা বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার আগে সর্দারটি বললেন—"গান যেমন চলছে তেমনিই চলতে থাকুক। আমাদের লোক রইল আসরেই। কেউ হৈ চৈ করলেই শাস্তি অনিবার্য।" সহস্রাধিক লোক যেন মন্ত্রমুগ্ধ। কারো মুখে কথা নেই—কেউ ওঠেনা, হাত পা নাড়ে না—বোধশক্তি যেন লোপ পেয়েছে সবারই। ঘণ্টা খানেক এই ভাবেই কেটে গেল। হয়তো আরও সময় অতিবাহিত হত এই প্রকারে। কিন্তু নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল গৃহস্বামী। সে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে এসে জুড়ে দিল হৈ চৈ—"ওরে আমার বুকডা ভাইঙ্গ্যা ফ্যালছেরে—আমার মাথায় বাড়ি দিছে—মাইরা ফ্যালছে একেরে।" এরপরেই বিরাট হট্টগোল সুরু হয়ে গেল। ডাকাত দল কিন্তু নির্বিঘ্নে সরে পড়েছে ততক্ষণ।

এই ঘটনার তিনচার দিন পরে বগুড়ার রেলওয়ে কণ্ট্রাক্টর বলে পরিচিত বিধুবাবুর বাসায় চার পাঁচজন যুবক এসে হাজির হল। সবই ফেরারী—অগ্নিমন্ত্রের পূজারী। এদের মধ্যে দুইজন যেন সর্ব্বদাই চঞ্চল—মনের স্ফূর্তি উপচে পড়ে তাদের সকল কাজেই। একজন গেল পায়খানায়—অপরজন পা টিপে টিপে গিয়ে তার সমুখ থেকে জলের মগটী নিয়ে দে ছুট্। পায়খানায় বসা বন্ধু বলেই চলেছে—"ফুল, রাস্কেল, বেয়াদব"—আর এদিকে হা-হা—হো-হো। অবশেষে সৌম্যমূর্তি এক যুবা আবার পৌঁছে দিল মগ পায়খানায়।

বিকেলে একদিন দুইবন্ধু বাইরে রেললাইন ধরে গেছে ফাঁকা মাঠে। মন খুলে তারা আলাপ জুড়ে দিয়েছে। একজন বলছে—"এই ষ্টার! তরে আজ একডা কথা বলুম। তর আবদুল্লাপুরের অভিনয়ডা এমন' সুন্দর হৈছিল্ যে তরে একডা ম্যাডেল দিতে মনে লয়।"

—"আর তর? আবদুল্লাপুরের প্লানডা তুই করছিলি—সেরেফ

প্ল্যানের লাইগ্যা, তরও পাওনা সোনার ম্যাডেল। সাধে কি রাজেনবাবু "সর্দার" নাম রাখছে তর।' জবাব দিল ষ্টার। সর্দার (প্রফুল্ল রায়) বলে—"জানস্ বাই! টাকার কুমীরগো মাইর‍্যা টাকা লওনে কুন দুষ নাই। কিন্তু রাত দুপুরে বন্দুক পিস্তল লইয়া ঘুম পুরীতে হানা ছ্যাওনে বাহাদুরী নাই এক তোলাও। তাই ভাল লাগেনা আমার হে সব। আমি বাহাদুরী চাই গরম গরম। মরদের বাচ্চার মত মর্দানি ফলামু তবে না? তাই করছি আবদুল্লাপুরের প্ল্যান। হাজার হাজাব লোক মধ্যে য়্যাক্‌শান হইব। কি মজা! রাজেনবাবু তো প্ল্যান মঞ্জুর কোরবই না—অনেক বুঝাইয়া তবে না মঞ্জুব করাইছি।"

বন্ধুর কথায় ষ্টারের মনের দোর খুলে গেল। সে বল্লে—"আমি দিনরাত কি স্বপন দেহি জানস্? য়্যাক্‌শান, ট্যাক্‌শান না—আমরা একেরে আক্রমণ করছি ফোর্ট উইলিয়াম। দলের সামনে আমি মশার পিস্তল হাতে লইয়া। হয় জয়—নয় মৃত্যু। শ্যাষেরডাই আইব হেডাও জানি। কিন্তু সেডা হইব বীরের মরণ। বাঙ্গালীর পোলারা জনে জনে শিবাজী—তারা মরতে জানে বীরেব মত, ছ্যাখাইয়া দিমু আমরা। আমি যেনি ছ্যাখতে পাই আমার মৃতদেহ, বৃটিশের গুলিতে গুলিতে ঝাঁঝরা হইয়া গ্যাছে অজস্রধাবায় রক্ত ঝরছে।" বলতে বলতে তার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

"তয়—একেরে পাগল—ষ্টার!" হেসে বলে সর্দ্দার।

"আরে পাগল না অইলে ঘব বাড়ী ছাইড়া আইমু ক্যান এ পথে?" জবাব দেয় ষ্টার।

বেলা যায় আঁধার ঘনিয়ে আসে ধীরে ধীরে। দুই বন্ধু ফিরে এল সহরে। বাজারে ঢুকে মুশুরীর ডা'ল চা'ল আলু লবণ আর দু'আটি লাকড়ী কিনে নিয়ে ধীরে ধীরে চলে তারা বাসার দিকে। বাসার কাছে যখন এসেছে তখন পেছু থেকে সর্দার লাকড়ীর বোঝার গুতো লাগিয়ে দিল ষ্টারের গায়ে। অমনি সুরু হয়ে গেল মারামারি। ওয়ান্, টু, থ্রী বলার সাথে সাথেই যেন প্রতিযোগিতার আসরে লেগে পড়েছে

দুটি লাঠিয়াল। দুজনের কোঁচড়ে বাঁধা-চা'ল, ডাল, আলু, লবণ বাঁ হাতে লাকড়ীর আটী আর ডান হাতে আটী থেকে নেওয়া একখানি লাকড়ী—ঢাল তলোয়ার দুয়েরই কাজ চালাচ্ছে। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। বাসায় বারান্দায় বসে চার পাঁচজন নেতৃস্থানীয় নামকরা বিপ্লবী। একজন পড়ছে ম্যাজিনীর আত্মজীবনী অপর চারজন শুনছে তাই মন দিয়ে। হঠাৎ প্রচণ্ড ধাক্কায় গেটের দুয়ার খুলে গেল।—সঙ্গে সঙ্গেই চারটি পিস্তল তাক্ করা হ'ল দোরের দিকে, অতর্কিত আক্রমণের প্রতিরোধে বিপ্লবীরা প্রস্তুত।

"এইবার? এইবার দিছি তরে খুব একখানা—হৈচৈ—না আরো লাগব?" দোরের ওপার থেকে ভেসে আসে ষ্টারের কণ্ঠস্বর। তৎক্ষণাৎ যুদ্ধরত অবস্থায় ষ্টার ও সর্দারের প্রবেশ। উভয়কেই ডাক দিলেন মেজদা। কঠোরস্বরে বল্লেন—"খেয়াল নাই তোমাদের যে তোমরা ফেরারী? তোমাদের এমন কিছু করা উচিৎ নয় যাতে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারপর এখনই ঘটে যেত প্রলয় কাণ্ড। ষ্টারের গলা না পেলে হয়তো গুলী ছুড়তেম দোরের দিকে। সর্দার মনে রেখ—অসংযমী কখনো বিপ্লবী হ'তে পারে না।"

মাথা নীচু করে ঘরে ঢুকল দুই বন্ধু। পরদিন মেজদা, সত্যেন বিধুবাবু—সকলেই বগুড়া ছেড়ে চ'লে গেলেন। বাসায় রইলেন ষ্টার, নিকুঞ্জ পাল ওরফে কাননবাবু, গোবিন্দ কর ওরফে গোঁসাইজী এবং আরও দুই একজন। রাত্রের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে। এমন সময় বগুড়ার ইনচার্জ বিনোদবাবু একখানা চিঠি এনে দিলেন ষ্টারের হাতে। সাঙ্কেতিক লিপি উদ্ধার করে ষ্টার পড়লেন—"কেন্দ্রে এসো বিশেষ দরকার।" তিনি কাননবাবুকে বললেন চিঠিটা পুড়িয়ে ছাইটুকু গুঁড়িয়ে ফেলতে। কাননবাবু তাই করলেন। খানিকবাদে তিনি একখানি কাগজের টুকরো নিয়ে এসে দেখালেন ষ্টারকে। কাগজখানিতে কয়েকটি নাম সই করা আছে পেন্সিল দিয়ে। কাননবাবু বললেন—"কার সই জানেন? গুরুপদর। সে এখানে এসে কাগজ

পেয়েই অন্যমনস্কভাবে নাম সই করে গেছে। খেয়াল নাই এ ফেরারীর বাসা। এখানে ওরকম অসাবধানতার অর্থ হচ্ছে গ্রেপ্তার ও পার্টির সর্ব্বনাশ।" কাননবাবু পুড়িয়ে ফেললেন কাগজের টুকরোটি।

বেলা তখন প্রায় দশটা। হঠাৎ সদর দোরের শেকল ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠল। ষ্টার, কাননবাবু, গোঁসাইজী, বিনোদবাবু, নিজেদের মধ্যে একবার দৃষ্টি বিনিময় করলেন! নিমিষে সকলে প্রস্তুত হয়ে ত্বরিতপদে গেলেন খিড়কীর দোরে। খুলেই দেখেন একজন সি, আই, ডি, অফিসর রিভলভার হাতে দাঁড়িয়ে। কিন্তু তিনি রিভলভারটি উঠানোর অবসরও পেলেন না। ষ্টার, গোঁসাইজী ও কাননের পিস্তল থেকে গুলী এসে একযোগেই তাঁকে বিদ্ধ করল—গোয়েন্দা দারোগা হরিদাস মৈত্রের প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। পুলিশের দল এধারে ছুটে আসার আগেই ফেরারীরা উধাও হ'ল। কোন সন্ধান পাওয়া গেলনা তাদের। সরকার হত্যাকারীর গ্রেপ্তারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করলেন। কিন্তু নিহত গোয়েন্দা হরিদাসবাবুর স্ত্রী লাট সাহেবের কাছে পত্র লিখে জানালেন—"আমার স্বামীকে যখন আমি আর কোন-ক্রমেই ফিরে পাবনা তখন আমি চাইনা আর কারো মা, বোন, স্ত্রীর আমার মতই সর্বনাশ হোক্"—

যেদিন খবরের কাগজে এই মর্মে বিবৃতি প্রকাশিত হল সেদিন ষ্টার গর্বে বুক ফুলিয়ে কাননবাবুকে বললেন—"শুনুন! আমি কি দেখতে পাচ্ছি জানেন? আমি স্পষ্টই দেখছি আমাদের হয়ত জীবন যাবে কিন্তু ভারতের মুক্তি কেউ রুখতে পারবে না। যে দেশের নারীর অন্তরে এতখানি মহত্ত্ব আপন মহিমায় জ্বল্ জ্বল্ করছে সে দেশকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারে না।"

কেন্দ্রের নির্দেশমত ষ্টার চলে গেলেন কলকাতায়। সমিতির দুর্দিনে সৈনিক হ'ল রাজনীতিক। জঙ্গীবিভাগের নায়ক, দলের ভাগ্য বিধায়ক রূপে মনোনীত হলেন সমবেত অভিপ্রায়ে। বিহার থেকে স্কলারও এসেছে কলকাতায়। আশ্চর্যরূপে পাওয়া গেল তাকে গড়ের

মাঠে। বসন্তের গুটিতে সারা গা ছেয়ে গেছে। বেদম জ্বর,—সংজ্ঞাহীন। একজন পুরাতন বিপ্লবী কুড়িয়ে পেলেন তাকে মনুমেণ্টের পাশে। সম্বলহীন ফেরারীদের দরদভরা সেবায়, শুশ্রূষায় স্কলার সুস্থ হয়ে উঠল। ঠিক হল পূর্ববঙ্গের ভার নিয়ে সে যাবে ঢাকায়।

ঢাকা শহরের ফলতাবাজার মহল্লার সিঙ্গার কোম্পানীর এজেণ্ট—শ্রীহরিচৈতন্য দে'র বাসা। স্কলার আর ষ্টার সেখানে এসে হাজির হ'ল। আসার পথে ষ্টীমারের ওপরে তাদের যেন মনে হ'ল একটি লোক বারবার ঘোরাফেরা করছে তাদের আশে পাশে। দূর হতে লক্ষ্যও করছে মাঝে মাঝে। স্কলার চুপি চুপি ষ্টারকে বললে—"নিশ্চয় সি, আই, ডি। আমাকে তো এধারে কেউ চেনেনা। বোধহয় আপনাকে চিনতে পেরেছে।"

ষ্টারের মনেও সন্দেহ হয়েছিল। তবু তিনি হাসিমুখেই বল্লেন—"নাভি পর্যন্ত দাড়ি রেখেছি। এত ফাইন করে তা ব্রাস করেছি! কোঁচানো চাদর গলায় জড়ানো—কোঁচাটাও দিয়েছি তোফা কুঁচিয়ে—একেবারে ষোল আনা ব্রাহ্ম মন্দিরের প্রধান আচার্য—আমাকে সন্দেহ করে সাধ্য কার! তবু যখন তোমার সন্দেহ হয়েইছে—তখন কিছুটা অভিনয় করতেই হবে। খুব গম্ভীর কর মুখখানা—একেবারে বিষাদে বিষণ্ণ। লোকটি আশে পাশে এলেই চালাবে দীর্ঘশ্বাস—আর চোখে রুমাল।"

তাই হল। লোকটি কাছে আসতেই স্কলার চোখে রুমাল দিয়ে—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ষ্টার তার গায়ে হাত বুলাতে লাগলেন। আর বুঝাতে লাগলেন—"তর কি অইছে ক' তো? এত কান্দস্ ক্যা? মায়ের অসুখ,খবর পাইছস্। হের লাইগ্যা কাইন্দা অইব কি? আগে বাড়ী গিয়া ছাখ্ মা তর ক্যামন আছে। কাঁদন তো মাইয়া মান্ষের কাম। জোয়ান ব্যাটার কাঁদন কিরে?—হ—অ—অ"—

ক্রন্দনাভিনয় শেষ হতে না হতেই নারায়ণগঞ্জ পৌঁছে গেল। ষ্টীমারের বাঁশী দুইবার বেজে উঠল, জাহাজখানি অর্দ্ধবৃত্তে ঘুরে ফ্ল্যাটে ভিড়ার জন্য ধীরে ধীরে এগুতে লাগল।—হড়্ হড়্ করে মোটা দড়ি ছাড়া হচ্ছে,—ফ্ল্যাটের খালাসীরা দড়ি ধরে নিয়ে বেঁধে দিল তীরে গাড়া খুঁটোর সাথে,—ফ্ল্যাটের সাথে। এইবার সিঁড়ি নামান হ'ল। হুড়াহুড়ি করে যাত্রীরা নামতে সুরু করেছে,—ওপরে—অপেক্ষ্যমান রেলগাড়ীতে সুবিধামত স্থান করে নেবার জন্যে। ষ্টার লক্ষ্য করলেন সেই লোকটি ভিড়ের মধ্যে আগেভাগেই নেমে পড়েছে তীরে—সেখান থেকেই একদৃষ্টে লক্ষ্য করছে তাদের গতিবিধি। ষ্টারের আর সন্দেহ রইলো না যে সে সি, আই, ডি। স্কলারকে তিনি বললেন—"প্রস্তুত থেকো—হয়তো জীবনের চরম দিন আসন্ন। কিন্তু সর্বোচ্চ মূল্যে বিকোতে হবে জীবন।" উভয়েই ধীরে ধীরে নেমে এল ষ্টীমার থেকে। ষ্টারের ডান হাতে টিকেট আর বাঁহাতে 'দিল্লী দরবারের' একখানা ছবি। তাঁর কিছুটা পিছেই স্কলার। উভয়েই আড়চোখে চেয়ে দেখছে লোকটিকে। সে যেন তাদেরই প্রতীক্ষা করছে। চেকারকে টিকেট দিয়ে উভয়েই প্রস্তুত হ'ল চূড়ান্ত মুহূর্তের জন্যে। কিন্তু লোকটির কাছাকাছি এসেই ষ্টার বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। লোকটির বাঁহাতের তর্জনীতে ঝুলানো রয়েছে একটি মোমবাতির ষ্ট্যাণ্ড। এযে পূর্ব নির্দিষ্ট সাঙ্কেতিক চিহ্ন, আগন্তুকের হাতে থাকবে "দিল্লী দরবার" আর অভ্যর্থনাকারীর হাতে থাকবে মোমবাতির ষ্ট্যাণ্ড। লোকটি ষ্টারের পাশে এগিয়ে এসে বলল—"আসুন"।

নিঃশব্দে উভয়েই তাকে অনুসরণ করল। বাসায় পৌঁছে ষ্টার তাকে একেবারে জড়িয়ে ধরলেন। জিজ্ঞাসা করলেন "কয়েন তো ষ্টীমারের উপরে আমাগো আশে পাশে ঘোরাফেরা ক্যান কোরত্যা-ছিলেন, আর দূর থনে দেখত্যাছিলেন চাইয়া চাইয়া? হাতে ষ্ট্যাণ্ডটি না ত্থাখলে দিতাম বসাইয়া।"

ষ্টারের বাহুপাশ থেকে মুক্তি পেয়ে বন্ধু বললেন, "আমার ওপর

ভার ছিল আপনাদের নিয়ে আসার। কাল আমায় যেতে হয়েছিল ফরিদপুরে একটি কাজে। আজ টেপাখোলায় চেপেছিলাম একই জাহাজে। আপনাদের দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল আপনিই ষ্টার। আবতুল্লাপুরে আমিও ছিলাম কিনা। কিন্তু ঠিক ধরতে পারছিলাম না। যে লম্বা দাড়ি আর আচার্য বেশ! কিন্তু সবচেয়ে ফাইন হয়েছে আপনাদের কাঁদা আর সান্ত্বনার অভিনয়। আমি তো প্রায় ভড়কেই গিয়েছিলাম মনে হচ্ছিল যেন ভুল করেছি!"

এইবাব স্কলার চাপা গলায় কান্না জুড়ে দিল—"ওরে মারে! আমাগো ফেইল্যা কৈ গেলিরে!" সকলেই একযোগে হেসে উঠল।

একদল তরুণের মনেব ওপর পাহাড় প্রমাণ বোঝা। দেশ মুক্তির গুরুদায়িত্বের গম্ভীর পরিবেশে হাল্কা আনন্দেব অবসর পায়না এরা। কোটি কোটি দেশবাসীর মুখে হাসি ফোটানোর দায়িত্ব নিয়ে নিজেদের হাসি এরা স্বেচ্ছায় বর্জন করেছে— অশেষ লাঞ্ছনার হাত থেকে দেশকে মুক্ত কবাব পণ নিয়ে এবা সর্বপ্রকারে বঞ্চনা করেছে নিজেদেরকেই। দেশাত্মার প্রতিষ্ঠায় এবা করেছে আত্মদান,—বিদেশী স্বার্থের দস্যুতা থেকে দেশকে বাঁচাতে গিয়ে এরা সেজেছে দস্যু, দেশপ্রেমের অদম্য প্রেরণায় অপবাদ ও অপমানের পশবা স্বেচ্ছায় বরণ করেছে এই তরুণদল, শুধ্ বিদেশীরা নয়—এদের দেশবাসীবাও উচ্চকণ্ঠে প্রচার করে এরা দস্যু, এরা তস্কর—এরা দুর্নীতিপরায়ণ—এরা হত্যাকারী। এই দুর্লঙ্ঘ্য দৈহিক ও মানসিক বাধা অগ্রাহ্য কবেই চলেছে এরা। তাই দেহ মনের এই নিয়ত সংগ্রামমুখী পরিবেশের মধ্যে, একটু চপল হাওয়া একটু হাল্কা আনন্দেব অবকাশ বড়ই উপভোগ করে এরা মনে প্রাণে।

কিন্তু তা' নিতান্তই ক্ষণিক। মুহূর্তেই দৃশ্য পালটে যায়—কমিক সিনের পরই এসে পড়ে যুদ্ধের মন্ত্রণা সভার গুরুত্বপূর্ণ গম্ভীর পরিবেশ। রাত্রির হাল্কা হাওয়ার পরে প্রভাত থেকেই দেখা দিল কর্তব্যের

গুমোট গরম। ষ্টার ধীরে ধীরে স্কলারকে পূর্ববঙ্গের বিপ্লবী সংস্থা বুঝিয়ে দিচ্ছেন। পরিচয় করে দিলেন ঢাকা, মৈমনসিং, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি জেলার বিপ্লবী সংস্থার নায়কদের সাথে। ত্রিপুরা নোয়াখালী, চট্টগ্রাম সব জেলার সংগঠকবাই ক্রমে ক্রমে পরিচিত হল স্কলারের সঙ্গে!

একদিন জেলা সংগঠকদের নিয়ে ষ্টারের জরুরী মন্ত্রাণসভা বসে গেল। ষ্টার বললেন—"আমাদের সংস্থা যেমন দুর্বল হয়ে পড়েছে তাতে আর সর্বভারতীয় বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের আশা করা যায় না। এখন আমার মনে হয় আমাদেব সমস্ত শক্তি একত্র করে পূর্ব্ববঙ্গের বিদ্রোহ ঘোষণা আবশ্যক। জানি আমাদের উপর সাম্রাজ্যের শক্তি নিয়ে বৃটিশ পড়বে ঝাঁপিয়ে,—আমাদের অভ্যুত্থান অচিবেই দমিত হবে, আমরা ধ্বংস হয়ে যাব,—কিন্তু আমাদেব এই বীরের মৃত্যু দেশকে দিয়ে যাবে নবজীবন।"

স্কলার বললে—"দেশের মুক্তির জন্যে মবতে আমাব অসীম সাধ। কিন্তু আমার মনে হয় এরকম বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান নৈরাশ্যের প্রতিধ্বনি —জীবনের বিনিময়ে কর্মকে এড়িয়ে চলা। জীবন সংগ্রামে ব্যর্থ হয়ে এ যেন আমবা আত্মহত্যা করছি। একথা খুব সত্যি যে আমাদের সংস্থা ঢেব দুর্বল হয়ে পড়ছে। কিন্তু এই পথে যদি আমাদের অচল নিষ্ঠা থাকে তা'হলে আমবা সংখ্যায় কম বলে কিছুই আসে যায় না। আবার আমরা সবল হব, প্রবল হব,—প্রতিপক্ষকে আঘাত দেবার শক্তি সংগ্রহ করবই।"

স্কলারের প্রচণ্ড বিশ্বাস সংক্রামিত হ'ল প্রত্যেকের মনে। ঠিক হ'ল চালিয়ে যেতে হবে বৈপ্লবিক প্রস্তুতি, বিস্তৃত করতে হবে সংস্থাকে।—আদর্শই বড় কথা—আদর্শ অজর, অমর। নূতন প্রেরণা নিয়ে সকলে ফিরে গেল নিজ নিজ জেলায়,—রণক্লান্ত হলোনা বিদ্রোহী,—দেখা দিল সে আদর্শের জীবন্ত মূর্তিরূপে,—মানুষের সত্বা ডুবে গেল বৈপ্লবিক আদর্শের সত্বায়।

ষ্টার তখনও ঢাকাতেই আছেন। প্রতি রাতে আহারের পর বসে আলোচনা সভা। গীতা, উপনিষদ, বেদান্ত, এসব নিয়েও হয় কত আলোচনা। স্কলারের দৃঢ় আত্মবিশ্বাস। ওর সমস্ত অন্তর যেন গীতার ভাবে অনুপ্রাণিত। সে প্রায়ই শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলে—"আমি বিশ্বাস করি সমর্পিত প্রাণ সাধকের কাছে সুখ দুঃখ, জীবন মরণ সবই সমান। "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি, নৈনং দহন্তি পাবকাঃ" এ শুধু কথার কথা নয়। আত্মা অজর অমর—এ বিশ্বাস যার আছে, মরণের কোন ভয় তার নাই, মৃত্যু তাকে কোন ক্লেশই দিতে পারে না।"

ষ্টার বললেন—"ও সব আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আমি বুঝিনে। আমি বুঝি জীবন—জীবন আর মৃত্যু—সে শুধু মৃত্যুই। আমি এইটুকুই বুঝেছি দেশের মুক্তির জন্যে আমাদের আত্মত্যাগ করতে হবে, জীবন দিতে হবে। খুন আর ডাকাতিকে আমি কোন আধ্যাত্মিক ছাপে রাঙ্গিয়ে তুলতেও চাইনে। আমি জানি দেশমুক্তির জন্যে ওটা প্রয়োজন হয়েছে। তাই মনে বাধলেও করতেই হবে আমাদের। স্বামীজীর কথা—"দেশের জন্যে আমি হাজার জনম নেব, লাখো নরকে যাব", আমার বড়ই ভাল লাগে। আমি পূর্ববঙ্গের অভ্যুত্থানের কথা বলেছি এইজন্যে—দেশ হয়ে পড়েছে জড়ভরত। বেঁচে থাকার পরম আগ্রহে সে তিলে তিলে কুকুর বেড়ালের মত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা মরা দেশকে শেখাব মরণের পথেই আসবে নবজীবন—"

স্কলার শ্রদ্ধাভরে ষ্টারের কথাগুলি শুনল। তারপর বলল—"আপনার প্রত্যেকটি কথা মানি আমি। মানি। আমাদের মৃত্যুই করবে আমাদের আদর্শ প্রচার। কিন্তু মরণই সবচেয়ে বড় কথা নয়—অচঞ্চল নিষ্ঠা নিয়ে আমাদের এগুতে হবে বিপ্লবের পথে। তাতে যদি আসে দুঃখ আসে মরণ—কোন ক্ষোভ নেই। পার্টির এই দুর্দিনে আমার মনে সর্বদাই ভেসে ওঠে ম্যাটসিনির অভয়বাণী Despair not young exiles.. "Elevate your pilgrimage to

the height of a religious mission, you must succeed. You may die—but your deed will never die." সত্যিই কথাগুলো আমার মনে আনে অপূর্ব ভরসা,—আমি যেন উপলব্ধি করি ভাব অমরবীর্য, জীবন অজর অমর।"

এইরকম কত আলোচনা হয় তাদের। মাঝে মাঝে দুই, তিন, চারজনও যোগ দেয় আলোচনাতে। ১৯১৮ সালের ১৪ই জুন। সন্ধ্যার পর স্কলার বের হয়ে গেল বাসা থেকে। ঢাকা সংস্থার কয়েকটি কর্মীর সাথে দেখা করে সে আর ঢাকার সংগঠক ফিরেছে বাসার দিকে। স্কলারের মনে হল কেউ যেন তাদের অনুসরণ করছে। মনের কোণের সন্দেহ যাচাই করে নেবার জন্যে কয়েকটা আঁকা বাঁকা গলি পার হয়ে গেল তারা। অবশেষে চারদিক চেয়ে বিশেষ সর্তকভাবে বাসায় ঢুকলো। মন খুলে হেসে নিল তারা। স্কলার বললে—"সদা সতর্কভাব রীতিমত শঙ্কিত করে তুলেছে আমাদের। কেউ একটু ভাল করে আমাদের দিকে তাকালেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। আমাদের প্রাণের মায়া কত ছায়া সৃষ্টি করেছে।"

রাত্রে খেয়েদেয়ে আবার চলেছে আলোচনা। স্কলারের মুখে গীতার কথা—জীবন অজর-অমর। অনেক রাত পর্যন্ত কথাবার্তার পর সে পড়েছে ঘুমিয়ে। শেষ রাতে উঠে সে চলে গেল পায়খানায়। হঠাৎ সে চমকে উঠল ষ্টারের চীৎকারে—"হুঁসিয়ার—পিস্তল।"

সাথে সাথেই সংগ্রাম সুরু হয়ে গেছে। ষ্টারের মশার পিস্তল অবিরাম গর্জে উঠছে—"গুড়ুম—গুড়ুম"।—ওধার থেকে পুলিশ করছে রাইফেল থেকে অগ্নিবৃষ্টি। পুলিশের একজন জমাদার নিহত হয়েছে—গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর বসন্ত মুখার্জী ও প্রফুল্ল বিশ্বাস গুরুতর আহত। স্কলার দৌড়ে এসে দাঁড়িয়েছে ষ্টারের পাশে। ষ্টারের সর্বাঙ্গ রক্তাপ্লুত—আট দশটা গুলী বিঁধেছে তার গায়ে,—অবশেষে "বন্দেমাতরম্" উচ্চারণের সাথে সাথেই তাঁর প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল ভূমিতে। স্কলার একবার চেয়ে দেখল তার দিকে।

এইসময় একটা গুলী এসে তার বাম বাহুমূলে বিদ্ধ হল। ভ্রূক্ষেপই যেন নাই তার। সে সামনেই চালাচ্ছে মশার পিস্তল।—তার মনে যেন অমিতবীর্য,—মাথাটা যেন ছাড়িয়ে উঠছে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। মন তার যেন বলছে—"তুমি আত্মা —তোমার জন্ম নাই,মৃত্যু নাই—রোগ নাই, জরা নাই, তোমার কামনার কিছুই নাই—তুমি অজর অমর, নিস্পৃহ।" চারদিকে গুলী চলেছে অবিরাম—হরিচৈতন্য মাটিতে পড়ে গেল,—মুখ দিয়ে বের হ'ল গোঙ্গানির কাতরতা। স্কলার শুধু চেয়েই দেখল,—কোন কিছুতেই যেন তার প্রাণের সংযোগ নেই, —সে যেন এ জগতের মানুষই না।

হঠাৎ আরও দুটো গুলী এসে তার বক্ষ ভেদ করল - আর সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না—পড়ে গেল।

খানিকবাদে হরিচৈতন্য আর স্কলারকে নিয়ে যাওয়া হল মিটফোর্ড হাসপাতালে। শুশ্রূষায় স্কলারের সংজ্ঞা ফিরে এল। চেয়ে দেখল সে হরিচৈতন্যের দিকে—তার মাথার ব্যাণ্ডেজের দিকে। ক্ষীণস্বরে সে জিজ্ঞাসা করলে—"আপনার বড় কষ্ট হচ্ছে,- না ?"

তারপর চেয়ে দেখল পুলিশ বেষ্টনীব দিকে—সাশ্রুনয়ন জনতার দিকে। কেউ বলছে—হায়! হায়! স্কলারের মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল। স্মিত হাস্যে সে জিজ্ঞাসা করলে—"এদের মনেও কষ্ট হয় ? আমাদের এই অবস্থা দেখে এরা হায় হায় করছে! তবে আর ক্ষোভ নেই—এ দেশ জাগবে—মুক্ত হবে—এই বিশ্বাস নিয়ে যেতে পারব"।

সি, আই, ডির দল ঘিরে ধরেছে স্কলারকে। প্রশ্নের পর প্রশ্ন নাম কি—কোথায় বাড়ী ? মৃত্যু পথযাত্রী শান্তকণ্ঠে জবাব দিল"Dont disturb—please let me die peacefully" তারপর হরিচৈতন্য-বাবুর দিকে চেয়ে বললে সে—হরিবাবু,—ভাব অমরবীর্য, আত্মা অজর অমর। ইংরাজের সাধ্য নাই ভাবকে বিনাশ করে, আমাকে মেরে ফেলে। "দেহীনাঞ্চ যথা দেহে কৌমারং, যৌবনং জরা,—মৃত্যু দেহের বদল—জীর্ণানি বস্ত্রানি যথা বিহায়, গৃহ্নাতি নবানি নরোপরাণি"—

আর সে বলতে পারল না। মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠল —অপলক হয়ে গেল তার দৃষ্টি, দেহটা শুধু একবার কেঁপে উঠল,— তারপর সব স্থির। একটি শব্দ নেই, একটুও কাতরতার চিহ্ন নেই মুখমণ্ডলে, প্রগাঢ় শান্তি মুখখানি ঘিরে। অজর অমর আত্মা মরদেহ ত্যাগ করেছে। হরিচৈতন্য আছড়ে প'ল তার বুকে, চেঁচিয়ে উঠল —"স্কলার—ভাই তোমার তো মৃত্যু নাই—তুমি যে অজর-অমর"— ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদতে লাগল বালকের মত।

সি, আই, ডি কিন্তু ব্যর্থকাম হয়েছে। এই বীরযুগল কে—কি পরিচয় তাদের—সন্ধান পায়নি তারা। বুড়ি বালামের তীর থেকে ফিরে এসে যতীন—চিত্ত কি দেখা দিয়েছে নবরূপে ? ষ্টার ও স্কলারের ফটো তুলে ছড়িয়ে দেওয়া হ'ল দিকে দিকে। যারা নিজেদের পরিচয় শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ব্যক্ত করেনি, গুপ্ত সমিতির গোপনীয়তা রক্ষা করেছে প্রাণ দিয়ে—বিশ্বাসঘাতকের মুখে মিলল তাদের পরিচয়। ষ্টার হলেন ত্রিপুরার তারিণী মজুমদার—আর—স্কলার মুর্শিদাবাদের নলিনী বাগ্‌চী।

বিচারে হরিচৈতন্যের হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। কিন্তু তার বুক ভেঙ্গে গেল না এই দারুণ আঘাতে। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে ষ্টারের রক্তাপ্লুত দেহ, স্কলারের প্রশান্ত মুখখানি।—আর মাঝে মাঝেই শুনতে পায় স্কলারের কণ্ঠস্বর—ভাব অমব বীর্য,—আত্মা অজর-অমর।

সংঘাত

ভীষণ পথের যাত্রীদলে পরস্পরের মধ্যে সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই গড়ে ওঠে এমন আন্তরিকতা যা'র তুলনা কোথাও মেলেনা। কোনদিন দেখিনি, শুনিওনি তার কথা, জানিওনা কি নাম, কি জাত, কোথায় বাস—কিন্তু সে আমার দলের লোক, একই দুর্গম তীর্থের সহযাত্রী—শুধু এই পরিচয়—মুহূর্তেই তাকে আমার একান্ত অন্তরঙ্গ করে দেয়। এর মধ্যেও আবার ইতর বিশেষ আছে। দলের সকলেই প্রিয়,—কিন্তু কোন বিশেষ একজন অপর একজনের প্রিয়তম হয়ে ওঠে। কাশীর সুশীল লাহিড়ী আর বিনায়ক কাপ্‌লের মধ্যে এই প্রকারের ঘনিষ্ঠতাই জন্মেছিল। দলের মন্ত্রগুপ্তি অটল রেখেও সুযোগ পেলেই উভয়ে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত—গল্পে আলোচনায় মশগুল হয়ে কাটিয়ে দিত। কত আলোচনা করত এই দুটী তরুণ! কেমন করে দেশ স্বাধীন হবে,—স্বাধীন হলে দেশে কি শাসনের প্রতিষ্ঠা হবে; রাজতন্ত্র—না—গণতন্ত্র? প্রায়ই কোন মীমাংসায় পৌঁছত না তারা। মাঝে মাঝে দিনের পর দিন কেটে যেত তর্কে। সুশীল আদর্শবাদী। সে বলত "গণতন্ত্রই আমাদের আদর্শ। হোকনা রাজা রামচন্দ্র,—আমরা চাইনি রাম-রাজত্ব। একজনের সার্বভৌম অখণ্ড ক্ষমতা থেকে আজ হয়তো সুখ শান্তি পেতে পারি। কিন্তু কাল তা থেকে দুঃখ ও শাস্তিও পেতে পারি—তারপর দেশের প্রত্যেকটী লোক অনুভব করবে যে দেশের শাসনকার্যে তারও যোগাযোগ আছে তবেই তো হবে সত্যিকারের স্বাধীনতা।"

বিনায়ক হেসে বললে—"প্রত্যেকের সত্যিকারের স্বাধীনতা একটা নিছক ভাঁওতা, গণতন্ত্র একটা বিরাট ধাপ্পাবাজি। পৃথিবীর কোথায় চলেছে গণতন্ত্র? ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা, সুইজারল্যাণ্ড—

কোথাও? আসলে হচ্ছে মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্র এখনও চলছে ভোল্ বদলে—গণতন্ত্রের মুখোস নিয়ে। মানুষ মানুষকে দাবিয়ে রেখেছে দাপটের জোরে—যেমন আগেও রাখত। সত্যি কথা হচ্ছে—আদিম বর্বর মানুষটি একটুকুও বদলায়নি,—বদলেছে তার পোষাক পরিচ্ছদ, বদলেছে তার বঞ্চনার প্রথা। আগে মানুষে মানুষ খেত। এখনও তাই খাচ্ছে—তবে বেশ রসিয়ে বসিয়ে,—বড় বড় বুলির আবরণে। একেই বলিস্ গণতন্ত্র?—ছোঃ!"

"অর্থাৎ অন্য মানুষে মানুষ খাচ্ছে বলে আমাদেরও খেতে হবে মানুষ। সত্যিকারেব স্বাধীনতা আসেনি বলে মেনে নিতে হবে অধীনতা, গণতন্ত্র হয়নি বলে বরণ করতে হবে রাজতন্ত্র? অতি উত্তম যুক্তি তোর"—সুশীল উত্তর দেয়।

তর্ক করতে করতে দুজনে উপস্থিত হল শচীনদা'র (শচীন সান্যাল) কাছে। কাশীর বিপ্লবী দলের তিনিই নায়ক। সুতরাং এসব তর্কেব মীমাংসাও তিনিই করেন। উভয় পক্ষের বক্তব্য তিনি ধীবভাবে শুনলেন। হেসে বললেন—"কি বিষয়ের মীমাংসা কবে দিতে হবে ভেবে পাচ্ছিনে। তোমাদের বিরোধ কোথায়? কি নিয়ে এত তর্ক করছ তোমবা? বিনায়ক বলছে, 'মানুষেব প্রবৃত্তি আদিম যুগের মত বর্বরই বয়ে গেছে—সত্যিকারেব গণতন্ত্র কোথাও নাই।' এই তো? আমি মনে কবি সুশীলও এটা স্বীকার করে। তারপর সুশীল বলেছে—'আমরা চাই সত্যিকারের স্বাধীনতা—যাতে দেশের প্রত্যেকটি লোক অনুভব করতে পারে দেশ শাসনে আমারও অংশ আছে।' এতে আব কার বিবোধ থাকতে পাবে? বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এটা সম্ভব হয়নি। আর বিদেশীব শাসনের তলে সে সমাজ প্রতিষ্ঠাও সম্ভব নয়। সুতরাং আমাদের আদর্শ হচ্ছে সেই সমাজ সৃষ্টি করা যাতে সমস্ত মানুষ হবে সমান, রাষ্ট্র হবে সকলের। আর তার প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপান হচ্ছে, বিদেশীর শাসন হতে মুক্তি অর্জন। তোমরা উভয়ে একই কথা বলেছ খণ্ড খণ্ড ভাবে, দুজনকে

একত্রে নিয়ে একই আদর্শ গোটা রূপ নিয়েছে—অর্থাৎ দুই বন্ধু একে অন্যের পরিপূরক।”

দুইবন্ধু ডগমগ খুশী হয়ে শচীনদা'র কাছ থেকে বিদায় নিল।—পথে বিনায়ক বললে—“বুঝলি তো দাদা কি বললেন? তুই, আমি কেউ সম্পূর্ণ নই—দুজনে মিলে গোটা মানুষ। অর্থাৎ আমাকে ছাড়া তুই আধা মানুষ—আর তোকে ছাড়া আমিও তাই।”

কিন্তু তাদের এই জমাট সুহৃত্তার নীড় ভেঙ্গে গেল কাশী ষড়যন্ত্র মামলায়। অকস্মাৎ শচীনদা প্রমুখ বহু নেতৃস্থানীয় বিপ্লবী ধৃত হয়ে গেলেন জেলে। বিনায়ক, নরেন ব্যানার্জি ও প্রিয়নাথ দলের আদেশে পালিয়ে এল বাংলা দেশে,—সুশীল ছিটকে গেল কাংড়ি গুরুকুল বিদ্যালয়ে। এরপর অনেকদিন দেখা হয়নি দুই বন্ধুতে।

১৯১৭ সালের মার্চ মাস। যুক্ত প্রদেশের বিপ্লবীসংস্থার নায়ক এখন সুশীল লাহিড়ী। কেন্দ্রের ডাকে সে চলে এল চন্দননগরে। রেল ষ্টেশনে যে ব্যক্তি তাকে অভ্যর্থনা করতে এসেছিল তাকে দেখেই সুশীলের মুখে হাসি দেখা দিল। সে হল তার অতি পরিচিত নরেন ব্যানার্জি। ষ্টেশন হাতার বাইরে এসে সুশীল জড়িয়ে ধরল নরেনকে। নরেন বলে—“এই ছাড়্ ছাড়্। এটা বাংলা দেশ—স্পাই আর সি, আই, ডি-তে ভরা। এ কেয়া তেরা রোটী কা দেশ? ছোড়ো ভাইয়া! ছোড় দো মুঝে।”

“ম্যয় কভি না ছোঁড়ুঙ্গা তুঝে, এ বাঙ্গালী মছলী খানেবালে”—হেসে জবাব দেয় সুশীল।

দুজনের মনেই অজস্র প্রশ্নের তরঙ্গ দোলা দিয়ে যায়। কিন্তু কেউ বলতে পারেনা মুখ ফুটে। গুপ্ত সমিতির গোপনতা অসাড় করে দিয়েছে এদের জিহ্বা,—পণ-রক্ষায় স্বেচ্ছায় এরা বোবা সেজেছে। কাশী কেন্দ্রের কত সহকর্মীর কথা মনে হয় নরেনের। তারা কে কেমন আছে, কাজে কতখানি যোগ্যতা দেখিয়েছে, এরমাঝে কেউ ধরা পড়েছে কিনা সবটা জানার জ্বলন্ত আগ্রহ তার মনে। সুশীলের

যাদুস্পর্শ নরেনের মনের পরদায় অকস্মাৎ অজস্রধারে আলোকসম্পাত করল। আর তাতে সিনেমার ছায়াছবির মত সমগ্র বেনারস,—নরেনের জন্ম ও কর্মভূমি তার অফুরন্ত পরিচয় নিয়ে ভেসে উঠল। বেনারসের পথঘাট, প্রান্তর, কান্তার, অলিগলি, অট্টালিকা, মন্দির, সবই দৃশ্যের পর দৃশ্যের মত ভেসে উঠল তার মনে। বৈপ্লবিক কর্মজীবনের অধ্যায়ের পর অধ্যায়,—তার বহু পরিচয়, প্রেরণা, আনন্দ ও বেদনা নিয়ে দৃশ্যের পর দৃশ্য ক্ষিপ্রবেগে অতিক্রান্ত হতে লাগল মনের পরদায় সীমাবদ্ধ, অর্গলরুদ্ধ প্রেক্ষাগৃহে এই নির্বাক ছবির অন্তর্যামী ছাড়া দ্বিতীয় দর্শক ছিলনা।

সুশীলের চিন্তার পরিধি কিন্তু তিনজনে সীমাবদ্ধ। তারমধ্যে একজন সামনেই। অপর দুইজনের মধ্যে বিনায়কের মূর্তিই অফুরন্ত সজীবতা নিয়ে আলোড়িত করেছে তার মনকে।

"বিনুর খবর কিরে?"—জিজ্ঞাসা করে সুশীল।

চোখে মুখে অতিমাত্র বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়ে নরেন বলে "বিনু? সো কোন হ্যয়? ম্যয়তো উস্‌কো নেহি পয়ছান্তা।"

"বা-রে! তুই বিনুর কথা ভুলে গেলি! বিনু—বিনু—আমাদের কাশীব বিনায়ক—বিনায়করাও কাপ্‌লে।" সুশীল বুঝিয়ে বলে।

আরও গম্ভীর হয়ে নরেন উত্তর দেয়—"আরে কেয়া বোলতা হ্যয় ইয়ে রোটীওয়ালে। ছাতুখোরকা ঢংই দুস্‌রা হ্যয়। ইয়ে বাংলা মুলুক হিঁয়া কাঁহাসে আওয়েগা মারাঠী বিনায়ক কাপলে। হিঁয়া সত্যেন কো বাৎ বোলো—উস্‌সে মোলাকাত মাঙ্গো—উও আলবত্তে ম্যয় কর্ সক্তা। আচ্ছা করকে সমজ লিজিয়ে "ইয়ে বানারস নেহি হ্যয়—বাবুসাহেব,—ইয়ে হ্যয় বাংলা।"

"সত্যেন আবার কে?" সুশীল প্রশ্ন করে।

"নেহি জান্তা? আরে উও তো বহোৎ ভারী আদমী—বাংগাল কা ইন্‌চারজ তুমহারা তো উসীকে সাথ পাহেলে ভেট করনে হোগা। উও তুম্‌হে লে জায়েঙ্গে রাজন বাবুকা পাশ।" বুঝিয়ে বলে নরেন।

"ঢের হয়েছে বাঁটু। এখন হেঁয়ালী রাখ। বিনু এধারে আছে কিনা বল।" সুশীল বলে।

"এখানে বিনু টিনু নাই। আগে সত্যেন বাবুর সাথে দেখা কর,—তিনিই তোকে সব বুঝিয়ে দেবেন।" নরেনের ঐ একই কথা,—হিন্দীর বদলে বাংলা সংস্করণ।

অলিগলি পার হয়ে নরেন ও সুশীল প্রবেশ করল একটি বাসার দোতালায়। সামনের ঘেরা বারান্দায় দুইটি বালক বসে স্টোভে ভাত রাঁধছে,—একজন নিবিষ্টচিত্তে ছুরির সাহায্যে আলুর তরকারী কুটছে। আগন্তুক দুজনের দিকে সকলেই একবার চেয়ে দেখল। শুধু এই মাত্র। তারপর যে যা'র মত কাজ করে যেতে লাগল। কে এল, কে গেল কারও ভ্রূক্ষেপই নাই যেন সে বিষয়ে। সুশীলকে নিয়ে নরেন প্রবেশ করল এক কামরায়। তারপর সে গেল অন্য ঘরে। একটু পরেই সে সুশীলের কাছে এসে বলল—"সত্যেনবাবু এসেছেন। এবার চল তাঁর সাথে দেখা করিয়ে দি।"

বাংলাদেশের নায়কের সাথে দেখা! হয়তো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা হবে। সুশীল স্বভাবতঃই গম্ভীর প্রকৃতির। সে আরও গম্ভীর হয়ে গেল। মনে মনে সে ঠিক করে নিল সোজাসুজি প্রশ্ন করবে সত্যেনবাবুকে—"আর ছেলে রিক্রুট করে কি হবে? এখন সর্বশক্তি প্রয়োগে সেনাদলে বিদ্রোহ প্রচার উচিত নয় কি? কয়েকটা পিস্তল আর রিভালভারে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা গেলেও তার দ্বারা বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান সম্ভব নয়।"

নরেনের পিছে পিছে সে প্রবেশ করল একটি ঘরে। ঘরখানি বেশী বড় নয়। এক কোণে মেঝের উপরে একটি মোমবাতি জ্বলছে। কম্পিত শিখা যেন আঁধারের রাজ্যে আলোড়ন এনেছে। সেই অস্পষ্ট আলোতে সুশীল দেখল একটি লোক বসে আছে একখানি কম্বলের উপরে। নরেন পরিচয় করে দিল "এই সত্যেনবাবু। এইবার আলাপ করুন আপনারা।" সে-ফিরে দোর পর্যন্ত অগ্রসর হল। সুশীল ও

সত্যেন মুখোমুখি বসে। সত্যেন জিজ্ঞাসা করল "ইউ, পি'র খবর কি?"

সত্যেনের কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলো সুশীল। ঠিক এই মুহূর্তেই নরেন মোমবাতিটি উঠিয়ে এনে স্থাপিত করল উভয়ের মাঝে। হঠাৎ সুশীল জড়িয়ে ধরল সত্যেনকে—অস্ফুট স্বরে বলেই চলল "বিনু—বিনু তুই? তুই এখনে?"

সত্যেন ধীরে ধীরে জবাব দেয় "আরে বিনু না—বিনু না—আমি সত্যেন।"

নরেন এইবাব সুশীলের বাহুর বেষ্টনী থেকে সত্যেনকে ছাড়িয়ে নেবার জন্যে সুশীলের হাত ধরে টানাটানি সুরু করে দিল! আর বলতে লাগল—"আরে ভেইয়া। এ কেয়া হ্যয়? ছোড়—ছোড়। তুম্‌হারা বিনু হিঁয়া ক্যয়সে আওয়েগা সম্‌ঝো, ইয়ে তুম্‌হারা নেহি হ্যয়,—ইয়ে হ্যয় বাংগাল।"

দীর্ঘ বিরহের পর মিলনের আনন্দে অভিভূত হয়ে রইল তারা বহুক্ষণ। দুজনে যে দু'টি প্রদেশের বিপ্লবী সংস্থাব নায়ক এই কথাটা একদম ভুলে গেল তারা। সুখ-দুঃখ, প্রীতি-ঘৃণা, বিরহ-মিলন প্রভৃতি ভাব দিয়ে গড়া যে মানুষের মন সে মানুষ রূপান্তরিত হয়েছে বৈপ্লবিক আদর্শেব সত্বায়। মানুষকে জেনে শুনে তারই উপাদানে গড়া হয়েছে আদর্শের অনুপম মূর্তি। কিন্তু ক্ষণপবে যেন এই দেবমূর্তি অতল তলে ডুবে গেল,—আর তার স্থলে আবির্ভূত হল মানুষ তার প্রেম, মিলন আনন্দ ও অশ্রুর অনুভূতি নিয়ে।

এইবার ডাক পল তাদের রাজেনবাবুর সাথে দেখা করার। দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা চলল। ভোরে সত্যেনের নিকট বিদায় নিয়ে সুশীল রওনা হল এলাহাবাদে।

সত্যেনের সজীবতা বাংলার বিপ্লবী সংস্থায় এনে দিয়েছে উৎসাহ। গ্রেপ্তার আর অন্তরীণে যে দল পড়েছিল নেতিয়ে—সত্যেনের উৎসাহে, কুশলতায় তা'তে আবার জোয়ার এসেছে। সত্যেন দলের সম্পদ।

তার উপর বাংলার সম্পূর্ণ ভার ছেড়ে দিয়ে নরেন, কালু, ফিলসফার, ছোট ফিলো প্রভৃতিকে সাথে নিয়ে রাজেনবাবু গেলেন গৌহাটিতে। পালোয়ান বাংলায় সত্যেনের উপদেষ্টা হিসাবে রয়ে গেলেন। পালোয়ান পুরাতন বিশ্বাসী কর্মী। তিনিই বাংলা ও গৌহাটি কেন্দ্রের মাঝে সংযোগ রক্ষা করতে লাগলেন।

দিন যায়। পালোয়ান এবং আরও অনেকের কাছে সত্যেন সম্বন্ধে অনেক গুজব পৌঁছুল রাজেনবাবুর কাণে। সত্যেনের আচরণ ক্রমেই যেন দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। সে পালোয়ান, আরও অনেকের কাছ থেকে ব্যবধান রক্ষা করে চলে। রাত্রে প্রায়ই থাকে না বাসায়। জিজ্ঞাসা করলেই বলে—"এ বাসা সেফ্ নয়। একটা খুব সেফ্ সেল্টার পাওয়া গেছে। সেখানে রাতে থাকা নিরাপদ।" পালোয়ানের কাছে সত্যেন সম্বন্ধে এই সব কথা শুনে অশেষ চিন্তিত হলেন রাজেনবাবু। তিনি আদেশ দিলেন অতি সতর্কতার সাথে তার গতিবিধির উপর নজর রাখতে।

পালোয়ান ফিরে এলেন বাংলায়। সত্যেন যেন তাঁকে এড়িয়ে চলে। যুক্তি পরামর্শ সবই করে তেজেনের সাথে। কিন্তু ক্রুটবুদ্ধি পালোয়ানের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি ধেয়ে চলল তার পিছে পিছে। পালোয়ান, ষ্টার, মাষ্টার সকলেই সত্যেন আর তেজেনের গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি সত্যেন তা' টের পেল।

১৯১৭ সালের শেষ ভাগ। একটির পর একটি বিপ্লবী ফেরারী ধরা পড়ছে। এই সময় সত্যেন আর তেজেনকে খুঁজে পাওয়া গেল না। পালোয়ান, ষ্টার, মাষ্টার সবাই শঙ্কিত হয়ে পল। তবে কি ওরা গ্রেপ্তার হয়েছে? প্রত্যেকখানি দৈনিক কাগজ পড়ে দেখে সকলে। কিন্তু কাগজের পাতায় কোন পাত্তা পাওয়া গেল না তাদের। রাজেন বাবুর নির্দেশমত খোঁজ নিয়ে জানা গেল দুই হাজার টাকা আর দুটি রিভলবার নিয়ে উধাও হয়েছে সত্যেন আর তেজেন। এই খবর পেয়ে রাজেন বাবু প্রদেশে প্রদেশে পত্র দিলেন তাদের

সন্ধানের জন্য। ১৯১৮ সালের প্রথমভাগে কেন্দ্রের সাঙ্কেতিক লিপি উদ্ধার করে সুশীল স্তম্ভিত হয়ে গেল! চিঠিতে লেখা ছিল "সত্যেন দলের শৃঙ্খলা ও বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে। যেখানে পাও সরিয়ে ফেল।"

সুশীলের হাত দুখানি থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল। প্রচণ্ড আঘাতে যেন সমস্ত অন্তর জর্জ্জরিত,—অব্যক্ত বেদনায় তার সমগ্র চেতনা আর্ত্তনাদ করতে লাগল। বিনু বিশ্বাসহন্তা! এও কি সম্ভব? শুধু এই প্রশ্ন বার বার মনে দেখা দিল। একবার মনে হল তার—বিনু যদি এই, তবে আর কেন? কোন আশা নাই এ দেশের। কিন্তু তখনই তার ভিতরেব আদর্শময় সত্ত্বা প্রতিবাদ জানাল "তোমার পথের প্রেমই পথিককে প্রিয় করেছে। পথই বড়—পথিক নয়।"

সুশীলের নির্দ্দেশে যুক্ত প্রদেশের প্রতি জেলায়ই সত্যেন আর তেজেনের সন্ধান চলেছে। অবশেষে লাক্ষ্ণৌ থেকে পত্র এল "দুজন নবাগত এখানে ঘোরা ফেরা কর্চ্ছে,—বোধ হয় 'তাদের' সন্ধান পাওয়া গেছে।"

সুশীল এলাহাবাদ থেকে ছুটে গেল লাক্ষ্ণৌতে। দূর থেকে দেখেই সে নিশ্চিত হল যে আগন্তুক বিনায়ক। পরদিন সন্ধ্যায়—সুশীলের গুপ্তচব খবব দিল "ওরা আমিনাবাদ পার্কে।" দুইজন সহকর্মীসহ সুশীল গেল সেখানে। গিয়ে দেখে বিনায়ক গল্প কবছে তেজেনের সাথে। ত্বরিত পদে সুশীল অগ্রসর হল তাদের সম্মুখে বিপদের আশঙ্কা করে তারাও দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু প্রস্তুত হবার আগেই সুশীলের রিভলভার গর্জে উঠল "গুড়ুম—গুড়ম।" গুলী বিদ্ধ হয়েও একলাফে বিনায়ক জড়িয়ে ধরল সুশীলকে। চীৎকার করে বললে সে—"একি? তুই সুশীল?" সুশীলকে বুকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল সে। সুশীল বাধা দিল না—বিনায়কের শিথিল বাহুর বেষ্টনী ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল না। সহসা বিনায়কের দেহ এলিয়ে পল—সুশীল তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে সেখানেই বসে পল। বন্ধুর বুকে বুক রেখেই বিনায়কের শেষ

নিঃশ্বাস নির্গত হল,—সুশীলের ঠোঁটদুটি বার কয়েক কেঁপে উঠল, কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পল তার গণ্ডে। কিন্তু ততক্ষণ তেজেনের চীৎকারে কয়েকটি লোক সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। তাদের হাতে হত্যাকারী সুশীল ধৃত হল।

হত্যাপরাধে সুশীলের বিচার সুরু হয়েছে। সে মামলায় কোন অংশ গ্রহণ করে না। নীরবেই দাঁড়িয়ে থাকে কাঠগড়ায়। তার পক্ষ সমর্থনের জন্য অনেকেই উকিল নিয়োগের পরামর্শ দিয়েছেন। সুশীল শুধু ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানিয়েছে। আদালতে জজসাহেব বললেন—"তোমার পক্ষ সমর্থনের জন্যে, সরকার উকীল নিয়োগ করেছেন। তাঁর সাথে পরামর্শ করতে পার তুমি।"

একটুখানি হাসির রেখা খেলে গেল সুশীলের মুখে। সে শুধু বললে—"থ্যাঙ্কস্।"

চার্জ ফ্রেম হয়ে গেল ৩০২ ধারায়। জজ সাহেব প্রশ্ন করলেন—"তোমার কিছু বলার আছে?"

ঘাড় নেড়ে জানাল সে—"না।"

বিচারে সুশীলের ফাঁসির হুকুম হয়েছে। ফাঁসির দিন প্রভাতে সুশীল বার বার চেয়ে দেখল নিজের হাতের দিকে, বুকের দিকে। বিনায়কের রক্ত কি মাখানো রয়েছে তার হাতে, তার বুকে? বিমর্ষ হল সুশীল। কিন্তু সাথে সাথেই তার ভেতরের আদর্শবাদ হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠল—"পথই তোমার সম্বল। পথভ্রষ্ট তোমার কেউ না।"

ধীরে ধীরে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করল সুশীল। সমস্ত শক্তি দিয়ে একবার সে চেঁচিয়ে উঠল—"বন্দেমাতরম্', তারপর ফাঁসির রজ্জুতে অবসান হল বন্ধুত্বে ও কর্তব্যে, বিপ্লবীতে ও মানুষে সংঘাত।

স্পাই

রাজসাহী কলেজ মাঠে কেষ্টনগর কলেজের সাথে রাজসাহীর কলেজের ফুটবল ম্যাচ খুব জমে উঠেছে। হাজার কয়েক দর্শক হাটুরে হট্টগোলে প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষদ্বয়কে উৎসাহ দিচ্ছে, শৈলেনও প্রাণপণ চীৎকার কচ্ছে—Go on, Go on,—Shoot—Goal ইত্যাদি। এমন সময় তারাদাস পেছন থেকে তার ঘাড়ে টোকা দিল। বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরাতেই তারাদাস চাপা স্বরে ভ্রূ কুঁচিয়ে বলল—"বেরিয়ে আয়।" শৈলেন তারাদাসের সাথে দু' এক পা' যেতেই তারাদাস তার মাথাটি দু'হাতে ধরে কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা গলায় বললে "স্পাই।"

চোখে-মুখে অসীম বিস্ময় নিয়ে শৈলেনও প্রতিধ্বনি করলে—"স্পাই !"

কিন্তু তারপরই জিজ্ঞেস করল—"কই ? কোথায় ?"

চোখের ঈঙ্গিতে তারাদাস শৈলেনকে সাথে আসতে বলল। খানিকটা ভিড় ঠেলে চতুর্ভূজ ব্যূহের প্রায় ভিতরে ঢুকে একটা লোকের দিকে তর্জনী নির্দেশ করে বলল—"ঐ"

শৈলেন দেখল একটি লোক বসে খেলা দেখছে। বিদ্‌ঘুটে চেহারা। কালো রং। গোঁফ, খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর মাথার চুল সব যেন পাল্লা দিয়ে সম্মার্জনী-লাঞ্ছন হয়ে উঠছে। বড় বড় চোখ, কিন্তু কোটরগত ও তার চারধারে আধ ইঞ্চি চওড়া কালো বেষ্টনী। দাঁতগুলো উঁচু উঁচু—দুই ঠোঁটের মধ্যে চীনে-প্রাচীরের মত খাড়া হয়ে রয়েছে। মোট কথা মুখমণ্ডলের একটুও রস্‌কস্‌ নাই,—খট্‌খটে—চোয়াড় গোছের চেহারাখানা।

তারাদাস গম্ভীর হয়ে বলল—"নতুন এসেছে। ফলো করতে হবে—দেখতে হবে কার সাথে মিশে—কি করে।"

শৈলেন কৌতুহল বশে জিজ্ঞেস করল—"স্পাই, কেমন করে জান্‌লি, কে বলেছে?"

"ধীরেন দা" তারাদাস আরও গম্ভীর হয়ে উত্তর দেয়।

বিরাট হৈ হল্লার মধ্যে খেলা শেষ হয়ে গেল। তারাদাসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রয়েছে লোকটির উপর। সন্ধ্যার ছায়া নেমে এসেছে। রক্তরাঙ্গা রবি অপূর্ব রক্তিম ছটায় রাঙ্গিয়ে তুলছে পশ্চিমের আকাশ। ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে পদ্মা গর্ভে। ঘোলা জলে লাল আভা পড়ে বর্ণের সমারোহ সৃষ্টি করেছে। মাঠ ভেঙ্গে লোক চলেছে পদ্মার ধারে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই যেন অতর্কিতে আঁধার আক্রমণ করেছে মাঠখানাকে।

তারাদাসের কোন দিকে খেয়াল নেই। সে একদৃষ্টে চেয়ে আছে লোকটির দিকে। হঠাৎ সে দেখতে পেলে চাদর গায়ে একটি যুবক এ লোকটির কাছে এসে ফিস্ ফিস্ করে কি যেন বলেই চলে গেল। তারপর এল একটি মোটা গোছের লোক। ঘনায়মান আঁধারে মুখখানি ভাল দেখা গেল না। এ লোকটি একবার এদিক ওদিক চেয়ে দেখল। তারপর সটান ঐ বসা লোকটির কাছে গিয়ে চুপি চুপি কি যেন বলে চলে গেল। শেষে এল একসাথে তিন চার জন। তারা সকলেই চোয়াড় লোকটির কাছে বসে ফিস্ ফিস্ করে আলাপ জুড়ে দিল। হঠাৎ তাদের একজন উঠে তারাদাসের দিকে অগ্রসর হল। গতিক সুবিধের নয় বুঝে তারাদাস এইবার শৈলেনকে সাথে নিয়ে পদ্মার ধারে চলে গেল।

কিন্তু তাঁর কোন সন্দেহই রইল না যে লোকটি স্পাই।

এরপর সুযোগ পেলেই তারাদাস লোকটির সন্ধান করে। পথে, মাঠে দেখলেই তার পেছু নেয়। লোকটিও যেন তারাদাসকে দেখলেই তীব্রদৃষ্টিতে চেয়ে দেখে,—তারপর ঢেঁকী পাড় দিতে দিতে সরে পড়ে।

লোকটি ল্যাংড়া ছিল।

একটা পা কাঠির মত সরু। তা' ছাড়া যেন বিশালকায় দৈত্য। যেমন মোটা ঘাড় গর্দান, তেমনি চওড়া বুকের ছাতি। বলিষ্ঠ হাত দু'খানিতে একটু আন্দোলনেই মাংসপেশী ফুঠে উঠে। সর্বোপরি মুণ্ডুটা যেন মা কালীর হাতে চমৎকার মানায়।

তারাদাস একদিন মনোরঞ্জনবাবুর কাছে লোকটির আনুপূর্বিক বর্ণনা দিল, বল্ল—"লোকটি সাংঘাতিক ধরণের স্পাই। ওর আশ-পাশ দিয়ে চলা ফেরাও মুস্কিল। ব্যাটার কাছে একটা ছোট্ট ক্যামেরা আছে. দেখতে না দেখতে খুট্ করে ফটো তুলে নেয়।

মনুদা তারাদাসকে বললেন "তাইতো! তা হলেতো খুব বিপদ! দেখাতে পারেন আমাকে?"

"খুব। বেটা প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় হয় কলেজ মাঠে, নয় পদ্মার ধারে আসে।"

মনুদা একদিন তারাদাসের সাথে গিয়ে দূর থেকে স্পাইটিকে দেখে এলেন। গম্ভীর হয়ে বললেন, "এখন কি করা যায়!"

তারাদাস সোৎসাহে বলল, "করার মাত্র একটি পথই আছে,—সেটা হচ্ছে ওটাকে সরিয়ে ফেলা।"

"হয়তো শেষ পর্যন্ত তাই করতে হবে।" চিন্তিতভাবে মনুদা বললেন।

গণকপাড়া মহল্লার একটি বাড়ীর দুখানি ঘর ভাড়া নিয়ে জীবনদা থাকেন। অনুশীলন সমিতির উত্তরবঙ্গ সংস্থার নায়করূপে কিছুদিন আগে তিনি রাজসাহী এসেছেন। জীবনদার ঘর দু'খানি সদর রাস্তা হতে কিছুটা দূরে, ভিতরে। সেখানে সকালে, দুপুরে দুই একজন বাইরের লোক যাতায়াত করে। কিন্তু সন্ধ্যার পর জমজমাট। প্রতি-দিন জীবনদা'র ঘরে ব্যায়ামের আখড়া বসে। তিনি স্বয়ং প্রত্যহ হাজারখানেক ডন ও হাজার দুয়েক বার মুগুর ভাঁজেন। লিক্‌লিকে জিতেশ স্বচ্ছন্দে তাঁর পেটে লাফ ঝাঁপ দেয়, দুই তিন জনে মিলে

তাঁর ভাঁজানো হাত সোজা করার চেষ্টা করে। জীবনদা হাসেন আর বলেন—"না পারলে ফিজিক্যালি আন্‌ফিট্‌ বলে সমিতি থেকে নাম কেটে দেয়া হবে।"

একদিন সন্ধ্যায় মনোরঞ্জনবাবু এসে জীবনদাকে বললেন, "আপনারে একটু হুঁসিয়ার হইয়া চল্‌তে ফিরতে কই।"

জীবনদা বল্লেন, "কিয়ের লাইগ্যা? স্পাই লাগছে নাকি?"

"আরে না—না—"বলেই মনুদা হেসে উঠলেন হো হো করে। বললেন—"তারাদাস আপনারে ঠাউরাইছে স্পাই। কখন কি কইরা বসে—"

কথা শেষ হতে পেল না। জীবনদা বাধা দিয়ে বল্লেন, "আমারে স্পাই ভাবছে? তারাদাস? হেই সরদার পোলাডা না?"

মনুদা ঘাড় নেড়ে জানালেন, "হ্যাঁ।"

"হাচাই তো বিপদ দেখত্যাছি। অখন কি করণ যায়! শ্যাষকালে মাথায় বাড়ী দিয়া মারব নাকি? খাইছেরে—আমারে এক্কেরে খাইছে!"

এধারে তারাদাস স্পাইটিকে সরানোর জন্যে জোর তাগিদ জুড়ে দিল মনুদার কাছে। মনুদা ক্রমাগতই একথা ওকথায় পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু যেদিন তারাদাস তার একনিষ্ঠ ভক্ত শিষ্য জ্ঞানকে দেখল স্পাইটার সাথে আলাপ করতে, সেদিন সে প্রতিজ্ঞাই করে বসল স্পাইটাকে নিশ্চয় সরাবে সে।

মনোরঞ্জনবাবুকে অনুযোগের স্বরে বল্‌লে সে—"অর্গানিজেশন্‌টাকে গোল্লায় দিতে চান আপনারা? জানেন কি হয়েছে? সেই স্পাই বেটা জ্ঞানের সাথে আলাপ করছিল। আজ জ্ঞানের কাছ থেকে যদি কিছু বের করতে পারে—তাহলে কি অবস্থাটা হবে ভেবে দেখুন তো?"

মনোরঞ্জনবাবু এবার গম্ভীর হয়ে বললেন—"তাইতো! বেটায় তো দেহি অনেকদূর আগাইছে! আর তো দেরী করণ উচিত নয়।

কিন্তু সরামু ক্যামতে! গুলী করলে ভয়ানক হৈ চৈ লাইগা যাইব গিয়া।"

এ সমস্যার সমাধান করে দিল তারাদাস। সে বলল—"গুলী কেন?" খাপসমেত একখানা ছোরা সে কোমর থেকে বের করল। ছোরাখানি মনুদাকে দেখিয়ে আবার রেখে দিল যথাস্থানে। তারপর চাপাগলায় বলল—"ওর নিজের অস্ত্রেই ওকে বধ করতে হবে। জ্ঞানকে দিয়েই সন্ধ্যার পর ওকে নিয়ে যেতে হবে পদ্মার ধারে নিরালা জায়গায়। একখানি ভোজালিও ঠিক করে রেখেছি। তারপর আপনি আর আমি ব্যাটাকে এমনভাবে বসাব যে টুঁ শব্দ করারও অবকাশ না পায়। শেষে পাথর বেঁধে গড়িয়ে দেব পদ্মার জলে,—একেবারে গুম্।"

কিছুটা ভেবে নিয়ে মনুদা বললেন—"প্ল্যানডা চমৎকার হৈছে। কিন্তু শ্যাষে জ্ঞান তো বেইমানী কোরব না?"

"বলেন কি? এটা ঠিক জেনে রাখুন তেমন ছেলে রিক্রুট তারাদাস করে না। আজ জ্ঞান যদি বেইমানী করে তা হ'লে তার সামনে আমি নিজের বুকে ছোরা বসাব। কারণ আমি মনে করব আমি দেশের কাজের অযোগ্য,—আমার বেঁচে থাকার কোন সার্থকতা নেই।

"যদি তাই হয়, তা অইলে জ্ঞানের লগে হেরে আলাপ করণ দেইখ্যা অমন ঘাবড়াইছিলেন কিয়ের লাইগ্যা?" মনুদা প্রশ্ন করেন ঈষৎ হেসে।

"ঘাবড়াইনি মোটেই। আমি শুধু তাজ্জব বনে গিয়েছি ব্যাটার সাহস আর ফন্দী ফিকির দেখে। ও নিশ্চয়ই টের পেয়েছে জ্ঞান দলের সভ্য এবং সে অনেক কিছুই জানে। কী ভয়ানক Dirgerous লোক!"—জোরের সাথে জবাব দেয় তারাদাস।

অনেক আলোচনার পর মনুদা বললেন, "জ্ঞানেরে ঠিক করণের ভার আপনার। তবে এ সব কাজে উপরের Sanction লইতে হইব কাল রবিবার বেলা ৪টায় শিরলের জঙ্গলে হাতীডোবা পুকুরের পাড়ে

যে মন্দির আছে সেহানে যাইবেন। আমাগো দলের নর্থ ব্যাঙ্গলের স্তাতার কাছে লইয়া যামু আপনারে। তেনারে সব বুঝাইয়া Sanction লইতে হইব কিনা।”

তারাদাসকে বিদায় দিয়ে মন্নুদা সোজা চলে এলেন জীবনদার বাসায়। হেসে জীবনদাকে বল্লেন—“আপনার শ্যাষদিন তো ঘনাইয়া আইছে। তারা তো আপনারে—ছোরা দিয়া খতম কোরবো ঠিক করছে।”

“খাইছে রে—এক্কেরে খাইছে আমারে—” বলে জীবনদা এক-চোট হেসে নিলেন প্রথমে। তারপর বললেন—‘‘আনেন তো দেহি একবার ক্যামন ছ্যামড়াডা তারাদাস। আমারে খুন করতে চায়—ক্যামন হে আখড়ার সর্দার দেখুম একবার।”

মন্নুদা বললেন—“হে ব্যবস্থা করছি। কাল বেলা চারডায় শিরইলের জঙ্গলে শিবমন্দিরে আপনার লগে তার ত্থাখা হইব।”

ইতিমধ্যে পরেশবাবু (অমৃতলাল সরকার) আর পালোয়ান (সুরেশ চন্দ্র ভরদ্বাজ) এসে উপস্থিত হলেন। এঁদের আসার কথা ছিল। প্রয়োজনীয় কথাবার্তার পর ‘অথ তারাদাস উপাখ্যান’ শ্রবণ করে তাঁরা বিমল কৌতুক উপভোগ করলেন--হেসে হেঁসে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়েন।

পালোয়ান বললেন—“আসছে কা'লের শিরইলের Scene দেখার জন্য আমি পাঁচ টাকার টিকেট কিনতে রাজী আছি।”

“কিন্তু তাই দেখার জন্য সকলে মিলে শিরোলে গেলে কৌতুক-নাট্য বিয়োগান্তও হ'তে পারে।” অল্প হেসে বললেন পরেশবাবু।

“বড্ড খিদা লাগ্‌ছে” বলে এইবার ঘরের কোণে রাখা ভাতের হাঁড়ির দিকে অগ্রসর হলেন মনোরঞ্জনবাবু।

জীবনদা মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললেন—“ওধারে যাইয়া কি হইব? ভাত নাই—রাঁধন লাগব।” মন্নুদার চোখে মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল। অবাক্ হয়ে তিনি বললেন “ভাত নাই! তার মানে?

আরে—সন্ধ্যার আগে আমিই তো আমাগো চারজনের লাইগা কলা সিদ্ধ দিয়া এক হাঁড়ি ভাত রাইন্ধ্যা—ঢাইক্যা রাখ্‌ছি! হে গেল কৈ? কুকুরে খাইছে বুঝি?"

জীবনদা ঢোক গিলে আমতা আমতা করে বললেন, "আবে কুকুর না! বড় খিদা লাগছিল। আপনাগো আওনেব দেবী দেইখ্যা খাইতে বইলাম হাঁড়ি লইয়া। টুক্ টাক্ টুক্ টাক্ খাইতে খাইতে সব শ্যাষ হইয়া গ্যালো গিয়া। করুম্ কি? ভাত কোলে কইবা বইসা থাকন যায়? আচ্ছা কন দেহি আপনারা!"

জীবনদা পবেশবাবু আর পালোয়ানেব দিকে চাইলেন। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে মনুদা বললেন—"এডা কন কি? তাজ্জব ব্যাপার দেখ ত্যাছি। চাবজন জোয়ান মদ্দেব খোবাক্ উঠাইলেন একা আপনি! তাও আবাব কলা সিদ্ধ দিয়া! তাবাদাস ক্যান মারবো না আপনারে কইতে পারেন? আপনারে মাবণ উচিত। তবে স্প্যাই বইলা না,—বাক্ষস্ বইলা।"

পরেশবাবু হো হো কবে হেসে উঠলেন। পালোয়ান হাসিতে যোগ দিলেন না,—ভ্রূ কুঁচিয়ে মুখটা একধাবে সবিয়ে নিলেন। মনুদা তাঁকে বললেন—"আপনে যেনি মুখডা কাঁচু মাচু কোবত্যাছেন। ব্যাপারডা কি কয়েন তো?"

তাঁর বদলে উত্তর দিলেন জীবনদা। "রাক্ষস্ বইলা আমারে পিটাইলে উনিও যে বাদ যান্ না। খাওনেব ব্যাপারে উনি আমার দাদা কি মিতা ঠিক কইতে পারিনা।"

এইবার সকলে একযোগে হেসে উঠলেন।

পবদিন বেলা চারটেয় শিবোল জঙ্গলে প্রবেশ পথে তাবাদাস মনোবঞ্জনবাবুব দেখা পেল। প্রায় তিন চাব মাইল পরিধি নিয়ে বিরাট জঙ্গল। বাঘ, শূয়োর আর সাপেব ভয়ে কেউ বড় একটা ঢোকেনা ভেতরে। লতা গুল্ম আর বড় বড় গাছ সমাকীর্ণ এই বিরাট বনে

সূর্য্যের রশ্মি প্রবেশ পথ পায় না। ফলে মধ্যাহ্নেই প্রদোষের আবছায়া সেখানে বিরাজ করে।

"হাতীডোবার" —কতকটা কাছে গিয়েই হঠাৎ বন্দুকের শব্দ শুনে তারাদাস চমকে উঠল।

"ও কিছু না" বলেই মনুদা তারাদাসের আগে আগে এগিয়ে চললেন। যতই তারা এগিয়ে যায়, ততই আরো শব্দ শুনতে পায়। পুকুর পাড়ে মন্দিরের কাছে এসে তারাদাস দেখতে পেল তিনজন যুবক রিভলভার দিয়ে টার্গেট প্র্যাক্‌টিস্ করছে। একটি গাছের নীচু ডালে তিনটি জবাফুল ঝুলানো রয়েছে—যুবক তিনজন পর পর সেই দিকে তাক্ করে পিস্তল ছুড়ছে। এদের মধ্যে একজন তারাদাসের পরিচিত ছিল। সে জাতিতে মাড়োয়ারী —নাম কৃষ্ণদাস বর্মন। কলেজে পড়ে, —বিবাহিত, -সাঈকেলের পোকা, প্রতিবার সাইকেল রেসে প্রথম হয় কলেজ স্পোর্টসে। তাকে দেখে তারাদাস মনে মনে খুব আনন্দিত হল।

মনুদা তারাদাসকে নিয়ে অগ্রসর হলেন এদের পেছনে ফেলে। গম্ভীর হয়ে বললেন--"এইবার নর্থ ব্যাঙ্গলের অর্গানাইজারের সাথে ছ্যাখা হইব। তাঁরে সবডা বুঝাইয়া বলবেন।"

মন্দিরের পূর্ব পাশে মনুদার সাথে তারাদাস গিয়ে দেখে দুজন লোক কথাবার্তা বলছে! অস্পষ্ট আলোকে দূর থেকে চেনা না গেলেও তার মনটা ছ্যাৎ করে উঠল। একদম কাছাকাছি গিয়েই তারাদাস দেখে সেই স্প্যাইটা বসে রয়েচে—আর তার সামনে জ্ঞান। মনুদা তারাদাসের অবস্থা দেখে ঈষৎ হেসে বললেন—"ইনিই হইত্যাছেন নর্থ ব্যাঙ্গলের অর্গানাইজার। রাজেন বাবুর বদলে কিছুদিন হইল এহানে আইছেন। এইবার কয়েন আপনার কথা।"

হঠাৎ তারাদাস রাগে ফেটে পড়ল। চীৎকার করে বলল "ধাপ্পা-বাজি! ইয়ারকি! নিজের লোকের সাথে এসব করার মানেটা কি?"

আর সে বলতে পারল না। ক্রোধে, ক্ষোভে তার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পল,—কথা গলায় আটকে গেল।

জীবনদা উঠে হাত ধরে তাকে বসালেন। কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব মোলায়েম করে বললেন—"খুব অন্যায়! আমি কই কামডা খুবই অন্যায় হইছে। কিন্তু তোমারে একডা কথা কই তারাদাস! এ জগতে চূড়ান্ত ভালো আর চূড়ান্ত মন্দের বাইরের রূপ প্রায় একই প্রকারের। চূড়ান্ত লাল কাল আভা ধারণ করে, চূড়ান্ত মিষ্টি জিহ্বায় দিলে তিৎ লাগে। তাই বিচারডা করণ লাগে খুব সুক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়া। স্পাই অপবাদ দ্যাশসেবকের পক্ষে সব চাইতে বড় অপবাদ। কারেও এডা দ্যাওনের আগে খুব ভাল কইরা দ্যাখন চাই আকাট্য প্রমাণ পাওন চাই। আজ যদি তুমি আমাগো আপনার লোক না হইতা, যদি অন্য কোনও দলের লগে থাকতা— তা হইলে কি সর্বনাশ হইত কও দেহি। আমারে খুন লইয়া দুই দলে হইত শক্তি পরীক্ষা নিতান্ত নির্বোধের মত, বৃটিশ সরকারের কেশস্পর্শও করতাম না কেউ,— "বিপ্লব" পইড়া থাকতো একপাশে।"

কথাগুলো তো সত্যিই। লজ্জিত হল তারাদাস। মাথা নীচু করে রইল সে।

এইবার জীবনদা বললেন—"ভুল চুক মানুষেরই হয়। তা' লইয়া লজ্জার কিছু নাই। তুমি আমারে স্পাই ভাবছিলা। তাই আজ হইতে তোমারে আমি বানাইলাম স্পাই। রাজসাহীর সি, আই, ডি মহলের উপর তোমার নজর রাখতে হইব। তাগো activity তোমার দলবল লইয়া তুমি watch করবা,—প্রতিদিন খবর দিবা আমারে। অর্থাৎ আজ হইতে তুমি স্পাইয়ের উপর স্পাই— মহাস্পাই।"

অনাহারে, অনিদ্রায় ঘুরে ঘুরে,—অশেষ ক্লেশের মধ্যে বন, জঙ্গল, পাহাড়, নদী অতিক্রম করে দাস্থ, কালু (প্রবোধ বিশ্বাস) ও স্কলারের সাথে চপল চলে এল মজঃফরপুরে। এখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা খুব কম না হলেও সকলেই সকলের চেনা জানা। নূতন বাঙ্গালী গেলেই চোখে পড়ে। সুতরাং সকলের ভোল বদলে গেল। শীতের দিন। তাই গায়ে চড়ল লম্বা কোট, মাথায় উঠল কাপড়ের অথবা বনাতের ভাঁজকরা টুপী,—ধুতিখানা পর্যন্ত কোমরে বেঁধে পা'ড়ের ঢেউ খেলিয়ে বিহারী কায়দায় পরা শিখতে হল। বেশ লাগছিল চপলের এইরকম কোমর বেঁধে কাপড় পরা। পাড়াগাঁয়ের বাল্যজীবন স্মরণ করিয়ে দেয়। আরও সুবিধের বিষয় এই যে আর বেল্ট পরতে হয় না— রিভলভার, পিস্তল সচ্ছন্দে গুঁজে রাখা যায় কোমরে। স্কলার আগে বিহারেই ছিল। তাই ঠেঁট বিহারী বনে গেছে। কোঁচা দেয়া দেখলেই সে বলে "উঁহু ! . ঐসে নেহি। উস্‌মে মালুম হোগা—

"মচ্ছী খাতা হায় জাত বাঙ্গালী—
ঝিল্‌কে ধোতি ঢিলী ঢালী।"

এতো এক রকম চলে। কিন্তু বিপদ হল কথা নিয়ে। হিন্দী বলতে হবে বাবা—চালাকী চলবে না। স্কলার আইন জারী করল কেউ কখনো —এমন কি বাসায় পর্যন্ত বাংলা বলতে পারে না। যেমনই হোক হিন্দী বলতেই হবে। ফলে হিন্দী বাংলা মিশ্রিত দোঁআঁশলা ভাষা দেখা দিল সকলের মুখে। "হাম ভাত নাই রাঁধেগা,—তোমার বদন আচ্ছা নাহি হুয়"—প্রভৃতি কথার সাথে সাথেই হাসির ধুম পড়ে যায়। একদিনচপল ভাত রাঁধছে আর গুণ গুণ করে গান গাচ্ছে —"ভারত আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ।"

স্বলার আড়ি পেতে শুনেছে তাই। চপলের সামনে এসে আদেশের ভঙ্গীতে সে বললে—"য়্যাসা গানা ম্যৎ কীজিয়ে জনাব! ইয়াদ রাখিয়ে ইয়ে আপ.কা বাংলা মুলুক নেহি হুয়—ইয়ে হুয় বিহার। হিঁয়াপর ভারম মাতাকী গানা হোনা চাইয়ে য়্যাসা"—বলেই সে গান জুড়ে দিল—

"সুন্দর সুভূমি ভাইয়া! ভারতকী দেশোয়া সে,
মোর প্রাণ রোয়ে উসী দুখেরে, বট হিয়া!--
একদ্বার ঘেরে রামা হিম কোতোয়াল সে
তিনদ্বার সিন্ধু ঘহরাবেরে, বটহিয়া।"

এই সব আনন্দের মাঝ দিয়ে দিন কাটছিল মন্দ না। এবারে স্বলার বিদায় নিয়ে চলে গেল কলকাতায়।

মাস দেড় পরের কথা। তখন বিহার প্রদেশের বিপ্লবী সংস্থার নায়ক ক্ষেত্র সিংহ। সকলে ডাকে তাঁকে কর্তার সিং বলে। বাংলা দেশের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য দাসু, কালু, কর্তার সিঃ, চপল সব এসে জুটেছে নবদ্বীপে। হঠাৎ একদিন বাসা থেকে হাত পঁচিশেক দূরে সদর রাস্তার উপর দাসু ও কালুকে একদল পুলিশ চেপে ধরল। হেঁপো রুগী কর্তারকে নিয়ে চপল নদী পার হয়ে সরে পড়ার জন্য নৌকায় চাপল। নৌকায় আরও কয়েকজন লোক খেয়া পার হচ্ছিল। একজন কর্তার সিংকে জিজ্ঞেস্ করল—"আপনারা যাবেন কোথায়?"

"কেষ্টনগর" উত্তর দিলেন সিংজী।

"কেষ্টনগর কোথায়—কার বাড়ীতে?" আবার প্রশ্ন;

"শরৎ রায় মোক্তারের বাসায়"—ধাঁ করে বললেন কর্তার সিং

"শরৎ বাবুর বাসা? সে তো আমার বাসায় লাগা। চলুন একখানি গাড়ী ভাড়া করেই যাওয়া যাবে। বেশ হবে!" (তখনও রেল হয়নি)।

চপল মনে মনে প্রমাদ গণল। বেশ হবে! কিন্তু এযে তেড়ে মারা বেশ হওয়া।

নদী পার হয়েই ভদ্রলোক একখানি গাড়ী ভাড়া করে চপলদের ডাক দিলেন—"এই যে গাড়ী। আসুন আপনারা।"

কর্তার সিং হতভম্ব।

"আমি আসি" বলে চপল এগিয়ে গেল ভদ্রলোকটীর কাছে। ফিস্ ফিস্ করে তাঁকে যেন কি বললে সে। তারপরই ভদ্রলোকটী গাড়ী নিয়ে চলে গেলেন। চপল হাসতে হাসতে এসে কর্তার সিংকে বললে--"দিইছি ভাগিয়ে।"

"তুই কি বললি?" প্রশ্ন করলেন সিংজী।

"কী আর! বল্লুম—আমার দাদার সিফিলিস্। তার উপব থাইসিসের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। একসাথে যাওয়া কি ঠিক হবে?"—

"বটেরে পাজী কোথাকার! আমার সিফিলিস্ আবার থাইসিস্!" কৃত্রিম কোপের সাথে সিংজী বললেন।

"আরে জবরদস্ত সিফিলিস আর থাইসিসের নাম শুনেইতে হারকিউলিস্ পালিয়েছে! তা' না হলে কোর্ট অব জাষ্টিসে হাজির হতে হত যে।" চপল হেসে উত্তর করল।

দুজনে আবার ফিরে এল মুজঃফরপুরে। আবার ফিরে এল বিহারীজীবন। এইবার চপলের নাম গেল বদলে। বিহারে দলের লোকেরা তাকে জানল "শাস্তিলাল নামে,—ছেলেরা ডাকে 'শাস্তি ভাইয়া" বলে। বহরমপুর জেল থেকে মুক্তি পেয়ে বর্মার দীনেশ বিশ্বাস ওরফে ফুঙ্গিদা সেখানে এসে হাজির হলেন কয়েক দিনের মধ্যেই। বাসায় ছয়জন লোক। তার মধ্যে মদন নামে এক বিহারী ছাত্র সভ্যও আছে। সেই বাজার হাট করে,—জল আনে আর বাইরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। কখন কখন রাত্রে সিংজী আর শাস্তি বাইরে বের হয়—দলের লোকজনের সাথে দেখাসাক্ষাত ও আলোচনা করার জন্য।

রাতে সকলে পালা করে পাহারা দেয়—বন্দুক ঘাড়ে নিয়ে। শ' পাঁচেক কার্তুজ আছে ১২ বোরের বন্দুকটীর। আর রয়েছে গুটী তিন রিভলভার ও ছত্রিশ রাউণ্ড গুলী। বেশ চলবে খণ্ডযুদ্ধ। পুলিশ এলে হাসি মুখে ফিরে যাবেনা নিশ্চয়।

শান্তি রাতে পাহারা দেয় আর এই সব ভাবে। তার মনের কোণে সন্দেহও মাঝে মাঝে দেখা দেয়। আমরা তো জীবন দিলাম—পুলিশেরও জীবন নিলাম। কিন্তু তারপর? এই দেয়া নেয়াতেই কি পূর্ণ হবে উদ্দেশ্য—সফল হবে বিপ্লবের আশা? তার মন যেন বলে নাটকের প্রথম অঙ্ক হয়তো এখানেই শেষ হবে। জনসাধারণের মধ্যে যদি থাকতো বৈপ্লবিক জাগরণ;—আমাদের দেয়া নেয়া, এই সংগ্রামের স্ফুলিঙ্গ দেশ জুড়ে দাবদাহ সৃষ্টি করত;—বৃটিশের সুখের সাম্রাজ্য পুড়ে ছাই হয়ে যেত সেই দাবানলে। চোখের সম্মুখে তার ভেসে ওঠে ফরাসী বিপ্লবের ছবি। যে যেবেশে ছিল সেই বেশেই, হাতের কাছে যে যা পেয়েছে তাই নিয়েই অজস্র সাধারণ নরনারী ছুটে চলেছে ভৈরব হুঙ্কারে, অত্যাচারের প্রতীক ব্যাষ্টিল কারাগার ধ্বংসের জন্যে,—আক্রমণ করেছে রাজপ্রাসাদ অজস্র কণ্ঠের উন্মত্ত গর্জনে, স্তব্ধ হয়েছে রক্ষী বাহিনীর আগ্নেয়াস্ত্র, বিপ্লবী জনতার পুরোভাগে যারা ছিল তাদের দেহ গুলির আঘাতে লুটিয়ে পড়েছে ভূতলে,—কিন্তু জনতার তাতে ভ্রুক্ষেপ নাই,—গতি তার অব্যাহত,—সে এগিয়েই চলেছে এগিয়েই চলেছে। অবশেষে ব্যাষ্টিলের লৌহদ্বার ভেঙ্গে গেল জনতার চাপে,—রাজপ্রাসাদ অধিকৃত হল জনতার দাপে। শান্তিলাল দীর্ঘশ্বাস ফেলে—আর পাহারা দেয়।

কয়েকদিন পরে কামতাপ্রসাদ বাসায় এসে খবর দিল—"স্পাই যেন লক্ষ্য কচ্ছে বাসাটা। এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়।"

বাসা বদলানোই ঠিক করা হল। কামতা একটা বাসাও ভাড়া করে এল। সন্ধ্যার পর মাল পত্তর সেখানে পারও করা হল। কিন্তু

কর্তাব সিং হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় সেই বাতেই বাসা পরিবর্তন করা সম্ভব হলনা।

রাতে কারো খাওয়া হয়নি। খুব ভোবে উঠে ফুঙ্গিদা ভাত চাপিয়েছেন। সবেমাত্র ফবসা হয়েছে। হঠাৎ মদন বলে উঠল, "ভাইয়া। House তো raid হো গিয়া' —

শান্তিলাল দৌড়ে গেল জানালার ধারে। সত্যিইতো! পুলিশ ঘিরে ফেলেছে বাসা। এখন উপায়! নীচ তলাব প্রতিটী দুয়ারে শিকল চডানো। ঠিক হল সব একযোগে লাফিয়ে পডতে হবে দোতালা থেকে। যে বাঁচে আব যে ধবা পডে। চক্ষুব নিমেষে ফুঙ্গিদা ফুটন্ত ভাতেব হাঁড়িটা নিক্ষেপ করলেন বাইরে। হাড়িটা মাটিতে পড়ার সাথে সাথেই পুলিশেব বেষ্টনীতে ফাটল ধবে গেল। সেই ফাঁকা স্থানে পর পর ছযজন পড়ল লাফিয়ে। দৌড় দিয়ে একটু যেতেই দুজন পুলিশ কনষ্টেবল সিংজিকে চেপে ধরল। শান্তিলালের হাতে ছিল একটা বাঁশেব টুকবো। গায়ের জোবে তাই দিয়ে একজন সিপাহীব পিঠে বসিয়ে দিল এক ঘা'। তাবপব দে ছুট।

একঘণ্টা পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল সব ধবা পডেছে,—বেঁচেছে মদন আব শান্তিলাল।

সিংজী, ফুঙ্গীদা প্রভৃতিকে অভিযুক্ত করা হল ১০৯ ধারায়। এব ফল কি তা' তো জানাই আছে। তবু মামলা চালানোই স্থিব করল শান্তিলাল, রাম বিনোদ, ধ্বজাপ্রসাদ, কামতা প্রভৃতি বিহাবেব বিপ্লবী কর্মীবা। মহা মুস্কিল। শান্তিলাল বললে—"মামলা তো মামলা —আরে পার্টি ক্যায়সে চলে, মেরে সমঝমে তো নাহি আতা। রূপেয়া কাঁহা?"

রাম বিনোদ বিহাবেব বিপ্লবী ছাত্রদেব অবিসংবাদী নেতা। তিনি বললেন—"হাম পানশোকী ইন্তেজাম কব দেঙ্গে। প্রফেসব কৃপালিনীজীকে আনেকে বাৎ হুয়। একদফে উনহোনে পানশো দে চুকা, —ফিন্‌ভি কুঁচ্‌ মিলনে কি উমিদ হ্যয়। প্রফেসর মালকানি থোড়া

বহোৎ মদৎ দেঙ্গে।" (প্রফেসর কৃপালিনী পরে রাষ্ট্রপতি প্রফেসর মালকানি গুজরাট বিদ্যাপিঠের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন।)

শান্তিলালের প্রাণে ভরসা এল। তবু সে বললে—"ওতে হবে না, আরও টাকা চাই। বিহারের প্রত্যেকটী জেলায় অর্গানিজেশন চালাতে মাসে প্রায় দুইহাজার টাকা চাই। তার উপর অস্ত্র সংগ্রহ তো হাতীর খোরাক। এত টাকা কোথায় পাব?"

ঠিক এই সময় দাশু চাটার্জিকে সাথে নিয়ে ব্রজেন বাঁড়ুয্যে ঘরে প্রবেশ করল। ব্রজেন নাটকীয় ভঙ্গীতে বলে উঠল—"মাটি ফুঁড়ে উঠবে মহারণা।"

সকলে হেসে উঠল।

কিন্তু বাস্তবিকই টাকা মাটী ফুঁড়ে উঠল। দাশুর বাবা মেজেতে গাড়া সিন্দুকে প্রায় তিন হাজার টাকা রেখেছিলেন। একদিন দাশু তার সমস্তটাই নিয়ে এসে শান্তিলালের হাতে দিল। টাকাতো হল। এইবার উকিল যোগাড় করা চাই। নামজাদা উকিল কালী বসু ক্ষুদিরামকে সমর্থন করেছিলেন। একদিন সন্ধ্যার পর ব্রজেনকে সঙ্গে নিয়ে শান্তিলাল গেল সেখানে। ব্রজেন বাইরে বারান্দায় অপেক্ষা করতে লাগল—শান্তিলাল গেল বৈঠকখানা ঘরে। কালীবাবু তাকেয়া ঠেস্ দিয়ে বসে আছেন। শান্তিলালকে দেখেই তিনি প্রশ্ন করলেন —"কি চাই?"

"আমি একটা কেসের সম্পর্কে আপনার কাছে এসেছি"—শান্ত-ভাবে উত্তর দিল শান্তিলাল।

"বলুন"—

এইবার ধীরে ধীরে শান্তিলাল বুঝিয়ে বলে—"কয়েকদিন আগে এই শহরে চারজন বিপ্লবী ধরা পড়েছে বোধ হয় জানেন। তাঁদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্যবিধির ১০৯ ধারা অনুসারে মামলা চলছে। আপনাকে আসামী পক্ষ সমর্থন করতে হবে।"

"আসামীদের মধ্যে কেউ আপনার আত্মীয় আছেন বুঝি"—জিজ্ঞাসুনেত্রে কালীবাবু চাইলেন শান্তির দিকে।

"না। আমিও দলের সভ্য"—শান্তি বুঝিয়ে বলে।

কালীবাবু বললেন--"একটু বসুন।"

তারপর আলমারীর ড্রয়ার খুলে একটি বোতল আর গ্লাস বের করলেন। সোডাব বোতল সামনের টেবিলেই ছিল। এইবার গেলাস গেলাস মদ আর সোডা ঢালেন আর ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে যান। শান্তিলাল হতভম্ব। প্রায় আধ বোতল মদ সাবাড় করে কালীবাবু তাকালেন তাব পানে। বেশ আয়াসেব সাথে বললেন--"হুঁ - তারপর ?"

শান্তিলাল একদম হতবাক্। চোখেব সামনে এমন মদ খাওয়া সে জীবনে দেখেনি।

কালীবাবু এইবার প্রশ্ন কবলেন —"আচ্ছা—আপনারা মাতালকে বিশ্বাস করতে পারেন ?"

শান্তি সংযতভাবে উত্তর দিল —"আমি মাতালের কাছে আসিনি —উকীলের কাছে এসেছি; যে উকীল বাংলাব প্রথম শহীদ ক্ষুদিরাম-কে সমর্থন করেছেন।"

ক্ষুদিরামের নাম শুনেই কালীবাবু থমকে গেলেন। অনুচ্চস্বরে বার কয়েক উচ্চাবণ কবলেন -"ক্ষুদিবাম —ক্ষুদিরাম!" তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করলেন "আপনাদের কি জীবনেব মায়া নেই ?"

"দেশের মায়া জীবনের মায়াকে আচ্ছন্ন করেছে। আমাদের আত্মাহুতি যদি দেশাত্মাব মুক্তি আনতে পাবে—সার্থক হবে আমার জীবন।" উত্তর দিল শান্তিলাল।

হঠাৎ কালীবাবুর চোখ মুখের ভাব পরিবর্তিত হল ? এক হিংস্র-দৃষ্টি দেখা দিল তাঁর চোখে, ক্রূর হাসি ঝলসে উঠল মুখে। সহসা তিনি বলে উঠলেন "যদি এখন ধবিয়ে দি"—

তড়াক করে শান্তিলাল দাঁড়িয়ে গেল। চক্ষুর নিমেষে একটি

রিভলভার বের করে—কালীবাবুর দিকে তাক্ করে বলল "তার আগে আপনার জীবন দিতে হবে।"

হো হো করে কালীবাবু হেসে উঠলেন। বললেন - "My dear friend! You came to me without any introduction. So I was testing whether you are a real man."

"I hope I have come out of the test successfully."—শান্তিলাল উত্তরে বললে। রিভলভারটি নাচিয়ে বল্ল—"And this little weapon served as my introduction."

তারপর মোকদ্দমার কথা, বিহারের বিপ্লব দল সম্প্রসারণের কথা অনেকক্ষণ ধরে তাদের মধ্যে আলাপ হল। কালীবাবু মাস মাস আড়াইশো টাকা তুলে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

মুঙ্গেরে কয়েকটি রিভলভার পাওয়া যেতে পারে খবর পেয়ে টাকা কড়ি নিয়ে শান্তি রওনা হল মুঙ্গেরে। সঙ্গে আছে গুরুজী (শচীন বক্সী)। ট্রেণের মধ্যে এক বিহারী ভদ্রলোক গায়ে পড়ে আলাপ জুড়ে দিল শান্তিদের সাথে।

"বাংগালসে এক বোমগোলাওয়ালা আয়া বিহারমে। য়্যাসা হুজ্জতী লাগায় উস্‌নে ক্যা কহে। জেবাসা ভি মোওকা নাহি মিলতা আরাম কী, -হামেসেই দৌড়ো আউর ছোটো।"

শান্তি বলল—"হাম লোগোঁকে নজরমে আনেসে আপকো জরুর খবর দে দেঙ্গে, -আভি বাতাইয়ে তো আপ কাঁহা রহতে হেঁ?"

কোন রকমে লোকটির হাত থেকে নিস্তার পেয়ে উভয়ে উপস্থিত হল মুঙ্গেরে। রাজকুমার সিংয়ের মারফত কয়েকটা অস্ত্রও পাওয়া গেল। কিন্তু হঠাৎ একদা সন্ধ্যায় বাসা ঘিরে ফেলল পুলিশ। গুলীর মুখে উভয়ে পথ করে নিল। হাঁটা পথে রওনা হল ভাগলপুর অভিমুখে।

শীতের দিন উভয়ের গায়েই গেঞ্জি আর পাঞ্জাবী ছাড়া অন্য কিছু নেই। ফলে জামালপুর ছাড়িয়ে কয়েক মাইল এসেই উভয়ের পা

নেতিয়ে পড়ল। একটা আমবাগানের মধ্যে ঢুকে পড়ল উভয়ে। প্রচণ্ড শীতে ঠক্ ঠক্ কাঁপছে।

পেটে ভাত নেই, গায়ে বস্ত্র নেই, উপরন্তু এই দারুণ শীত। প্রথমে দুজনে দুজনেব গা মাসেজ করে তাপ সঞ্চারের চেষ্টা পেল। তাতে ব্যর্থ হয়ে নীববেই হেসে নিল তারা। আবাব বাগান থেকে পথে বেরিয়ে এল। চলতে লাগল হাত ধরাধরি করে। কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া যেন হাড়েব ভিতর কাঁপুনি আনে। স্রেফ মনের জোরেই চলতে লাগল তারা। শান্তিলাল সাথীকে বললে—"এ গুরুজী! শুনিয়ে। ইসমে মালুম হোগা কোন পাপী হ্যায়। পাণ্ডবোঁ কো স্বরগ যানেকা বাত্ ইয়াদ কীজিয়ে। যো জ্যাদে পাপী হ্যয় উও পহেলে গিরেগা।"

পরদিন বেলা প্রায় দশটায় পৌঁছুল তারা ভাগলপুর। বিশিষ্ট সভ্য—আইনের ছাত্র ধ্বজাপ্রসাদ শাহুর ঘরে আশ্রয় নিল দুজনে।

ক্রমে ভাগলপুব বিহারের কেন্দ্র হল। দলেব বিশিষ্ট নেতা রামবিনোদ সিং (বর্তমানে আইন সভার সদস্য) বেতিয়ার হেড্‌মাষ্টার, মুজঃফরপুরের রাওজী, (রাম দত্ত সিং A. S. I) ভাগলপুরের মদনগোপাল যোশী রাসবিহারীলাল (বর্তমানে এম্, এল, এ), ধ্বজাপ্রসাদ, মুঙ্গেরের দেবেন দাসগুপ্ত আরও সকলেই উৎসাহের সাথে কাজে লেগে গেলেন। বিহারেব বিপ্লবী নেতাদের এক বৈঠকে শান্তিলাল প্রস্তাব করল ধর্মের আবরণে বৈপ্লবিক ভাব প্রচারের জন্য জন কয়েক প্রচারক সংগ্রহ করা প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে ইস্তাহারও ছাড়তে হবে। রামবিনোদেব মনে গান্ধীজীর চম্পারণ সত্যাগ্রহ বেশ প্রভাব বিস্তার করেছে। তিনি সোৎসাহে সায় দিলেন।

ধ্বজাবাবুর বাসায় প্রবেশের পথে একদিন একটি লোক গুরুজীকে প্রশ্ন করল—"তুম কোন হ্যয়? কেয়া নাম?"

ব্যাপার ভাল না। সন্ধ্যাতেই শান্তিলাল আর গুরুজী সহরের উপকণ্ঠে নাথনগরে এক চাষীর গৃহে আশ্রয় নিল। সেখানে সকলের

সাথে মাঠে কাজ করে গুরুজী আর শান্তিলাল। মুখে মুখে প্রচার করে বিদ্রোহের ভাব,—আর মাঝে মাঝে জটলা করে সকলকে পড়ে শোনায় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র "প্রতাপ"। কিষাণের খাদ্য—ছাতু, ভুট্টা ঝলসানো আর জোয়ারীর রুটী খায় তারা, আর পরিধান করে মোটিয়ার কামিজ, ময়লা মোটা অপ্রশস্ত ধুতি। সন্ধ্যার পর কেউ তাদের দেখতে পায়না। ছাপ ধুতি, কামিজ পরে, মাথায় টুপী দিয়ে ভদ্রলোক সেজে তারা প্রায়ই যায় সহরের দিকে।

তাদের আশ্রয়দাতা মহাবীর একদিন গরুর খোঁজে নাথনগর গড়ের কাছে গিয়ে দেখে গড়ের নীচে এক নিরালা স্থানে দুটি লোক আলাপ কোরছে। সন্ধ্যার আঁধারে ঠিক চেনা যায় না। কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল—"কোন হ্যয়।"

"হাম হ্যয় ভাইয়া"—উত্তর দিল শান্তিলাল। মহাবীর অবাক্ হয়ে গেল। শান্তিলাল গড়ের একজন সুবাদারের সাথে আলাপ জুড়ে দিয়েছে। কিষাণের ছেলে শান্তিলালের সুবাদারের সাথে এত কি কথা থাকতে পারে সে ভেবেই পায়না।

দিন দশেক পরে নাথনগরে জোর কলেরা লেগেছে! প্রতিদিন দু'টো একটা মরছে। গুরুজী আর শান্তিলাল পাড়ার কয়েকটি ছেলে নিয়ে লেগে গেছে সেবাকার্যে। রোগীর শুশ্রূষা তো আছেই। তার উপরও বাড়ী বাড়ী গিয়ে কিভাবে চলতে হবে, কি কি খেতে হবে, বাড়ীঘর কেমন করে রাখতে হবে বলে এল। গাঁয়ের এক বুড়ো মাতব্বর এই সব দেখে মন্তব্য করল "এ দুনো কোন্ ছৌ রে। দুস্‌রে কে বাস্তে মরণ কবুল করাইছে, য়্যাসা কাম তো হাম কভি ন দেখাইছি জীন্দিগীমে।"

মহাবীরের বাড়ীতে শীতের রাতে খোলা বারন্দায় থাকতে হয়। তাই দলের সভ্য পাঠশালার পণ্ডিত মাহেশ্বরীলাল নাথনগর গড়ের নীচেই একটা বাসা ভাড়া কোরলেন। সেখানেই শান্তিলাল আর গুরুজী থাকতে লাগলো। এই বাসায় একদিন খুব মজার ব্যাপার

ঘটে গেল। বেলা তখন দশটা হবে, পণ্ডিতজী গিয়েছেন পাঠশালায়। গুরুজী ভাত পাক কচ্ছের্ন পাকঘরে। শয়নঘরের বারান্দায় বসে শান্তিলাল 'প্রতাপ' পড়ে শোনাচ্ছে ব্রজেন বাড়ুয্যেকে। ব্রজেন দু দিন হল মুজঃফরপুর থেকে সেখানে এসেছে। গেটের দোরটা ভেজানো রয়েছে। হঠাৎ দোর খুলে একদল পুলিশসহ একজন অফিসার প্রবেশ করল। সঙ্গে সঙ্গেই ব্রজেন ঘরের ভিতরে গিয়ে রিভলভার নিয়ে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হল। শান্তিলাল তার দিকে চেয়ে দেখে সে ট্রিগারে হাত দিয়েছে। হাতের ইশারায় বারণ করে শান্তিলাল এগিয়ে গেল পুলিশ অফিসরটীর কাছে। কঠোর স্বরে প্রশ্ন করল—কেয়া মাংতে? অফিসরটীর চোখে মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠল। সে বোলল –"এ ডেরা হাম তো কেবায়া লিয়া"—ইতিমধ্যে দুটো কাপড় ঘেরা ডুলি এসে নামলো আঙ্গিনায়।

শান্তি এবার কর্কশ কণ্ঠে বোলল, "দিল্লাগীকে যাগা নাই মিলা? আভি নিকাল যাইয়ে, নিকাল যাইয়ে।"

এরই মধ্যে ঝড়ের মত পণ্ডিতজী এসে হাজির। তিনি ব্যাপার বুঝে সপ্তমসুরে এমন সব সাধুভাষা প্রয়োগ করলেন যে দারোগাজী ডুলী তুলে নিয়ে তো ভাগলেনই,—শান্তি আর ব্রজেনও কাণে আঙ্গুল দিল।

বিপদ তো কাটলো। কিন্তু গুরুজী কোথায়? ভাত পোড়ার গন্ধে সবার দৃষ্টি পড়ল পাকঘরে। ব্রজেন ছুটে এসে খবর দিল গুরুজী নেই।

পণ্ডিতজী এর সমাধান করে দিলেন। তাঁর কথায় জানা গেল তাঁকে house raid এর খবর দিয়েই গুরুজী এক বস্ত্রে ছুটে চলে গিয়েছেন ভাগলপুরে এই দুঃসংবাদ বহন কোরে। সন্ধ্যার পর শান্তি তাঁকে বের কোরলো যোশীর বাড়ী থেকে। তারপর খুব হাসাহাসি! ব্রজেন এবারে শান্তিকে জিজ্ঞাসা কোরল—গুলি করতে কেন নিষেধ করলেন? কি করে ঠিক পেলেন পুলিশদল আমাদের ধরতে আসেনি?

শান্তি বোললে—"তুমি তো আজ আমাদের বারোটা বাজিয়েই

দিয়েছিলে। গুলি কোরলে আর রক্ষা ছিলনা। প্রথমে তো আমিও ভড়কে গিয়েছিলাম। কিন্তু চট করে লক্ষ্য কোরলাম পুলিশের হাতে বন্দুক নাই। আর ধরতে এলে যে ক্ষিপ্রতা আর আয়োজন দরকার ওদের হাবভাবে তার অভাব বোধ হল। দারোগা বেচারা যেন থতমত খেয়ে গেছে আমাদের দেখে। তাই ধাঁ করে মনের মধ্যে খেলে গেল এটা comedy of errors. পাছে tragedyতে পরিণত না হয় তাই তোমাকে ইসারায় বারণ করেছি গুলি কোরতে। কিন্তু তবুও এখনই নাথনগর ছাড়তে হবে। দারোগা সাহেব বিবি নিয়ে এসেছিলেন· তাঁকে আর কষ্ট দিলে ধর্মে সবে না।

আবাব তারা ফিরে গেল ধ্বজাবাবুর বাসায়। সেখান থেকে শান্তিলাল কোথায় চলে গেল,—কেউ পাত্তা পেলনা। দশ পনর দিন পর ভাগলপুর শহরে জোর গুজব একজন ফিরিঙ্গী যুবক রিভল-ভার সমেত ট্রেণের কামরায় ধরা পড়েছে। নাম বলেছে উইলিয়াম লৌরী। ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশসাহেব, জেলসুপার সবাইকে সে গরম গরম বাৎ শুনিয়ে দিচ্ছে। পুলিশের সন্দেহ উইলিয়াম তার নাম নয়। কিন্তু সে যে কে—ঠিক কবা যায়নি।

১৯১৮ সালেব ১২শে ডিসেম্বর তার বিচারের দিন। সেদিন তাকে কোর্টে হাজির কবা হবে। ফলে 'সাহেব স্বদেশী' দেখার জন্যে কোর্ট লোকে লোকারণ্য। এস, ডি, ও মৌঃ সরাফদ্দিনের কোর্টে উই-লিয়ামকে সত্যিই হাজির করা হল। হাকিমজিজ্ঞেস করলেন—"Hav you got any defence—any lawyer to defend you ?"

নির্লিপ্ত স্বরে আসামী উত্তর দিল "Man cannot defend a man. Lord will speak through me when the time of defence comes."

ধ্বজাবাবু, ব্রজেন, যোশী অনেক দূরে ছিল। আসামীকে ভাল করে দেখতে পায়নি। এবার তার কণ্ঠস্বরে তারা চমকে উঠল। ভিড় ঠেলে অগ্রসর হোয়ে তারা দেখতে পেলো সাহেবী পোষাকে কাটগড়ায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শান্তি ভাইয়া।

প্রায়শ্চিত্ত

১৯২০ সালে ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জের ঘোষণায় বহু রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেয়া হোয়েছে। যুক্তপ্রদেশের মৈনপুরী ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম নায়ক আর্য সমাজী পণ্ডিত রামপ্রসাদ বিস্মিলও মুক্ত হোয়ে নিজগৃহ শাহজাহানপুর এসেছেন। ষড়যন্ত্র মামলার বন্দী,—ভারত সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমে লিপ্ত ছিল এরা,—কী ভীষণ! তাই বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন কেউ বড় ঘেঁসেনা এঁর কাছে। সহসা একদিন সন্ধ্যার পর এক মুসলমান যুবক এল তাঁর গৃহে। যুবকটি সোজাসুজি প্রশ্ন কোরল—"আমাকে নেবেন আপনাদের দলে।"

বিস্মিত রামপ্রসাদ জিজ্ঞাসা কোরলেন—"আপনার নাম?"

"আস্‌ফাকউল্লা"—জবাব দিল যুবক।

"আপকা মকান্?"

"আপ না কহিয়ে—কহিয়ে তুম! ম্যায় ইসি শহরকী রহনেওয়ালে" —জবাব দিল যুবকটি।

রামপ্রসাদের মনে সন্দেহ দোলা দেয়। তাঁর আর্যসমাজী সংস্কার মনের মাঝে উঁকি ঝুঁকি মেরে বলে—বিশ্বাস কোরোনা মুসলমানকে। রামপ্রসাদ ইতস্ততঃ কোরে বলে "ম্যায় হালমে বাহার আয়া—বাহারকী হালচাল কুচ্‌ভি মুঝে মালুম নেহি। দুচার রোজ বাদ আও দোস্ত।"

আস্‌ফাক মাঝে মাঝেই যায় রামপ্রসাদের কাছে। রামপ্রসাদ প্রায়ই তাকে ছুতোনাতা কোরে বিদেয় করে। আসল কথা এড়িয়ে চলে।

একদিন বিরক্ত হোয়ে আস্‌ফাক বললো "কহিয়ে তো পণ্ডিতজী! ইয়ে দেশ কেয়া সিফ্‌ হিন্দুয়োঁকো দেশ হ্যায়—না ইয়ে হিন্দু মুসলমান দুনোকো?"

রামপ্রসাদ আসফাকের অন্তরের উত্তাপ অনুভব করলেন। এই উত্তাপের স্পর্শে রামপ্রসাদের মনের সংশয়,— সংস্কার, বাধা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। আকৃষ্ট হলেন তিনি যুবকটির প্রতি। হাসিমুখে বললেন তিনি, "ইয়ে দেশ হিন্দুয়োঁকো নেহি, মুসলমানোকো ভি নেহি, ইয়ে হ্যায় হিন্দুস্থানকে রহনেওয়ালে হিন্দুস্থানীয়োকো দেশ। ইয়ে দেশ হ্যায় তুম্‌হাবা, সব কোইকো। ইসকী সেবামে সব কোইকো অধিকার বরাব্বর হ্যায়।" আসফাককে দলে নেয়া হল।

হৃষ্টচিত্তে আসফাক ফিবে এল নিজ গৃহে। তার মনের খুশী আর ধরে না। কাঙ্গালেব মর্মজোড়া আকাঙ্খার সামনে যেন প্রচুর বিত্ত এসে জুটেছে,—চিত্ত সন্তোষে ভবে উঠেছে কাণায় কাণায়।

এরপর থেকেই সুরু হল আসফাকের বিপ্লবী জীবন। কাজ—কাজ—কেবল কাজ করে যায় সে। কিছুতেই যেন তৃপ্তি নেই। কোনদিন খাওয়া হয়—কোনদিন হয় না। কোন দিন ষাট, সত্তর, আশী মাইল সাইকেল চালায়,— দুর দুরান্তরে বহন করে বিপ্লবের বাণী। তবুও যেন তার তৃপ্তি নেই,—তার মন চায় কাজের চাপে পিষে মরতে।

আসফাক ছিল প্রকৃত মুসলমান। কোরাণেব প্রতি ছিল তার অসীম ভক্তি। কোরাণের পবিত্র বাণী ছিল তার কণ্ঠস্থ। সে প্রায়ই বলত, "যে প্রকৃত মুসলমান, সে পরাধীনতা সহ্য করতে পারে না। সঙ্কীর্ণ হৃদয় হতে পারে না।"

তাই দেশ মুক্তির আন্দোলনে মুসলমান সমাজের আপেক্ষিক নিষ্ক্রিয়তা তার মনে ব্যথা দিত। কিন্তু কাজের আকুলতা আর গুরু রামপ্রসাদের প্রতি অগাধ ভালবাসা তার মনেব সব শূন্য কোণগুলি পূর্ণ করেছিল। বামপ্রসাদ আব তাব কাছে পণ্ডিতজী নয়—হয়ে গেছে শুধুমাত্র "রাম।"

মন যতই দুর্বার হোক—দেহেরও একটা দাবী আছে। কিন্তু বৈপ্লবিক দেশ কর্মীরা কতকটা অভাবে কতকটা প্রয়োজনের তাগিদে

এই দাবী উপেক্ষা করেই চলে। রোদ, বৃষ্টি, আহার, নিদ্রা উপেক্ষা করে চলার তাগিদেই চলতে থাকে তারা। অকস্মাৎ কল যায় বিগড়ে। তখন আসে আক্ষেপ, আসে ক্রোধ নিজের অক্ষম দেহটার ওপরে। মনের সাথে তাল রেখে চলতে পারে না এই জড়ভরত দেহটা –যাক্-যাক্—এটা শেষ হয়ে! থাক শুধু আদর্শের অমিতবীর্য —সঙ্কল্পের অশরীরী রূপ।

দেহের ওপর নিয়ত অত্যাচারে আসফাকের দেহ পীড়িত হল। অচল হয়ে শয্যা গ্রহণ করল সে। জ্ঞান লোপ পায় মাঝে মাঝে। কিন্তু তার অবচেতন মানসে কর্মের প্রবাহ ছিল অব্যাহত। তাই বিকারের ঝোঁকে বকেই চলেছে 'রাম' 'রাম'।

আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু-বান্ধব শঙ্কিত হলেন। মুসলমানের ছেলে অচৈতন্য অবস্থায় জপ করে রাম রাম! এ যে বিষম কাণ্ড! নিশ্চয় রাম জিন বা রাম-দানাতে ধরেছে !!

মোল্লা এল, মৌলবী এল, চারিদিক থেকে,—ওঝা এল জিনের প্রভাব থেকে আসফাককে বাঁচানোর জন্যে। চলল ঝাড়া, ফুক, তাবিজ, কবচ, জলপড়া। যতবারই আসফাক বলে 'রাম' ততবারই তার কাণের কাছে মুখ নিয়ে শোনানো হয় 'আল্লা' 'আল্লা।'

আসফাকের অসুখের খবর পেয়ে একজন সহকর্মী তাকে দেখতে এসে এই অবস্থা দেখে তাড়াতাড়ি খবর দিল রামপ্রসাদকে। রামপ্রসাদ এসেই দেখলেন আসফাক বিকারের ঘোরে বকছে "রাম" আর তার কানে শোনানো হচ্ছে আল্লা, আল্লা। রামপ্রসাদ তৎক্ষণাৎ আসফাকের মাথাটি কোলে তুলে নিয়ে সস্নেহে মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন। মন্ত্রের কাজ করল এই স্নেহস্পর্শ। আসফাক শান্ত হল। সেই মুহূর্ত্ত থেকেই তার রোগের গতি চলল ভালোর দিকে।

যুক্ত প্রদেশে বৈপ্লবিক সংস্থা পুনর্গঠনের ভার নিয়ে বাংলা থেকে যোগেশ চ্যাটার্জি এসেছেন। প্রদেশের দায়িত্ব তিনি অর্পণ করেছেন পণ্ডিত রামপ্রসাদের হাতে। আসফাক তাঁর প্রধান সহকারী।

একদিন তিনি আসফাককে ডেকে বল্লেন, "টাকা চাই। টাকার অভাবে সব কাজ শেষ হতে বসেছে। আমি ঠিক করেছি ট্রেন থেকে সরকারী টাকা লুটতে হবে।"

আসফাক একটু ভেবে নিয়ে বললে—"ওতে তো বিপদ ডেকে আনা হবে। আর ডাকাতি –মনটা কেমন করে যেন।" রামপ্রসাদ বল্লেন, "নীতির প্রশ্ন একদম ঝুটা। নীতির দিক দিয়ে কোন কিছুতেই বিপ্লবীব আটকায় না যদি তা অগ্রগতির সহায় হয়। আর ডাকাতি না করে করিই বা কি! অর্গানিজেশন চালাতে হলে টাকা চাই।"

আসফাক আর আপত্তি করলে না। হেসে গান ধরল—

"তুঝসে ম্যয়নে দিল কো লাগায়া—
যো কুছ হ্যয় সো তুহি হ্যয়
বহুৎ সমায়কে তুঝকো পায়া
যো কুছ হ্যয় রাম! তুহি হ্যয়।"

রামপ্রসাদ নিজের দুই বাহু আসফাকের স্কন্ধে রেখে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন তার মুখ পানে, তারপব ধীরে ধীরে তাকে বুকে টেনে নিয়ে খুব মৃদুস্বরে বললেন, "আসফাক! আসফাক! তু হামারা জনম্ জনম্‌কে ভাই—মেরা জনম্ জনম্‌কে ভাই –"

শিহরিত হল আসফাকের সর্বদেহ। চোখে এল জল—মুখে সরলোনা কোন কথা—শুধু অস্পষ্ট, জড়িতভাবে উচ্চারিত হোল "রাম—রাম"

১৯২৫ সালের ৯ই আগস্ট। রাত্রি প্রায় ১টা। লক্ষ্ণৌ শাহারাণপুর লাইনে একখানি প্যাসেঞ্জার ট্রেন কাকোরী ষ্টেশন থেকে পূর্ণ বেগে অগ্রসর হচ্ছে আলমনগরের দিকে। হঠাৎ তার গতি গেল থেমে। কে যেন শেকল টেনে ট্রেণ দিয়েছে থামিয়ে। সাথে সাথেই দশ বারটি যুবক গাড়ী থেকে নেমে পড়ল নীচে। তাদের দেখাদেখি

অনেক যাত্রীও নেমেছে—গার্ড সাহেবও নীচে নেমে হাতে আলো নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন কিছুটা। একজন যুবক তাঁর কাছে গিয়ে আদেশের স্বরে বলল—"ঠাহর যাও।" তারপর চীৎকার করে বলল—"যাত্রী ভাইয়োঁ—আপ্‌লোগ আপন্‌ আপন কামরেমে উঠ যাইয়ে। হামসব সরকারী খাজানা লুটেঙ্গে—ইয়ে নেহি—মাংতেঁহে কিসিকো জানসে নোকসান পৌছে।" ভীত ত্রস্ত যাত্রীদল উঠে পড়ল আপন আপন কামরায়। গার্ড সাহেবও যাবার উদ্যোগ করছিলেন। কিন্তু যুবকটি তাঁকে আদেশের স্বরে বলল—"তুম ঠাহরো দোস্ত।" গার্ড সাহেব দেখলেন যুবকের হাতে পিস্তল চক চক কর্চ্ছে। বসে পড়লেন তিনি মাটিতে।

ক্ষিপ্রতাব সাথে যুবকদল মেইল ভ্যানেব লোহাব সিন্দুক ভেঙ্গে টাকার থলে আর মেল ব্যাগ থেকে ইনসিয়োরগুলি নিয়ে অন্ধকারের আবরণে উধাও হল।

এই য়্যাকশনের অধিনায়ক ছিলেন রামপ্রসাদ—আব তাঁব প্রধান সহকারী আসফাকউল্লা।

সুরু হয়ে গেল খানাতল্লাস ও ধবপাকড়। যুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, বাংলা তিনটি প্রদেশ জুড়ে আবিষ্কৃত হল ষড়যন্ত্রের সূত্র। রামপ্রসাদ আর তাঁর সাথে আরও প্রায় চল্লিশ জন গ্রেপ্তার হোল বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দিনে। পুলিশ কিন্তু আসফাকের সন্ধান পেলনা—তার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেব হল। সুরু হল আসফাকের ফেরারী জীবন। এর পর থেকে কখনো ফেরিওয়ালা, কখনো শিখ, কখনো কাবুলি, কখনো বাঙ্গালীর বেশে সে ঘুরে বেড়িয়েছে দেশে দেশে।

১৯২৬ সালের প্রথমভাগে বাংলাদেশের জনৈক ফেরারী বিপ্লবীর সাথে আসফাক এসে হাজির হল ঢাকা শহরের রাজারদেউড়ীতে দলের সভ্য সুধীর সরকারের বাসায়। সুধীব জানে উভয়েই বাঙ্গালী। আসফাককে জানে সে বীরেন নামে। বীরেনবাবু বেশ বাংলা বলে যান—কিন্তু মাঝে মাঝে কথার ফাঁকে ফাঁকে বেরিয়ে পড়ে হিন্দুস্থানী

টান। অবাক হয়ে সুধীর তাকায় তাঁর মুখের দিকে। বীরেনবাবু নিজের গলদ বুঝতে পেরে বলেন—"পশ্চিমে থাকতে থাকতে একদম পশ্চিমা বনে গেছি।"

বিপ্লব দলে তখন ভাটার টান। বেঙ্গল অর্ডিনান্সে উজাড় করে ধরেছে বিপ্লবীদের। গুটিকয় মাত্র বিশিষ্ট কর্মী ফেরারী হয়ে কোনও ক্রমে সংস্থা বজায় রেখেছে। এই সময় বীরেন প্রায়ই বৈদেশিক সাহায্যের কথা আলোচনা করত। তার মনে নিশ্চিত ধারণা জন্মেছিল বিদেশের সাহায্য ছাড়া অস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহ সম্ভব নয়। আইরিশ বিপ্লবীরা জার্মানি থেকে অস্ত্র আর আমেরিকা প্রবাসী আইরিশদের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য পেয়েছে এই তথ্য তার মনে গভীর ভাবে দাগ কেটে দিয়েছে। বিদেশে যাবার উদ্দেশ্যেই সে বাংলার সহকর্মীদের কাছ থেকে বিদায় নিল। উপস্থিত হ'ল দিল্লীতে। আফগান দূতাবাসের সাথে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টায় সে ব্রতী হল। এই অবস্থায় সে ধৃত হয়। পুলিশ বিচারেব জন্য তাকে নিয়ে এল লক্ষ্ণৌ জেলে।

লক্ষ্ণৌ জেলার পুলিশ সাহেব ছিলেন মুসলমান। একদিন তিনি নির্জনে সাক্ষাত করলেন আসফাকের সাথে। বললেন—"আমিও মুসলমান। কেন তুমি হিন্দু রামপ্রসাদের তাঁবেদারী করে নিজের জীবন নষ্ট করছো? রামপ্রসাদের দল ইংরাজের রাজত্ব ধ্বংস করতে চায় হিন্দু-রাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে। তুমি কেন তার পিছে পিছে ঘোরো? সর্বদাই মনে রেখ—সে কাফের—সে হিন্দু।"

আসফাক ঈষৎ হেসে বলল্—"ভুল বুঝেছেন খাঁ সাহেব—ভুল বুঝেছেন আপনি। রামপ্রসাদ হিন্দু নয়—হিন্দুস্থানী। তারা চায়না হিন্দুর স্বাধীনতা—চায় হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা। আপনি তো মুসলমান। আপনি কি জানেন না ইসলাম পরাধীনতা স্বীকার করে না। যে করে,—সে মুসলমান নয়,—কাফের—বেইমান। আমি সাচ্চা মুসলমান। তাই চাই ইংরাজ রাজত্বের অবসান। ফলে যদি

হয় হিন্দু-রাজ, হিন্দুস্থানীর রাজ কায়েম না হয়-- তখন আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তারও বিরুদ্ধে লড়বো।"

ব্যর্থ হয়ে খাঁ সাহেব ফিরে গেলেন।

বিচারে আসফাকের ফাঁসির হুকুম হল। ফৈজাবাদ জেলে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন গুন্‌ছে সে। নামাজ, রোজা, আর কোরাণ পাঠে দিন কাটায়। তার দেহ ক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসে কিন্তু মুখমণ্ডলে দেখা দেয় গাঢ় প্রশান্তি—অনির্বচনীয় জ্যোতি। তার সাথে দেখা করতে এক জন আত্মীয় এসেছেন। আসফাকের শীর্ণ দেহ দেখেই তাঁর চক্ষু সজল হয়ে এল। আসফাক সান্ত্বনাব স্বরে বলল—"ভেবেছেন আমি মরতে ভয় পেয়েছি,—তাই শুকিয়ে যাচ্ছি? সেটা ঠিক নয়। কয়েকদিন পরেই আমি যাব পরম পবিত্র খোদাতালার কাছে। ময়লা মাটি মনে নিয়ে তাঁর কাছে তো যাবার উপায় নেই। তাই রোজা আর নামাজে দিন কাটাই। বেশী খেলে খোদার ধ্যানে বাধা জন্মে।" মোলাকাৎ অন্তে চোখ মুছতে মুছতে আত্মীয়টি ফিরে গেলেন ঘরে।

আসফাক ছিল কবি—ভাবুক। মৃত্যুর মোহনীয় বেশ সে চোখ ভরে দেখে নিয়েছিল। উর্দুতে সে একটি কবিতা লিখেছিল মৃত্যুর আগে। তার অর্থ—

"জন্ম হইলে মৃত্যুও ঠিক আছে,—
প্রকৃতির এই অমোঘ নিয়মে ভয় কি কখনও সাজে?
এই দুনিয়ার রয়না তো কিছু
সব ধায় খোদা পানে—
ফৈজাবাদ ছাড়িয়া চলেছি
আমিও তাঁহারি টানে।"

ফাঁসির আগের দিন আসফাক বেশ ভাল করে স্নান সেরে সেজে গুজে এক বন্ধুর সাথে দেখা করল। তাকে হেসে বলল—"কাল আমার বিয়ে।" হাসিমুখেই ফিরে এল নির্জন কক্ষে। সারারাত নামাজ আর কোরাণ পাঠ করে কাটিয়ে দিল সে। অতি প্রত্যুষে

নীত হল বধ্য ভূমিতে। ধীরে ধীরে আরোহন করল ফাঁসির মঞ্চে। তারপর স্থির অকম্পিত কণ্ঠে বলল সে— 'ভাই সব। আমি আজ খোদার পাশে যাচ্ছি। আমি চেয়েছিলাম ভারতের স্বাধীনতা। কিন্তু বিদেশীরাজের বিদেশী বিচারক রায় দিয়েছেন, আমরা দস্যু—আমরা নরহন্তা। আজ জিজ্ঞাসা করি জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র নর-নারীকে যখন নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে তখন এই সব বিচারক কোথায় ছিলেন? তাঁদের বিচারে কি ভারতবাসীকে হত্যা, হত্যা নয়? হিন্দু মুসলমান ভাই সব ওঠো। জাগো। বোঝো। হাতে হাত মিলিয়ে স্বাধীনতার যুদ্ধে অগ্রসর হও। আজ বিচারক, পুলিশ কারো প্রতিই আমার মনে বিদ্বেষ নেই। বরং তাদের প্রতি আমার হৃদয়ের প্রীতি উছলে পড়ছে। শুধু এই জন্যে যে তাঁরা আমাকে দেশের জন্য মরার সুযোগ দিয়েছেন। উমিচাঁদ, জগৎ শেঠ, রায়দুর্লভ প্রভৃতি হিন্দুর বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত এ দেশের হিন্দু ভাইরা প্রাণ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। নন্দকুমার, নানাসাহেব, রাণী লক্ষ্মীবাই, কুমার সিং থেকে সুরু করে ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, কানাইলাল, আমীরচাঁদ, আউধ বিহারী, বসন্ত, বালমুকুন্দ, কর্তার সিং আরও শত শত হিন্দু ভাই পূর্বপুরুষের বিশ্বাসঘাতকতার কলঙ্কের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন নিজেদের প্রাণ দিয়ে। কিন্তু মিরজাফর,— মীরন, ইয়ার-লতিফ আরও শত শত মুসলমানের পাপের প্রায়শ্চিত্ত? ভারতের মুসলমানরা এই প্রায়শ্চিত্ত করেননি দেখে আমার প্রাণ কেঁদে ওঠে। তাই আমি করছি এই প্রায়শ্চিত্ত। বন্দেমাতরম্—আল্লাহো আকবর। ভাই রামপ্রসাদ। তোমাকে আমি এগিয়ে যেতে দেবনা --ভারতের মুসলমান পিছিয়ে থাকবে না —মুসলমান সমাজের পক্ষ থেকে আমি কর্চ্ছি এই প্রায়শ্চিত্ত।"

তারপর ফাঁসির রজ্জুতে স্তব্ধ হল কণ্ঠস্বর—শুধু কারাগারের প্রাচীরে প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল অশরীরী বাণী প্রায়শ্চিত্ত—প্রায়শ্চিত্ত!

সিঁড়ি

১৯২৩ সালের গোড়ার দিকে ফরিদপুর শহরে একটি যুবক এসে হাজির হল। নাম তার সুবোধ রায়,—অন্ততঃ সকলে তাকে সেই নামেই জানত। যুবকটি বড্ড গরীব—লেখাপড়া বিশেষ হয়নি। তাই শ্রীরমেশ দাসগুপ্তের তাঁতের কারখানাতে ভর্তি হয়েছে তাঁত বোনা শিখতে। সারাদিন সকলেব ফবমাইস খাটে আব ঠক-ঠকি চালায় 'খট খট'। কারখানায় যিনি কাপড় বোনানো শেখান তিনি দেখলেন ছেলেটি বুনতেও জানে না--শেখারও আগ্রহ নেই। সুতরাং সে যতটা ধমক ও গাল খেত ততটা খেতে পেত না। অপমানে, লাঞ্ছনায় অতিষ্ঠ হয়ে ছেলেটি যেন কোথায় চলে গেল। কয়েকদিন তাব পাত্তাই পাওয়া গেল না।

অবশেষে পাত্তা সে নিজেই দিল। একতাড়া ছাপা ক্যাশমেমো নিয়ে সে কারখানায় একদিন এসে হাজির হল। কারখানার ম্যানেজার মনীন্দ্র বাবুর কাছে গিয়ে বলল—"নিন আপনাদের ক্যাশমেমো—এইবার বিলের টাকাটা দিয়ে দিন্।"

তার কাছেই সকলে জানল যে সে ছাপাখানায় চাকরী পেয়েছে। সকাল বেলায় মালিকের ছুটি ছেলে মেয়েকে পড়ায়,—ছুপুরে ছাপাখানার কাজ করে। বেতন কুড়ি টাকা,—তবে মালিকের বাড়ীতেই খায়। গরীব মানুষ,—বড় জোর বরাতেই চাকরীটা মিলে গিয়েছে।

সন্ধ্যা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত ছেলেটার পাত্তা পাওয়া যায় না,—ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়ায় এখানে সেখানে। কোন কোন দিন রাত এগারটা পর্যন্ত বাইরে থাকে—হয়তো খাওয়াই হয়না। কারণ বাড়ীতে সকলে তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। প্রভাতে তার উপোসী খালি পেট ভরে বকুনিতে। স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধেও বাড়ীর কেউ কেউ সন্দেহ

প্রকাশ করে। ছাপাখানার কেউ কেউ রহস্য করে বলেও সে কথা তার সম্মুখে,—সে শুধু হাসে। কোন উত্তর দেয়না।

ছাপাখানার বাবুর এক ছেলে প্রুফ দেখত। কি যেন কাজে তিনি কলকাতায় গিয়েছেন, ৭।৮ দিন পরে ফিরবেন। ঠিক সেই সময় চট্টগ্রামের এক স্কুলের প্রশ্ন পত্র এসে হাজির। দশদিনের মধ্যেই দিতে হবে। পালি'র প্রশ্নপত্রও আছে এব মধ্যে। প্রেসের মালিক মজুমদার মহাশয়েব মাথা ঘুরে গেল। সুবোধকে ডেকে তিনি বললেন—"বড়ই মুস্কিলে পড়া গেছে। তুমি যদি কিছুটা সাহায্য কবতে পারতে খুব ভাল হত। ইংরাজী কিছুটা জানতো তুমি?"

সুবোধ বললে—"ভাল জানিনে। তবে দিন—চেষ্টা করে দেখি।"

সুবোধের প্রুফ কবেকশন দেখে প্রেসের ম্যানেজাব চমৎকৃত হল। একেবাবে নিখুঁত,—মায় স্পেস দেওয়া পর্যন্ত। খুব খুশী হয়ে সে মালিককে দেখাল। বলল—"এমন সুন্দর করেকশন ছোটবাবুব হাতেও হয় না।"

মজুমদার মশায় খুশী হলেন। কিন্তু সাথে সাথেই সুবোধেব কাজ বেড়ে গেল। অবশ্য বেতনও কুড়ি থেকে ত্রিশ টাকা হল।

কয়েকদিন পরে মজুমদাব-প্রেস থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি পদ্য সুবোধ দিল মজুমদাব মশায়ের হাতে। পদ্যটা "আগমনী"। তাতে উত্তর বঙ্গের বন্যার কথা ছিল,—আর ছিল অবিচারে আটক বাখার কথা। পদ্যটির কয়েক লাইন এইরূপ—

'মাগো! বিক্তৃতাব তিক্ততার সনে ক্লান্তিহীন করিয়া সমর,
জীবনের দীপ ভাতিহীন, সমাচ্ছন্ন ব্যথায় অন্তর।
পলে পলে, দিনে দিনে, বর্ষব্যাপী ডাকি তাই তোরে—
এস মাগো আনন্দরূপিনি! বর্ষ পরে শরতের ভোরে।
ভুলে যাই দুঃখ, অপমান, অদৃষ্টের নিয়ত আঘাত,
আসিতেছে স্নেহময়ী মাতা ঘোষে যবে শরৎ প্রভাত।

হাসি, গাই, নাচি সবে আত্মহাবা-পুলকে বিহ্বল,
জয় দুর্গে দুর্গতিনাশিনী! ভক্তি-অর্ঘ্যে তুলি উচ্চরোল।
কিন্তু আজি উত্তর বঙ্গেতে উঠে ঐ দীন আর্তনাদ,
জননী কি সন্তানের তরে আনিয়াছে দুর্ভাগ্য, প্রমাদ?"

তাতে আরও ছিল—

"আরো যারা তোমারি সন্তান নির্বিচারে গেল কারাগারে,
এক ফোঁটা তপ্ত আঁখিজল আনিবি কি তাহাদেরও তরে?"

মজুমদার মশাই বললেন—"একদম বাজে কবিতা। ও আমার কাগজে চলবে না। আমি নীলাম ইস্তাহার ছাপি, বেশ দু'পয়সা পাই তা'তে সরকার থেকে। এই সব বাজে কবিতার জন্যে সেই আয়টা নষ্ট করতে পারি না।"

সুবোধ ক্ষুণ্ণ হ'ল। কিন্তু কাগজ যখন বের হ'ল তখন দেখে বিস্মিত হ'ল যে কবিতাটি ছাপানো হয়েছে। সুবোধকে ডেকে মজুমদার মশায় বললেন—"কাগজের ভার তুমিই নাও। তোমার বেতন পঞ্চাশ টাকা করে দেওয়া গেল।"

এরই মধ্যে একটা কাণ্ড ঘটে গেল। সকলের সাথে খেয়ে দেয়ে সুবোধ নিজের ঘরে শুয়েছে। কিন্তু কি একটা কাজে রাত এগারটার সময় ডাকতে গিয়ে দেখা গেল সুবোধ ঘরে নেই। সেদিন বৃষ্টি হচ্ছিল। দুর্যোগের রাত্রিতে সে ঘরে থাকবেনা এটা নিতান্তই অস্বাভাবিক। মজুমদার মশায়ের ধারণা হ'ল ছেলেটির স্বভাব চরিত্র বিগড়ে গেছে। তিনি ঠিক করলেন তাড়িয়ে দেবেন। কিন্তু পরদিন প্রাতে খোঁজ নিয়ে জানলেন সুবোধের প্রবল জ্বর এবং সে আবোল তাবোল বকছে। মজুমদার মশায় তার দোরের পাশে দাঁড়িয়ে শুনলেন সুবোধ বলছে—"নরেনদা! কেমন মজা! ক্ষিদের জ্বালায় জাম খেতে হ'ল? আমি খাই—জামরুল। ওঃ জানেন না বুঝি আমার জন্য মাত্র পনর টাকা রেখে সব টাকা পাঠিয়ে দিই বরিশালের কাজ চালানোর জন্যে। যদি মরি? দুঃখ নাই—দুঃখ নাই—

"Blessed are those who shall live
The days of the glory to see—
But the next dearest blessing on earth
Is the pride of thus dying for thee"—

মজুমদার মশায় এবারে নিশ্চিত বুঝলেন ছেলেটি বিপ্লবী,—আর বেশ শিক্ষিত। শঙ্কিত হ'লেন তিনি। একে সত্বরেই বিদেয় করতে হবে। তবে দুশ্চরিত্র বলে নয়, বিপ্লবী বলে।

কিন্তু তার আর প্রয়োজন হ'ল না। জ্বরের বেগ কমে এলে প্রেস-ম্যানেজার সুবোধকে বলল—"আপনি জ্বরের মধ্যে বার বার 'নরেনদা' 'নরেনদা' করছিলেন। কে তিনি?"

"কৈ—কিছু মনে হচ্ছেনা তো!" সুবোধ বললে। কিন্তু সেদিন রাতের পরে আর কেউ সুবোধ রায়কে ফরিদপুরে দেখতে পায়নি।

সুবোধ ফরিদপুর থেকে রাতারাতি কলকাতায় পাড়ি দিল। সেখানে গিয়ে রমেশদা, (আচার্য্য) আর কেদারদা'র সাথে দেখা করল সে। রমেশদা বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় "যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর" দণ্ডের স্থলে দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগের পর মুক্ত হয়েছেন। আর কেদারদা সশ্রম কারাদণ্ড ভোগের পর রাজবন্দী হন। সকলের সাথে মুক্ত হয়েছেন। রমেশদা'র সাথে দুইদিন ঘুরেই সুবোধের ধারণা হ'ল পায়ে তাঁর ক্ষুর বাঁধা আছে। শ্যামবাজার থেকে ভবানী-পুর, বালিগঞ্জ অবলীলাক্রমে অনবরত হেঁটে মেরে দিচ্ছেন। তাও আবার হাঁটা নয় রীতিমত দৌড়! জনবহুল ফুটপাথে ও পথে প্রায়ই ঠোকা-ঠুকি হয় এর ওর সাথে। রমেশদা সঙ্গে সঙ্গেই দু'হাত তুলে নমস্কার করেন আর বলেন—"পী-পী-পী-প্লীজ এক্সিউজ।" তাড়াতাড়িতে তোৎলামি বেড়ে যায় তাঁর। কিন্তু ঠোকা-ঠুকির পর নমস্কার আর ক্ষমা প্রার্থনা তাঁর অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। আপনা হতেই এসে যায়! সুবোধ বলে—"রমেশদা! এঞ্জিন তো জোর চালিয়েছেন। কিন্তু রীতিমত ফুয়েল না যোগালে বিগড়ে যাবে।"

রমেশদা হেসে বলেন—"মনে নাই—ছ-ছ-ছুঙ্ অব্ সন্ন্যাসিন্—

"দৈব বশে তুমি যাহা কিছু পাও—
সেই খাদ্যে তুমি পরিতৃপ্ত রও।"

সুবোধ হেসে বলে—"আরও দুটি ছত্র ছিল স্বামীজির অরিজিন্যাল কপিতে,—প্রেসের দোষে ছাপা হয়নি। তা' হচ্ছে—

"পদ সঞ্চালন করিবেনা কভু—
আঁখি মুদি ধ্যান কর সদা বিভু।"

"এই ফাজিল" বলে রমেশদা তার পিঠে কীল মারেন।

বৌবাজার ষ্ট্রীটের একটি বাসায় আড্ডা। সারাদিন কারও পাত্তা পাওয়া যায় না। কে কোন কাজে বাইরে যায় ঠিক নেই। কিন্তু মাঝ রাতে বড় বড় ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মের আকার ধারণ করে ঘরগুলি। যে যেদিকে সুবিধে পেয়েছে, শুয়ে পড়েছে। একদিন রাতে তো এক বিষম কাণ্ড ঘটে গেল। একটা গোঙড়ানির শব্দে রমেশদা, সুবোধ আরও দু'এক জনের ঘুম ভেঙ্গে গেল। আঁধার ঘরে ব্যাপারটা ঠিক বোঝা গেল না। রমেশদা হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে সুইচের সন্ধান করে আলো জ্বাললেন। তখন দেখা গেল পালংএর বিশালকায় রাইহরণ সেনের স্তম্ভাকৃতি পদযুগল অস্থিসর্বস্ব ক্ষীণকায় কেদারদা'র বুক ও পেটের ওপর বিরাজ কর্চ্ছে—কেদারদা'র নড়া-চড়া নেই—শুধু গোঁ গোঁ কর্চ্ছেন। সুবোধ হা-হা করে হেসে উঠল। রমেশদা বললেন—"ক্ষী-ক্ষীণকায় বসুদেবের বুক থেকে আগে পাথর নামাও—তারপর হেসো।"

ব্যাপারটা হাসির হলেও গুরুতর। রাইহরণ বাবুর পা' দুটো ধরে টানতে গেলে যদি তিনি ঘুমের ঘোরে পা' ছোড়েন তাহলে বেচারী কেদারদা'র ভবলীলা সাঙ্গ হবে এবং Rescue Party-র দু'চারজন ছিটকে পড়বে অপর দশজনের মুখ, বুক, পেট, পা, পাশ বা পিঠ থেঁতো করে। সময়ও নষ্ট করা চলেনা। ক্ষীণ-প্রাণ কেদারদা'র প্রাণের পক্ষে প্রতি মিনিট মূল্যবান। সুতরাং যথা সম্ভব ক্ষিপ্রতাব

সাথে কাজ করতে হবে,—কিন্তু একটা definite plan নিয়ে। সুবোধ বললে—"আমি মেকানিক্‌সেব ছাত্র ছিলাম,—পুলী সিস্টেম জানি কিছু কিছু। আমিই ব্যবস্থা কর্চ্ছি।"

এই বলে সে রাইহরণ বাবুর দুই পায়ে একখানি ধুতিব দুই মুড়ো বেঁধে জানালার ভিতর দিয়ে গলিয়ে ধুতির মধ্যাংশ বেব কবে দিল। দু'জনকে বলল—"আপনারা দু'খানা পাখা নিয়ে প্রস্তুত থাকবেন—আর আমি ওয়ান, টু, থি বলার সাথে সাথেই দুপাশ থেকে 'প্রাণহরণ' বাবুকে আক্রমণ করবেন। আমি আর রমেশদা এক সাথে দড়িতে লাগাব টান্।"

তাই কবা হলো। আচমকা টানে বাইহরণ বাবুর পা দু'টো উঠে পল শূন্যে আব পাখাব ডাঁটেব গুঁতো খেয়ে তিনি জেগে উঠে বসার চেষ্টা কবতে লাগলেন। কিন্তু ততক্ষণে তাঁব পা দু'টো অনেকটা শূন্যে উঠে গেছে। তিনি ব্যর্থকাম হয়ে তর্জন গর্জন সুরু করে দিলেন। তাঁর হুঙ্কারে ঘরেব সকলেই জেগে উঠল। ব্যাপার দেখে একটা বিরাট হাসিব ধুম পড়ে গেল। কেদারদা উঠে বললেন—"আপনাগো ছেলে-মানুষি এখনও যায় নাই।"

"হা হতোস্মি" বলে সুবোধ ঘরে ঢুকে পড়ে বসে পল। বলল—"দেখলেন তো রমেশদা! একেই বলে 'যার জন্যে করি চুবি সেই বলে চোর।' এই ছেলেমানুষি না করলে যে এতক্ষণ ওঁর দেহ যেত Post Mortem Examination-এর জন্যে, আর আমাদেব সকলকে হয় সাক্ষী নয় আসামী হতে হত সে খেয়ালই নাই কেদারদার। এই জন্যেই শাস্ত্রে আছে 'দো-পেয়ের হিত করোনা।"

সে রাত্রি আর কারো ঘুম হলোনা। পরদিন সুবোধ কেদারদা'কে বলল—"কেদারদা! আপনি একটু চেঞ্জে যেতে পারেন? এই শরীর,— "

বাধা দিয়ে কেদারদা বললেন—"শরীর খারাপ কি দেখলে?"

সুবোধ হেসে উত্তর দিল—"নাঃ—তেমন আর খারাপ কি। তবে

ভয় হয় কবে মেডিকেল কলেজের ছেলেবা আপনাকে না জানি কলেজে বয়ে নিয়ে যায়! আর তাদের পৃথক পৃথক অঙ্গের হাড় কেনা দরকার হবেনা। এক সাথে গোটা স্কেলিটন্ পাবে কিনা!"

কেদারদা বললেন—"চেঞ্জে তো যাবো! কিন্তু টাকা—টাকা কৈ?"

'কেন? আপনি তো শুনেছি তুলোর কণ্ট্রাক্ট ব্যবসায়ে মাসে প্রায় হাজার টাকা উপায় করেন।"

"আরে সেই টাকাই আজ পার্টির বড় সম্বল। আমি তা নিজের জন্য ব্যয় করি আর তোমরা পুনরায় ডাকাতি সুরু কর,- না? মনটা বুঝি খুব উস্ খুস্ কচ্ছে?"

"তা' একরকম মন্দ ছিল না। এ নিরামিষ আয়োজন ভাল লাগেনা এই জন্যেই তো ছেলে মহলে বিদ্রোহের ভাব জমাট বাঁধছে।" সুবোধ বললে।

কেদারদা সুবোধের দিকে খানিকটা চেয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে আবৃত্তি করলেন ববীন্দ্রনাথেব কবিতার কয়েকটি ছত্র—

"হায় সে কি সুখ এ গহন ত্যজি হাতে লয়ে জয়তুরী
জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে, বাজ্য ও রাজা ভাঙ্গিতে গড়িতে
অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি।
থাক্ ভাই থাক্, কেন এ স্বপন—এখনো সময় নয়,
এখনো একাকী দীর্ঘ রজনী জাগিতে হইবে পল গণি গণি
অনিমেষ চোখে, পূর্ব গগনে হেরিতে অরুণোদয়।"

তারপর একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন—"আমেরিকার মুক্তিযুদ্ধে সেনাপতি ওয়াশিংটন সৈন্যসামন্ত নিয়ে ক্রমশঃই যুদ্ধ এড়িয়ে হটে আস্‌ছেন! সহকারী সেনাপতি জেনারেল ওয়ার্ড দুঃখে ক্ষোভে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁকে "সেনাপতি! কাপুরুষের মত আর কতকাল আমরা এভাবে পালাব?" ওয়াশিংটন স্মিতহাস্যে উত্তর করলেন—"I shall retreat and retreat till I understand that my

army is prepared to give a fight to the enemy." আমরা যদি অতীতের ব্যর্থতার অনুকরণ করে যাই, আমাদের ব্যর্থই হতে হবে। তাই মহাত্মার আন্দোলনকে আমরা জনতার বৈপ্লবিক প্রস্তুতিতে নিয়োগ করতে চেয়েছি। নীরবে আমাদের অস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে, যে সব ঘাঁটি অচল করলে সরকার অচল হবে সেগুলো আমাদের নীরবেই দখল করতে হবে—ক্ষণিক উত্তেজনায় বেফাঁস গরম কিছু করে ফেললে,— সব আয়োজন পণ্ড হবে, অকালে কুম্ভ-কর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হবে।"

এই কঙ্কালসার লোকটির প্রতি অসীম শ্রদ্ধা সুবোধের মনে। যার "শরীরং ব্যাধি মন্দিরং"—তাও আবার যে সে ব্যাধি নয়, একেবারে ব্যাধিনাম্ শিরোভূষণ যক্ষা,—তার মগজ এত ঠাণ্ডা কেমন করে থাকতে পারে, এত গভীর চিন্তা করার শক্তি তার আসে কোথা থেকে,—ভেবেই পায়না সুবোধ। এঁর মস্তিষ্ক ও হৃদয় কি জয় করেছে ব্যাধির যন্ত্রণা ?

ঢাকা থেকে পূর্ণানন্দ এসে হাজির হয়েছে। সকলে ডাকে তাকে আনন্দ বলে। আনন্দ তো আনন্দই। দিন রাত মুখে হাসি লেগেই আছে। সুবোধের সাথে ঢাকাতেই পরিচয় হয়েছিল তার। তাকে দেখেই বলল—"ফরিদপুররে শ্যায কইরা আইছাও এখানে ? অ রমেশদা, অ কেদারদা তারাইয়া গ্যান্ ইডারে।" তারপরই একগাল হাসি—হে-হে-হে-হে—

সুবোধ বলল "কোত্থেকে পাগলাচণ্ডী এসে হাজির হল এখানে ? জানিস্ এটা কেদারাশ্রম,—উন্মাদাশ্রম না ? পাগলামি করলে তাড়িয়ে দেব।"

সন্ধ্যার পর সুবোধ সাড়ম্বরে কেদার-উদ্ধার কাহিনী আনন্দকে শোনালো। হাসতে হাসতে আনন্দ বলল—"তুই তো খুব পুলী সিস্টেম ফালাইছস্! আজ হইতে তোরে ডাকুম্ 'মেকানিক' নামে।

সেদিন রাতে বিভ্রাট ঘটে গেল।

দুপুর রাতে আনন্দ এসে সুবোধকে ডাকছে—"এই মেকানিক ওঠ্—ওঠ্।"

"যাঃ—বিরক্ত করিসনে" বলে সুবোধ পাশ ফিরে শুলো।

"ওঠ—ওঠ—পুলিশ—পুলিশ"—আনন্দ আবার ধাক্কা দিল। সুবোধ উঠে বসতেই, আনন্দ বলল—"ভারী বিপদে পড়ছি। ক্ষিতীশদা'র (ব্যানার্জি) পাশে শুইছি। এমন নাসিকা গর্জন কোরত্যাছেন তিনি—যে আমি একদম ঘুমাতে পারি নাই। তুই তো ভাই মস্ত মেকানিক। কেদারদারে বাঁচাইছস এবারে বাঁচা আমারে।"

সুবোধ খানিকক্ষণ ভেবে নিল। চিন্তিতভাবে বলল—"নাসিকা গর্জন অর্থাৎ Nasal Roar—তাই কিনা? আচ্ছা দেখি।" ঘরের কোণে ষ্টোভটি ছিল। সুবোধ তা থেকে "silencer"টি নিয়ে যথাসম্ভব দূর থেকে হাত বাড়িয়ে ক্ষিতীশদা'র গভীর গর্জনরত নাসিকার ওপর স্থাপন করতেই তিনি তড়াক্ করে উঠে বসলেন। silencerটি ঝন্ঝনিয়ে পড়ে গেল মেঝেতে। কিন্তু গর্জন গেল থেমে।

সাফল্যের গর্বে বুক ফুলিয়ে সুবোধ আনন্দকে বলল—"দেখলি? দেখলিরে বেকুব?. কেমন immediate effect! স্টোভের roaring থেমে যায় silencer দিলে,—আর নাকের roaring থামবে না!"

ক্ষিতিশদা এবার ব্যাপার বুঝে সকলের সাথে হাসিতে যোগ দিলেন।

পাঁচ ছয় দিন পরে আনন্দের সাথে সুবোধ চলে এল ঢাকায়। সেখানে গিয়েই সে বুঝতে পারল কেন কেদারদা রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করেছেন। নরেনদা আর প্রতুলদা (গাঙ্গুলী) তাকে ধীরে ধীরে বুঝিয়ে দিলেন জনতার কোলাহলের অন্তরালে কিভাবে বিপ্লবের প্রস্তুতি চলেছে। প্রতুলদার সাথে একটি বাসায় গিয়ে সে দেখল পাঁচ ছয়জন যুবক একজন লোকের তত্ত্বাবধানে বোমা তৈরী করছে। তত্ত্বাবধায়ককে দেখিয়ে প্রতুলদা বললেন—"বিদেশ থেকে এসেছেন।

খুব Expert। আমাদের এমনভাবে প্রস্তুত হতে হবে যাতে পরবর্তী গণ-আন্দোলনকে আমরা বৈপ্লবিক রূপ দিতে পারি।"

সুবোধ টের পেল বিখ্যাত বিপ্লবী অবনী মুখার্জি রুশ দেশ থেকে এসে লুকিয়ে আছেন ঢাকায়। আনন্দের সাথে এক বাসায় গিয়ে সুবোধ দেখল সেখানে মহারাজ আছেন—আর আছেন অতি পরিচিত পুরাতন বন্ধু দাস্তুদা (প্রবোধ দাসগুপ্ত) এবং শচীন চক্রবর্তী। মহারাজ ওঁদের নিয়ে কারেন্সী কারখানা খুলে দিয়েছেন। দশ টাকা ও একশো টাকার নোট জাল হচ্ছে। মহারাজের পদধূলি নিয়ে সুবোধ হেসে বলল—"বেশ হয়েছে! ডাকাত হয়েছে জালিয়াৎ! Criminal instinct যাবে কোথা থেকে—তা যতই মহাত্মার মহাপবিত্র আন্দোলন হোক না কেন! আপনাদের Criminal Tribes' Actএ ফেলা উচিত।"

দাস্তুদা বললেন—"সরকার তোমার Suggestionএর অপেক্ষা রাখেন নি। শুনেছো বিহারে রামবিনোদ, ধ্বজা, যোগেন্দ্র আরও কয়েকজনকে ঐ য়্যাক্টেই ফেলা হয়েছে। শান্তি ভাইয়া সেখানে থাকলে তার দশাও তাই হত,—সুবোধ রায় সেজে মাতব্বরি ফলানোর সুযোগ মিলত না।"

বাসায় অভাব অনটন লেগেই আছে। ছাপানো নোটগুলি প্রতিদিন নানাস্থানে চালান দেওয়া হয়। একদিন কলকাতা থেকে বিখ্যাত বিপ্লবী শচীন সান্যাল মহাশয় এসে ইউ, পি-র জন্যে দুই তাড়া নিয়ে গেলেন। এত টাকা অথচ বাসায় খরচের কিছু নেই। এ যেন "Water, water every where,—not a drop to drink." একদিন সুবোধ বললে—"মহারাজ, আজ তো কিছুই নেই খাবার। একখানা দশটাকার নোট দিননা—আজকের খরচটা চালাই।"

মহারাজ হেসে বললেন—"বাজারে কোন গরীবকে ঠকিয়ে আমরা বাঁচতে চাইনে। আমাদের সব নোট চলে যায় বড় বড় ব্যবসা

প্রতিষ্ঠানে—বড় বড় গদীতে—বড় বড় transactionএ। আর একটা কথা জান তো? হুঁশিয়ার চোর ডাকাত নিজের গ্রামে চুরি ডাকাতি করেনা। বাজার হবেনা, খেতে পাবেনা,—এই তো? তা যে দেশের লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মরে, সেই দেশের সেবকরা যে সব দিনই খেতে পাবে, এমন কথা তো হতেই পারে না। ত্তাখো—যদি কারো কাছে দু' তিন আনা পয়সা পাও তাই দিয়ে ছাতু কিনে আন। বেশ পেট ভরবে।"

চৌদ্দ বছর পরে বিমান যদি ঢাকার বাসায় উপস্থিত থাকত—সে চমকে উঠতো গড়পাড়া স্কুলের হেড্‌মাষ্টার শশীবাবুর কথা—তাঁর স্বর শুনে। শশীবাবুই যে ভোল বদলে মহারাজ হয়েছেন, এ কথা সে চোখ বুঁজেও বলে দিতে পারতো।

কলকাতার বুকের ওপর পরপর কয়েকটা ডাকাতি উপলক্ষ করে প্রবীণ বিপ্লবীদের আশঙ্কিত বিপর্য্যয় দেখা দিল। ১৯২৩ সালের মাঝামাঝি ১৮১৮ সালের তিন আইনে এক ঝাঁক বিপ্লবী নায়কদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসে সুভাষবাবু (নেতাজী), শ্রীসত্যেন মিত্র, অধ্যাপক অনিলবরণ রায় প্রমুখ বাহাত্তর জন বিশিষ্ট বিপ্লবী নায়ক ও কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হল।

নরেনদা (নরেন সেন), প্রতুলদা, রমেশদা, আশুদা, সুবোধ ১৯২৩ সাল থেকেই ফেরারী। প্রতুলদা মাঝে মাঝে রামভাঁওতা জুড়ে দিয়েছেন। পুলিশ, গোয়েন্দা বাংলা দেশের সর্বত্র তাঁকে খোঁজ করছে অথচ তিনি মাঝে মাঝেই স্বগৃহে স্বচ্ছন্দে অবস্থান পূর্বক নাসিকা বিবরে সর্ষপ তৈল দিয়া নিদ্রা যান। একজন পাকা বিপ্লবী ফেরারী যে নিজ বাড়ীতেই থাকতে পারে গোয়েন্দা প্রভুরা প্রথমতঃ ধারনায়ই আনতে পারেনি। কিন্তু সত্য স্বপ্রকাশ। আগুন থাকলেই ধোঁয়া থাকে। বোধ হয় একদিন এই ধোঁয়া দেখেই আগুনের অস্তিত্বের আবিষ্কার তারা করতে অগ্রসর হল। দুপুর বেলা। বেচারা প্রতুলদা খাওয়া

দাওয়া সেরে পার্টির একটা স্কীম তৈরী করছেন। এমন সময় য়্যাডিশনাল পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হ্যানসন সাহেব সদলবলে হানা দিলেন প্রতুলদার গৃহে। প্রতুলদা পুলিশদের অকস্মাৎ এইরূপ বুদ্ধি বিকাশের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ভেবেছিলেন তাঁর ধোকা চিরকালই ওদের বোকা বানিয়ে রাখবে। কিন্তু তা হলনা দেখে কিছুটা অপ্রতিভ হলেও তৎক্ষণাৎ সপ্রতিভের মত স্কীমটা বোনের হাতে দিয়ে ছাদের ওপর দিয়ে দৌড় দিলেন। ততক্ষণে কয়েকজন সিপাই প্রাচীর টপকে বাড়ীর ভিতর ঢুকে পড়ে দোর খুলে দিয়েছে। হ্যানসন, বসন্ত মুখার্জি প্রভৃতি গোয়েন্দা কর্তারা দৌড়ে প্রবেশ করবেন—এমন সময় প্রতুলদার মা আর বোন দুজনার জামা চেপে ধরে আর্তস্বরে অভিযোগ সুরু করলেন—"সাহেব। বিচার করে যাও। বাড়ীতে বেটাছেলে নাই—সিপাই ঢুকেছে—তুমি বিচার করে যাও সাহেব !!" —সাহেব যতই বলে—"এ মাদার ! ছোড়-ছোড় !" কিন্তু কে কার কথা শোনে। মাদাররা জামা টেনে আর বিচার মেনে হ্যানসন আর মুখার্জিকে না হ'ক পাঁচ মিনিট আটকে রাখলেন। ইত্যবসরে প্রতুলদা পাশের বাড়ীর মধ্যে লাফিয়ে পলেন। কিন্তু পা গেল তাঁর মচ্‌কে। প্রতুলদার বাসার দিকে পুলিশ যাচ্ছে খবর পেয়েই দলের সভ্য জাঁহাদার দাঙ্গাবাজ শ্যামপাণ্ডে আর অধীর ব্যানার্জি ছুটে গিয়েছে সেদিকে। তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন সুবোধ নাগ (রুনু)। তিন চার জনে মিলে আহত প্রতুলদাকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়া হল।

প্রতুলদা কিন্তু বেশী দিন টিকতে পারলেন না। ত্রিপুরার শ্রীমনীন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সাথে ফরিদপুর হয়ে কলকাতায় যাবার পথে রাজবাড়ী ষ্টেশনে তিনি ধরা পলেন। মনীন্দ্র বাবু দুঃসংবাদ বহন করে ঢাকায় এলেন। খবর শুনে সুবোধ খুবই ব্যথিত হল। মহারাজ তখন এক মনে নোট ছাপাচ্ছেন। ত্রস্ত পদে সুবোধ তাঁর কাছে গিয়ে আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বলল—"মহারাজ! প্রতুলদা ধরা পড়েছেন, রাজবাড়ী।

মনিবাবু ফিরে এসেছেন।"

মহারাজ নিবিষ্টচিত্তে প্রেসে প্যাঁচ কষছিলেন। মাথাটাও তুললেন না। অন্যমনস্ক ভাবেই যেন বললেন—"হুঁ—হয়েছে—তারপর।"

এত বড় দুঃসংবাদে এত নির্লিপ্তভাব! সুবোধের মনে হল কথাটা মহারাজের বোধগম্য হয়নি। ইচ্ছে হল মহারাজকে একটি প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে চীৎকার করে বলে, "মহারাজ! মহারাজ! প্রতুলদা গ্রেপ্তার হয়েছেন"। কিন্তু পরক্ষণেই সুবোধের মনে হল মহারাজের অচঞ্চল সংযম তার অসংযত চাঞ্চল্যের গালে চড় লাগিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই সে খসে পল সেখান থেকে; মহারাজের সামনে দাঁড়িয়ে থাকাটাও বিষম লজ্জার বিষয় মনে হল তার কাছে।

পূর্ণানন্দ একদিন বিনা আলোয় সন্ধ্যার পর সাইকেল চালানোর অপরাধে পাঁচ আইনে একরাত্রি কারাবাস করে এসে খুব হম্বি তম্বি লাগিয়েছিল সুবোধেব ওপব। "তোবা অপদার্থ,—দেশ সেবকেব সম্মান ছ্যাওন জানস্ না। এই যে আমি অনাহাবী হাকিমবে বেকুব বানাইয়া তিন টাকা ফাইন না দিয়া একরাত জেল খাইটা আইলাম,—আব তোবা জেল গেটে ফুলেব মালা, নিশান লইয়া গেলিনা,—বন্দেমাতরম —ভারত মাতাকি জয়,—পূর্ণানন্দকি জয় ধ্বনি দিলিনা কিয়ের লাইগা ক' তো? তোগো মনে কি একবিন্দু দেশ-প্রেমও নাই?" তারপরই স্বভাব-সিদ্ধ হে-হে-হে-হে।

সুবোধ বলেছিল—"বেশী হাসিসনে। জানিস আমাদের জ্বর ম্যালেরিয়া আর তোর হচ্ছে টাইফয়েড্? আমাদের প্রথম ধাক্কাতেই ১০৫ ডিগ্রি। তারপর কমে কমে ছেড়ে যাবে। তোর হবে ঠিক উল্টো। ধীরে ধীরে বেড়ে পরে তোকে শেষ করবে।"

হ'লও তাই। এবার পূর্ণানন্দ ধরা পড়ে হিকস্ সাহেবের হাতে বেদম মা'র খেল। জেলে সুবোধের সাথে দেখা হলে বলল—"ব্যাটায় খুব পিটাইছে আমারে।"

১৯২৮ সালে সকলেই আবার মুক্তি পেয়ে ঘরে ফিরে এল। আবার সুরু হল বাইরে হৈ চৈ আর ভিতরে বৈপ্লবিক প্রস্তুতি।

সুবোধ এবার বিয়ে করে সংসারী হল। কিন্তু একবছর পরে আবার যেতে হল জেলে। বছর তুই পরে সে অন্তরীণের আদেশ নিয়ে ফিরে এল ঘরে। আশুদা তখনও ফেরারী। তিনি এসে তার সাথে দেখা করে কাজকর্ম সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করে গেলেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে তিনিও ধৃত হলেন।

এই থেকে সুরু হল সুবোধের অজ্ঞাত বাস। সাত বছর পরে রমেশদা, কেদারদা, আশুদা, রবিদা সকলেই ফিরে এলেন। এলনা শুধু আনন্দ। পরপর তুটি ষড়যন্ত্র মামলায় তার ডবল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ড হয়েছে। সে জেল খাটে আর ভাবে সুবোধ ঠিকই বলেছিল - লক্ষণ দেখেই চিনেছিল টাইফয়েড্ জ্বর।

জেল থেকে রমেশদা বেরিয়েছেন পঙ্গু হয়ে,—আর কেদারদা প্রায়ই শয্যাশায়ী।

দেশের ওপর দিয়ে অনেক ঝড় ঝাপ্টা চলে গিয়েছে। নোয়াখালী দাঙ্গার পর মহারাজ সেখানে চলে গিয়েছেন সেবার ভার নিয়ে। জহরলালের ইণ্টেরিম গভর্ণমেণ্ট পূর্ণানন্দদের ছেড়ে দিয়েছে। অবশেষে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট বিদ্রোহী ন্যাংটা ফকিরের শিষ্যদের কাছে খণ্ডিত ভারতের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে ইংরেজ ভারত ত্যাগ করল। কেউ হাসল—কেউ কাঁদল। তবে হাসির হল্লা ছাপিয়ে দেশের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত, আকাশ, বাতাস কেঁপে উঠল আর্তের মর্মান্তিক রোদন ধ্বনিতে। জগদ্ধাত্রী এল করালী চামুণ্ডার বেশে।

হঠাৎ রবিদা খবর পেলেন সুবোধ সপরিবারে এসেছে কলকাতায় গুরুতর পীড়িত হয়ে। রমেশদা, কেদারদা, মহারাজ, পূর্ণানন্দ সকলেই কলকাতায়। সদলবলে গেলেন তাঁরা সুবোধকে দেখতে। তালতলা অঞ্চলে একটা এঁদো গলিতে একখানি খোলার ঘর। কড়া নাড়া দিতেই একটি ছোট্ট ছেলে এসে দোর খুলে দিল। ঘরে ঢুকেই

তাঁরা দেখতে পেলেন মেঝের ওপর মলিন বিছানায় একটি লোক শুয়ে আছে। চোয়ালের হাড় বেরিয়ে পড়েছে, গায়ের রং যেন জ্বলে গিয়েছে, কোটরগত চক্ষুতে রক্তের লেশমাত্র নেই,—কাচের মত স্বচ্ছ তার শ্বেতাংশটুকু। মাথার কাছে অবগুণ্ঠিতা একটি নারী মাথায় বাতাস দিচ্ছিল,—সকলকে ঢুকতে দেখে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। রোগীর ছিল তন্দ্রার ভাব; নিঃশব্দে থমকে দাঁড়াল সকলেই। ফিস্ ফিস্ করে মহারাজ বললেন—"এই কি সুবোধ?"

মাথা নেড়ে রবিদা জানালেন—"হ্যাঁ।"

নিঃশব্দে বসলেন তাঁরা সুবোধের দুই পাশে।

হঠাৎ সুবোধের পেট ও বুক আন্দোলিত হল,—খক্ খক্ করে সে কাশতে লাগল। মুখে খানিকটা কাশি উঠতেই মহারাজ চূর্ণভরা একটি মাটির পাত্র ধরলেন মুখের কাছে। কাশি ফেলে সে একবার চেয়ে দেখল এপাশ ওপাশ। ইঙ্গিতে জানাল হাওয়া প্রয়োজন। পূর্ণানন্দ হাওয়া করতে লাগল। প্রায় দশ পনর মিনিট পর সে যেন কিছুটা সুস্থ হল। আবার সে এপাশ ওপাশ চেয়ে দেখল। আস্তে আস্তে বলল "মহারাজ—রবিদা,—ওটা রমেশদা না? এত খারাপ হয়েছে আপনার চেহারা? আরে কেদারদা যে! আপনাব শরীর আর খারাপ হবে কি! মরার বাড়া গাল নেই—আপনিতো মরেই রয়েছেন। এখন উঠতে হাঁটতে পারেন তো? আনন্দ—পুনাচোরা—তুইও এসেছিস্! বাঃ—বেশ চেহারা করেছিস্! আয় আমরা সবাই মিলে রবিদা'কে হাউসসার্জেন আর মহারাজকে সিস্টার নার্স করে হাঁসপাতাল খুলে দি।" হাসি আর কাশি এক সাথেই এল সুবোধের। কাশি থামলে মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন, "এখন কেমন আছ?"

সুবোধের মুখে যেন ঈষৎ হাসি খেলে গেল। "কেমন আছি? আপনারা কেউ দাদার পত্র পড়েন নি? ১৯১৭ সালে চন্দননগর থেকে ওটা বেরিয়েছিল। তাতে ছিল—

"দাদা! ঋণ তব নারিব শুধিতে এ জীবনে
গণিতেছি দিন তাই বরিতে মরণে।"

কিছুটা থেমে আবার বলল—"রবীন্দ্রনাথ কি কবিতাই লিখেছেন —যেন মর্মবীণায় বেজে উঠেছে বিদায়ের গান—

"পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ ভাই
সবারে আমি প্রণাম করে যাই।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল সে,—বোধ হয় দু ফোঁটা অশ্রুও গড়াল তার চোখ থেকে।

ঘরের বাতাসটাও যেন কাঁদনভরা ব্যথায় কেঁপে উঠল। তারপর নীরবতা।

রবিদা জিজ্ঞেস করলেন—"কি অসুখ তোমার?"

আবার সেই ম্লান হাসি।

"আমার অসুখ? আমার অসুখ দৈন্য, দেহ আর মনের নিয়ত অসীম দ্বন্দ্ব,—আমার অসুখ অনাহার, অন্তর-জোড়া ব্যর্থতার হাহাকার।" হাঁপাতে লাগল সুবোধ।

পূর্ণানন্দ তাকে পাখা দিয়ে হাওয়া দিতে দিতে বলল—"আর বেশী কথা বলিসনে।"

কিছুক্ষণ চুপ করে পড়ে থেকে সুবোধ বলল—"কথা বলব না? বলিস কি তুই? আজ এঁদের সকলকেই পেয়েছি, হয়তো এই শেষ পাওয় [illegible]জ আমার বলতেই হবে সব কথা। এত দুঃখ, এত দৈন্য আমি বয়ে নিয়ে যেতে পারব না।" তারপর সে সুরু করল নিজের কাহিনী।

"কি জানি কোন দুর্বল মুহূর্তে বিয়ে করে বস্‌লেম। এর পরও সমিতির কাজ করেছি ত্রুটিহীন ভাবে,—জেলেও গিয়েছি—অন্তরীণেও থেকেছি। কিন্তু সর্বদাই মনে হত আমার বৈপ্লবিক আগ্রহে যেন ফাটল ধরেছে—আগেকার বিপ্লবী আমি আর নেই। জেল থেকে ফিরে এসে কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন হলাম। নিজে খেতে হবে,—

স্ত্রী-কন্যাকে খাওয়াতে পরাতে হবে। বিত্তহীন,—নিঃস্ব আমি। তার ওপর কোন ডিগ্রীর মূলধনও নেই। তাই অবস্থার চাপে এক জমিদারের চাকরী নিলেম। কিন্তু বিপ্লবী সুবোধ রায়ের এই দুর্দশা দেখে অন্তর আমার নিয়তই হাহাকার করত।”

আবার ক্ষণকাল নীরব থেকে সুবোধ যেন দম্ নিয়ে নিল। পুনরায় সে সুরু করল কাহিনী।

“ক্রমে এই মানসিক দ্বন্দ অসহ্য হয়ে উঠল। একজন বন্ধুর চেষ্টায় এবারে ঢুকে পলাম এক সওদাগরী অফিসে। দুঃখে—কষ্টে, টেনে-টুনে দিন চলতে লাগল। কিন্তু দশ মাস আগে সে অফিস দোর বন্ধ করেছে। সেই থেকে দৈন্য, অভাব, অনশন আমার নিয়ত সঙ্গী। আমার না হয় অভ্যাস আছে,—ফেরারী অবস্থায় কত দিন অনাহারে কাটিয়েছি,—জেলে কতবার অনশন ধর্মঘট করেছি। কিন্তু এরা? আমার ছেলে মেয়েরা আমারই সামনে অনাহারে ককিয়ে ককিয়ে কেঁদেছে, আর ওদের মা,–কোনদিন কিছু চায়নি আমার কাছে, ছেলে মেয়ের এই অবস্থা দেখে, আমার অবস্থা দেখে কেবলই খেটেছে আর নীরবে কেঁদেই চলেছে। চোখের ওপর এই সব দেখে অনেক সময় ইচ্ছে হয়েছে আত্মহত্যা করি। কিন্তু ভগবানের অসীম দয়া,—তিনি আমাকে সে পাপ থেকে রক্ষা করেছেন। সাধে কি লোকে বলে ঈশ্বরের অপার করুণা!”

পুনরায় একটু থেমে সুবোধ বলল—

“ব্যাধিরূপ করুণা তোমার, নিয়ে যাবে মোরে
শান্তির পারাবারে,—
প্রেয়সীর অশ্রুজল, মমতার আকর্ষণ’—
পড়ে রবে পশ্চাতে আমার, নাহি চাব ফিরে।”

কেদারদা বললেন—“তোমার তো সাহিত্য প্রতিভা ছিল। কোন দৈনিক বা সাময়িক পত্রিকাতে একটা চাকরী যোগাড় করে নিতে পারলে না?”

"হুঁঃ—আমার আবার সাহিত্য প্রতিভা! অনেক চেষ্টা করেছি,—কিন্তু সকলেই চায় ডিগ্রি। হয়তো কিছু কিস্মত থাকলে ওর মধ্যেই স্থান হয়ে যেত। পেটের দায়ে অনেক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা লিখে পাঠিয়েছি কলকাতার কাগজে। কিন্তু তা হয়তো ছাপানোর যোগ্য হয়নি,—তাই—ওঠেনি। যাক্‌গে। একটা কথা আজ আপনাদের বলব। দৈন্যের এই পেষণের তলেও কেন যেন মনে হয় বিপ্লবী সুবোধ রায় মরেনি। যদি দুটো পেট ভরে খেতে পেতাম, যদি আমার স্ত্রী, ছেলে, মেয়েরা নিতান্ত সাধারণ ভাবে খেতে পরতে পেত তা' হলে আমি এই বয়সেও পাহাড় প্রমাণ কাজের বোঝা মাথায় নিয়ে দৃঢ়পদে পথ চলতে পারতেম। কিন্তু সব ব্যর্থ হল দৈন্য অভাবে।

সুবোধের গলার মধ্যে ঘড়্ ঘড়্ করতে লাগল। মনে হ'ল সে অশ্রু রোধ কর্‌ছে। একটু পরে সে জড়িত কণ্ঠে বলল—"মহারাজ! আপনারা আমাকে ভুল বুঝবেন না। সে আঘাত আমাকে মরণের পরপারেও ব্যথা দেবে। আমি কখনও আমার সেবার প্রতিদানে কিছু চাইনি—সর্বদাই মনে রেখেছি—

"আমার আদর্শ ছিল নিষ্কাম দধীচি,
যেই ঋষি হাসি মুখে সমর্পিল অস্থি আপনার—
দেব-রাজ্য উদ্ধারের লাগি।"

রমেশদা ধীরে ধীরে বললেন—"তোমার দেব-রাজ্যতো উদ্ধার হয়েছে। ইংরেজ ভারত ত্যাগ করেছে। ১৫ই আগষ্ট থেকে ভারত স্বাধীন। পণ্ডিত জহরলাল এখন স্বাধীন ভারতের প্রধান মন্ত্রী, সর্দার প্যাটেল ডেপুটি প্রধান মন্ত্রী, বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোষ—আর আমাদের ভূপতি মজুমদারও একজন মন্ত্রী।"

সহসা সুবোধের সর্বশরীর কেঁপে উঠল—প্রাণপণে সে উঠে বসার চেষ্টা করতে লাগল। ব্যর্থ হয়ে নিরুপায় ভাবে যথাসাধ্য চীৎকার করে উঠল—"মতি, মতি—অনু—খুকু—অপু—দীপু তোরা সব ছুটে আয়।

ভারত স্বাধীন হয়েছে,—সকলে চীৎকার করে বল বন্দেমাতরম্। আজ চার দিন হল এসেছি পাড়াগাঁ থেকে ; আমি এর কিছুই জানি না। কৈ তোমরা সব নীরব রইলে কেন ? ভারত স্বাধীন! ভারত স্বাধীন! ওকি মতি তুমি কাঁদছো কেন ? আর কোন দুঃখ নেই। এবারে তুমি ছেলে মেয়ে নিয়ে খেতে পরতে পাবে, ছেলেদের শিক্ষা হবে—আমার চিকিৎসা হবে—আর আমি মরবনা। আমি দেশের সেবা করেছি বলে নয়! এই তো স্বাধীন ভারতের আদর্শ। এই আদর্শের জন্মেই মহাত্মাজী লড়াই করেছেন—আদর্শবাদী নেহেরুজী জেল খেটেছেন। তার উপর আমাদের বিপ্লবী বন্ধু ভূপতি বাবু মন্ত্রী! আর কি আদর্শের অমর্যাদা হতে পারে, - প্রত্যেক ভারতবাসী এবার মুক্তির অমৃতে অমর হবে”—

বাধা দিয়ে বড় মেয়ে অনু বললে--“থামো বাবা। থামো। তোমাব ব্যামো বেড়ে যাবে। যারা স্বাধীনতা পেয়েছে তারা পেয়েছে। তুমি আমি যে তিমিরে—সেই তিমিবে। এই তো তুমি দেশের জন্য এত ত্যাগ করেছো। কিন্তু স্বাধীনতার পর তোমার স্থান কোথায় ?”

উত্তেজিত ভাবে সুবোধ জবাব দিল, “পদতলে। ওরে বোকা মেয়ে! দেখিসনি তুই সিঁড়ির বুকে লাথি মেরে সকলে উঁচুতে ওঠে। কিন্তু সিঁড়ির প্রয়োজন তাতে ফুরোয় না। আমরা হচ্ছি সেই সিঁড়ি। প্রফুল্লচাকী, ক্ষুদিরাম থেকে সুরু করে তারিনী, নলিনী গোপীনাথ, সূর্য্যসেন, কণকলতা, মাতঙ্গিনী, মোহিত, রামেশ্বর পর্যন্ত যারা প্রাণ দিয়েছে দেশের জন্যে, কারাগারে, অন্তরীণে, নীর্বাসনে যারা জীবন যৌবন খুইয়েছে, যারা নাম যশের কামনা না রেখে অজানার অন্ধকারে সর্বস্ব ত্যাগ করে দেশ-মুক্তির তপস্যা করেছে —এই মহারাজ, রবিদা, রমেশদা, কেদারদা পূর্ণানন্দ সকলে মিলে রচনা করেছেন সেই সিঁড়ি,—পদাঘাতে পদাঘাতে ক্ষয়ে যাওয়ায় আজ চেনা না গেলেও আমরা সেই সিঁড়ি। আমাদের বুকে পা

রেখে অপরে উঁচুতে উঠলেও আমাদের ক্ষোভ নেই, প্রতিবাদ নেই, চাওয়ারও কিছুই নেই। কিন্তু এই গর্ব আমাদেব চিরকাল থাকবে যে, ভারতের তরুণ দলেব শোণিত আর অস্থি দিয়ে নির্মিত হয়েছে এই সিঁড়ি। তাদের অন্তরেব নিষ্কাম গেরুয়া রং রাঙ্গিয়ে তুলেছে এই সিঁড়ি—

উত্তেজনায় সুবোধ হাঁপিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই কাশি। থর্ থর্ কেঁপে উঠল তার সর্বদেহ—এক ঝলক রক্ত মুখ থেকে বের হয়ে —গণ্ড বেয়ে বালিশ বিছানায় মেখে গেল। মহারাজ ব্যস্ত হয়ে শুশ্রূষায় লেগে গেলেন। পূর্ণানন্দ ধীরে ধীবে বলল—"নিষ্কাম গেরুয়াব সাথে সাথে রক্তরাগেও রঞ্জিত হয়েছে সিঁড়ি।"

সন্নিধ

দুপুর রাত। সমগ্র পল্লীটি ঘুমের কোলে এলিয়ে পড়েছে। দিবসের কোলাহলময় কর্মজীবনের পরিচয়টুকুও অবরুদ্ধ,—অবলুপ্ত। কালের যাত্রাপথে রজনী মাত্র একটি প্রহর পিছে রেখে কিছুদূর এগিয়েছে, কিন্তু সে এরই মধ্যে পল্লীপ্রাণের উপর সুষুপ্তির যবনিকা টেনে দিয়েছে। জীবনের সাড়াশব্দ নেই,—গভীর শান্তি বিবাজ করে গ্রামখানি ঘিরে। আলোও নেই কোন ঘরে। সারাদিন জীবন-সংগ্রামের পর অবসন্ন সৈনিকগণ বিশ্রামের অন্তরায় মনে করে ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়েছে। তাই নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়েছে গ্রামখানি। জঙ্গলে ভরা আঁধার গ্রাম্যপথের দুইপাশে বড় বড় গাছপালা বিরাট বিরাট ভুত, প্রেত, দৈত্য দানাব মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওদের বয়স বোধহয় তিন পুরুষেরও বেশী হবে। কত কাহিনী জড়িত আছে ওদের ঘিরে। গ্রাম্যপথের এই নিবিড় কালো আস্তরণে কোথাও কোথাও ভিড় করা জোনাকীর আলো চুমকি বসিয়েছে। এই মিটি মিটি আলো ছাড়া আর কোথাও প্রাণের সাড়া নেই। নিশুতি রাতের নিস্তব্ধতা যেন অনুভব করা যায় অন্তব দিয়ে। তবু এই নিস্তব্ধতা একান্ত নয়। একটি দীর্ঘশ্বাস, –একটি মৌন আর্তনাদ আছড়ে পড়ছে এর সঙ্গে। সুপ্তিভরা রজনী,—কিন্তু পল্লীর একখানি গৃহে জেগে আছেন জননী। চোখে তাঁর ঘুম নেই, মনে নেই শান্তি। তাঁব বুক ঠেলে হাহাকার বেরিয়ে আসে অবিরাম দীর্ঘশ্বাসে। বিছানায় শুয়ে তিনি ছট্‌ফট্‌ করছেন আর ভাবছেন—একবছর জেল খেটে খোকা আজ পাঁচদিন হল খালাস হয়েছে। কিন্তু সে গেল কোথায়? ওদের কি দয়ামায়া নেই? আমি কি ওদের কেউ না?—

অশ্রুতে টল্‌মল্‌ করে উঠলো মায়ের চোখদুটি। বেরিয়ে এল দীর্ঘশ্বাস বুক থেকে।

ঠিক এমনি সময় ঘরের দোরটি একটু নড়ে উঠল,—চাপা গলায় কে যেন ডাক দিল—"মা—মা—"

শশব্যস্তে শয্যা ত্যাগ করে জননী এসে দাঁড়ালেন দোরের কাছে—কম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—"কে? কে? খোকা? খোকা নাকিরে?"

"হ্যাঁ—মা—হ্যাঁ"—চাপা গলায় উত্তর আসে বাইরে থেকে।

দোর খুলে দিলেন জননী। আবেগে তাঁব সাবাদেহ কাঁপছে,—অশ্রুর বাদল নেমেছে চোখে। একি ক্রন্দন? একি আনন্দ? একি অভিমান?

ঠিক বোঝা যায় না। হয়তো এই তিনটি ভাবেরই ধারা এলো-মেলো ভাবে ঘা দিয়েছে মায়ের বুকে,—আর তাতেই অঝোর ধারায় ঝরণা ছুটেছে চোখের পথে!

দুজনেই বসে পড়ল মেঝের ওপরে। মা ছেলেকে জড়িয়ে ধরে নীরবে কাঁদতে লাগলেন। ছেলে বাধা দিল না। মায়ের বুকে মাথা রেখে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল সে। তার মনেও অনেক প্রশ্ন। সব চেয়ে বড় করে দেখা দিল একটি কথা—এইভাবে মাকে কাঁদিয়ে দেশ সেবায় কোন সার্থকতা আছে কি না? জননী—না—জন্মভূমি? এই তো আমার জননী—স্নেহময়ী দেবী। তাঁর মায়া আচ্ছন্ন করে আছে আমার অন্তরকে,—আমিও তাঁকে অন্তর দিয়ে ভক্তিকরি—ভালবাসি। আর জন্মভূমি? তাকেও আমি ভালবাসি। তার মাটিতে আমি মানুষ হয়েছি, তার আকাশ, তার বাতাস, তার প্রান্তর কান্তার, বন উপবন সবই তো আমি ভালোবাসি। তার সাথে সাথে আরও ভালো-বাসি লতিকা, আয়েশা, হবিব, হরিচরণকে যাদের নিয়ে আমার সামাজিক পরিবেশ গড়ে উঠেছে। কিন্তু এই কি সব? আরো তো বহু আছে। সে সব তো আমি চিনিও না—জানিও না। তাই দেশ-মাতৃকার সমগ্র পরিচয় তো আমি আজও পাইনি। কোথায় আসামের কোন এক প্রান্তের চা বাগানে এক শ্বেতাঙ্গ চা-কর কুলীদের উপর

অত্যাচার করেছে—তারই জন্যে আমি মাকে কাঁদিয়ে বের হব পথে?

মাতৃস্নেহের বন্যায় সন্তান ভেসে গেল। স্রোতের টানে ভেসে চলা অবশতার মাঝে সহসা সে ভেলা রূপে পেল রবীন্দ্রনাথের কবিতা—

"বাহিরিয়া এল কাবা। মা কাঁদিছে পিছে,
প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুছিছে।
ঝড়ের গর্জ্জন মাঝে,
বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে;
ঘবে ঘবে শূন্য হল আরামের শয্যাতল
যাত্রা কর, যত্রা কর যাত্রীদল
উঠেছে আদেশ
বন্দরের কাল হল শেষ"

স্থির হল সন্তানের মন। মায়ের আবেগও ততক্ষণে প্রশমিত হয়েছে। মা জিজ্ঞেস করলেন—"আজ পাঁচ দিন তুই জেল থেকে বেরিয়েছিস। ছিলি কোথায় এ ক' দিন?"

চাপা গলায় ছেলে জবাব দিল—

"মা! জানো তো সবই। আবার কেন মিছেমিছি জিজ্ঞেস কর। আমি জানি তোমরা বাড়ী থেকে লোক পাঠিয়েছিলে আমাকে জেল গেট থেকে আনার জন্যে। কিন্তু সে পৌঁছানোব আগেই আমাকে ছেড়ে দেয়। বের হয়েই দেখি দলের একটি ছেলে আমার ভাগনে পরিচয় দিয়ে অপেক্ষা করছে। তাব সাথে সরে পলাম—"

বাধা দিয়ে মা বললেন—"তোদের প্রাণে কি দয়ামায়া নেই? বাড়ীর কথা একটিবারও মনে হল না? আমি কি তোর কেউ না?"

হেসে ছেলে বললে—"কী যে বল মা! শিবাজীর মত বলব নাকি 'জননী! তুমিই আমার ঈশানী?' সত্যি বলতে কি—আমি যখন যে কাজ করি মনে মনে তোমাকে প্রণাম করে তোমার অশীর্বাদ নিয়েই করি। মনে আছে মা সেই কথা?"

—"কোন কথা ?"

"সেই যে পুকুরঘাটে জল খেতে গিয়ে একটি বুড়ী ডুবতে লেগেছিল। তাকে বাঁচাতে আমি জলে ঝাঁপ দিলাম। কিন্তু বুড়ী আমাকে জড়িয়ে ধরলে। ফলে অনেক হাবুডুবু খেয়ে অনেক কষ্টে বুড়ীকে বাঁচালাম,—নিজেও বাঁচলাম। মরেও যেতে পারতেম। কিন্তু সে জন্যে তো তুমি হায় হায় করনি—হাসিমুখে আমাকে আশীর্বাদই করেছ। তাই তো আমি ভাবি একটিমাত্র বুড়ীকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের জীবন বিপন্ন করে যে মায়ের আশীর্বাদ আমি পেয়েছি, কোটি কোটি বিপন্ন দেশবাসীকে বাঁচাতে গিয়ে, তাদের মুখে হাসি ফুটাতে গিয়ে আমি যদি মরেও যাই আমার সেই মা'র আশীর্বাদ আমি পাবই পাব।"

আঁধারের মাঝে জননী সন্তানের মাথায় ও মুখে স্নেহভরে হাত বুলালেন। কিছু পরে বললেন—

"একটু বস—আমি আলোটা জ্বেলে নিই—"

বাধা দিয়ে ছেলে বললে—"না-মা। আলো জ্বেলো না—ওরা আমায় দেখতে পাবে।"

"না—না—আমাকে বাধা দিসনে। আমি দেখব তোর মুখখানি, আমার মনে হচ্ছে তুই বড় রোগা হয়ে গেছিস—"

"তবে একটি দেশলাইয়ের কাঠি ধরাও—দেখে নাও আমার মুখ—আমিও তোমাকে প্রাণভরে প্রণাম করি"—

মা হাতড়ে হাতড়ে বালিশের তলা থেকে দেশলাই বের করে একটা কাঠি ধরালেন। কম্পিত শিখার অস্পষ্ট আলোকে ছেলের মুখ দেখে তিনি শিউরে উঠলেন। অশ্রুজড়িত কণ্ঠে বললেন—"এ যে বড্ড রোগা হয়ে গিয়েছিস তুই। জেলে তোকে নিশ্চয় খুব কষ্ট দিয়েছে—খেতে দেয়নি—"

বাধা দিয়ে ছেলে বললে—"কিই যে বল মা! খেতে আবার দেয়নি! শুনবে—শুনবে—শুনবে কি খেয়েছি ?"

অবিশ্বাসের সাথে মা বললেন—"বল্"

"এই ধর খুব ভোরে হাত মুখ ধোবার পরই খেতে দিত লপ্ সী।—"

—"লপ্সী ?—সে কিরে ?"

"অতি অপূর্ব চীজ্—মা—অতি অপূর্ব চীজ্!" একটু থেমে ছেলে আবার বললে—"তোমরা হয়ত বলবে খুদ সেদ্ধ। আসলে তা নয়। কোনদিন শুধু চালের খুদ, কোনদিন তার সাথে ডালের খুদ মিশিয়ে,—কোনদিন বা গুড় দিয়ে ঘেঁটে খেতে দেওয়া হত। কি বলব মা! মাঝে মাঝে এই লপ্সী পোলাও হয়ে যেত।"

"পোলাও ?"

"হ্যাঁ পোলাও ?"—পোকা মাকড় সবই একসাথে সেদ্ধ হ'ত কি না!"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মা জিজ্ঞেস করলেন—"দুপুরে ?"

—"দুপুরে ভাত, ডাল, তরকারী। তোমরা আর এমনকি বেশী খাও ? বলবে মাছ। আমি বলব আমরা খেয়েছি পিল্লু আর পাথর।"

"সে কিরে ?"

—"পোকা আর পাথরের কুচি।"—

মা আর একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করলেন—"কি কাজ করাতো তোদের দিয়ে ?"

"ঘানি টানাত"—সহজ ভাবেই জবাব দিলে ছেলে।

"ঘানি ? সে তো মোষ গরুতে টানে!"

"তোমার ছেলে কি মোষের চেয়ে কম জোর রাখে! শোনই না চুপটি করে! রবি সেন আর আমি জেলে ঢুকতেই জেলার, জমাদার সকলেই বললে একজোড়া মোষ এসেছে জেলে। তাই খাটনিতে মিললো ঘানি। দশসের সরষে দেবে ওরা—তাই ভেঙ্গে প্রতিদিন তিনসের বার ছটাক তেল পুরিয়ে দিতে হবে। সরষে খারাপ হোক

—ঘানি খারাপ হোক কিছুই মানবেনা। কম হলেই দেবে সাজা—মাড়-ভাত, রাত-হাতকড়ি, খাড়া-হাতকড়ি, দাণ্ডা-বেড়ি আরও কত কি। প্রথম প্রথম বড়ই কষ্ট হ'ত মা। একটা ঘানি উঠাতে ঘুরে ঘুরে প্রায় কুড়ি মাইল পথ চলতে হয়। শেষের দিকে যখন ফোঁটা ফোঁটা করে তেল ঝরে—তখন বুক ফেটে যায়—মনে হয় গেলাম বুঝি পড়ে। কিন্তু তোমার ছেলেকে ওরা জব্দ করবে? রবিকে একদিন জমাদার গাল দিয়েছিল—তেল আধ ছটাক কম হবার জন্মে। প্রতিবাদে দুজনেই ঘানি টানা বন্ধ করলাম। সাজার পর সাজা দিতে লাগল ওরা। খাড়া-হাতকড়িতে সারাদিন রাখল লটকিয়ে,—চটকাপড় পরিয়ে কোর্ট-বাবু সাজালে,—"

"কোর্ট-বাবু—? সে আবার কি?" মা প্রশ্ন করলেন।

ছেলে হাসিমুখে বলল,—"চটের জাঙ্গিয়া, চটের কুর্তা, চটের টুপি পরিয়ে দেয় শাস্তি হিসাবে। চটের রং কতকটা তো খাকির মতই।—তাই কয়েদীরা এই সাজা যারা পায় তাদের বলে "কোর্ট-বাবু"। কোর্ট-বাবু—মানে কোর্ট ইনস্পেক্টর বা কোর্ট দারোগা ওদের জীবনে ভয়ঙ্কর সত্য কিনা। তারাই সরকারের পক্ষে ওকালতী করে ওদের জেলে পাঠায়।" একটু থেমে আবার সে বললে—

"ওরা ভেবেছিল শাস্তি দিয়ে আমাদের ভেঙ্গে ফেলবে। একদম বোকা ওরা! জানেনা আমরা কোন মায়ের ছেলে। ওদের বেড়ি, হাতকড়ি, বেত্রাঘাতের সাধ্য কি যে তোমার ছেলের মাথা হেট্ করে। —তাই ওদের মুখে চুনকালি দিয়ে একবছর জেল খেটে ডঙ্কা বাজিয়ে বেরিয়ে এলাম। হুঁঃ—বেত মেরে আমাদের মা ভুলাবে! বলনা মা! পারে? ওরা—পারে?"

মা অভিভূত হয়ে ছেলের কথা শুনছিলেন। দেশলাই কাঠি কখন নিবে গিয়েছে—ঘর আবার আঁধার। মা আর একটা কাঠি জ্বালাবার জন্মে দেশলাই তুলতেই ছেলে মিনতির সুরে বললে—"তোমার পায়ে ধরি মা! আর কাঠি জ্বেল না—"

"কেন ?"—প্রশ্ন করলেন মা।

—"আঁধারেই চলি ফিরি,—আলো দেখে ভয় পাই। আলোতে এলেই মনে হয় সকলে আমাকে দেখবে—আমাকে চিনবে—আমার পূজো ব্যর্থ হবে।"

—"কিন্তু আমার কাছে যে তুই ধরা দিলি—আমি যে চিনলাম—"

—"তুমি তো চিনবেই"—হেসে বললে ছেলে। "কিন্তু আর কেউ না চেনে। তুমি মা,—তুমি চিনবেনা ? তোমার কাছে কি লুকোতে আছে ?—এ যে তোমারই পূজো। থাক্,—এখন উঠি মা —আচ্ছা—টাকা দিতে পার কয়েকটা ?"

মা একগাছি চুড়ি খুলে দিলেন হাত থেকে।

নিয়েই ছেলে মা'র পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে—কি যেন একটা তাঁর পায়ের কাছে রাখলে। তারপর অগ্রসর হল দোরের দিকে।

কাতর কণ্ঠে মা ডাকলেন—"খোকা। খোকা—যোগেন—যোগেন" ছেলে ফিরে দাঁড়ালে —মিনতির সুরে বললে –

"আর ও নামে আমায় ডেকনা মা! ও পরিচয় আমার আর নেই। এখন আমার একমাত্র পরিচয় আমি তোমার খোকা—তোমার অনামা সন্তান।"

নিঃশব্দে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। মা'র চোখে এল জল। কাঁদতে কাঁদতে তিনি বসে পড়লেন সেখানেই কিছুক্ষণ নীরবে অশ্রু বর্ষণ করে আর একটি কাঠি জ্বেলে দেখলেন তিনি পায়ের কাছে পড়ে আছে লাল টকটকে একটি জবাফুল।

ঘর থেকে বের হয়েই নিবিড় আঁধার-ঘেরা গ্রাম্যপথ দিয়ে হন্ হন্ করে ছুটে চলল যোগেন। মনে হল তার এক্ষুনি ছেড়ে আসা ঘর প্রবলভাবে তাকে পিছন পানে টানছে। শুধু কি তাই ? সে যেন আরও অনুভব করলে আঁধার পথের দুধারে আবছায়ার মত যে সব

বাড়ী, ঘর, বেড়া, গাছ-পালা দাঁড়িয়ে আছে সবাই যেন,—এমন কি পথের ধূলিটি পর্যন্ত এই পিছন টানার ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছে। সমবেত ষড়যন্ত্রজাল ছিন্ন করে এক রকম গায়ের জোরেই চলতে লাগল যোগেন। হঠাৎ আচমকা বেত্রাঘাতের মত কি যেন লাগল তার কপালে। থমকে দাঁড়াল সে। বেশ ভাল করে দেখে নিল চারিধার। উপরে হাত বাড়িয়ে বুঝলে—অশথ গাছের ঝুরি,—আগাতে গিঁট বাঁধা,—তখনও দুলছে। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল ছেলে বেলার কথা। এই অশথ গাছে ঝুরিতে এমনি করেই গিঁট বেঁধে দুফাক করে তার মধ্যে দাঁড়িয়ে কত দোল সেও তো খেয়েছে। তাদের দুরন্ত দস্যিপনায় মোটা ডালটি পর্যন্ত নড়ে চড়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে। গ্রাহ্যই করেনি তারা। বরং সকলে মিলে সহসা খেলার ভাল বদলিয়ে ঝুরি বেয়ে বেয়ে ডালে উঠে চটপট ছড়িয়ে পড়েছে গুঁড়ির চারপাশে, জুড়ে দিয়েছে লুকোচুরি খেলা,—বহুদিনের বড়ো গাছটার কোটরে কোটরে লুকানোর ছলে চোখ বুজে চীৎকার করে সাড়া দিয়েছে—টু-উ উ—

ছেলেবেলার এমনি কত কথা সারি দিয়ে ছুটে চলল যোগেনের মনে। হঠাৎ একা একাই হো হো করে হেসে উঠল সে। একটু থেমে ধীরে ধীরে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করলে স্বামিজীর Song of Sannyasin থেকে একটি ছত্র—"Chain, though made of gold is not less strong to bind thee—"

তারপরই সে দৃঢ় পদে এগিয়ে সীমাহীন অন্ধকারের মাঝে মিলিয়ে গেল।

১৯১২ সালের প্রথম দিকে ফেরারীরা ঢাকা শহরের স্বত্রাপুর মহল্লার একটি গলির ভিতরে একখানি বাসা ভাড়া নিয়েছে। সারা শহরে আরও চার পাঁচটি বাসা আছে ফেরারীদের। এছাড়া বহু গৃহী সভ্যের বাসাতেও নানা পরিচয়ে আত্মগোপন করে তারা। কেউ কেউ বা প্রাইভেট টিউশানি করে, কেউ বা পান বিড়ির দোকান

দিয়ে, ছবি, ছড়া, পাঁচালী, ব্রত-কথার দোকান সাজিয়ে বেচাকেনা করে। কিন্তু সন্ধ্যার পরই তাদের ভোল বদলে যায়। নিরীহ গো-বেচারী মাষ্টার, মিষ্টহাসি দোকানদার, কণ্ঠিধারী ছাপকাটা বিনয়ের অবতার বাবাজীরাও সন্ধ্যার পরই হিংস্ররূপ ধারণ করে গোয়েন্দা-কুলের চোখ এড়িয়ে ভীষণ কল্পনাকে রূপ দেবার জন্মে শহরের বুকে ত্রস্ত চরণে আনাগোনা করে।

দু' তিন দিন আগে সুত্রাপুরের বাসাতে একজন ফেরারী এসেছে। চমৎকার স্বাস্থ্য। একেবারে গ্রীক প্যাটার্ণের পেশীবহুল সুগঠিত দেহ। দেখবার মত চেহারা। তাই বাসার আর আর সকলে আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে। প্রথম প্রথম চুপ-চাপই ছিল সে। বড় একটা কথা বলে না। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে আকার ঈঙ্গিতেই,—বড় জোর "হাঁ" "না" "ঠিক" প্রভৃতি কথায় উত্তরের পালা শেষ করে। কিন্তু দু চার দিন যেতে না যেতেই বন্ধুরা টের পেল নবাগতের জোরালো দেহের অন্তরালে রসালো মনও আছে। একেবারেই "শুষ্কং কাষ্ঠং" নয়। রসের ফোয়ারা যে দোহারা চেহারার মধ্যে আত্মগোপন করে আছে। এটা প্রকাশ পেল সেদিন খিচুড়ি খাবার সময়।

বৃষ্টির দিন। সকলের মত নিয়ে খিচুড়ি রান্না হয়েছে। বড় একখানা কাঁধা তোলা ষ্টিলের থালে ঢেলে তারই পাশে খেতে বসেছে পাঁচজন। নবাগত মুচকি হেসে বললে—"খিচুড়ি মণ্ডলের পঞ্চ দিক-পাল—"

কেউ বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে রইল তার দিকে।

"কথাটা আপনাগো বোধগম্য হয় নাই। বুঝাইয়া দেই। ভূমণ্ডল গোল। কিন্তু তার দশটা দিক রক্ষার লাইগা দশটা দেবতা আছে। তাগো দিকপাল কয়। এইবার মিলাইয়া লন। গোল খিঁচুড়ি-থালার অর্থাৎ খিচুড়ি-মণ্ডলেব পাঁচটা দিকের রক্ষক হইয়া বইছি আমরা পঞ্চদিকপাল দেবতা—"

"রক্ষক না ভক্ষক ?" প্রশ্ন করলে একজন।

"ঐ একই। ভক্ষণের তরেই রক্ষণ"—হেসে জবাব দিল আগন্তুক।

—"তা খিচুড়ি কেমন হয়েছে ?" প্রশ্ন করলে অপর এক বন্ধু।

দুই চার গ্রাস গলাধঃকরণ করে নবাগতই জবাব দিল, "হইছে অনুপম। কিন্তু সমিধ লাগছে বিলক্ষণ।"

"সমিধ !" অবাক হয়ে বললে সকলে।

—"হ-হ-সমিধ। যজ্ঞের কাঠ। দেবতাগো ভোগ হইব,—তাই না চুলা জ্বলছে ! আহা ! সুন্দর প্রস্তুত হইছে ফেরারী-বান্ধব-খিচুড়ি—একেরে দেব-ভোগ্য ! অখন কিঞ্চিৎ হবিঃ হইলেই নিবেদন করণ যায় !"

এরপর থেকে উনুন ধরানোর প্রয়োজন হলেই নবাগত বলেন—"সমিধ সাজাও"। ফলে সমিধ কথাটির খুব চল হয়ে গেল। সাথে সাথে নবাগতের নব নামকরণও হল 'সমিধ'। সকলে তাকে 'সমিধ দা' বলে ডাকতে লাগল।

বড় মজার লোক সমিধদা। যতক্ষণ তিনি বাসায় থাকেন মাঝে মাঝে এমন সব রসালো কথা বলেন যে হাসির ফোয়ারা ছুটে যায়। তাই কি প্রাণভরে হাসারও উপায় আছে ! ফেরারীর বাসা, হা-হা-হো-হো চলবে না। মুখে হাত চেপে বা কাপড় গুঁজে এনতার হাস—কোন বাধা নেই।

কয়েকদিন পরেই সমিধদা চলে গেলেন বাসা থেকে। একদিন দুপুর রাতে তিনি হাজির হলেন ঢাকা জেলার পানাম গ্রামের এক গৃহস্থ ভদ্রলোকের বাড়ীতে। কিছু চিড়েমুড়কি খেয়েই ছেলেদের পড়ার ঘরের তক্তপোষের ওপর মাদুরে শুয়ে পলেন। ভোর হয়েছে। কিন্তু তখনও তাঁর ঘুম ভাঙেনি। হঠাৎ খুটখাট শব্দে তিনি তড়াক করে দাঁড়িয়ে গেলেন ! পরক্ষণেই গৃহস্বামীর দুটি শিশুপুত্রের দিকে

চেয়ে হেসে উঠলেন। এইবার ধীরে সুস্থে বসে ছোট ছেলেটিকে আদর করে টেনে আনলেন কোলের কাছে। মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে জিজ্ঞেস করলেন—"খোকন্! তোমার নাম কি?"

"মণ্টু"—জবাব দিল ছেলেটি।

–"মণ্টু!—মণ্টু!—বা!—বেশ নাম"—বললেন সমিধদা।

আদর পেয়ে মণ্টু তাঁব গায়ে গলে পল। কিছুক্ষণ পরে মাথা হেলিয়ে প্রশ্ন করল—"আব তোমার নাম?"

—"আমার নাম নাই। আমাব বাবা মায় নাম বাখেনি।"

ছেলেটাব বিশ্বাস হলনা। মুখ ভেংচিয়ে সে বলল—

"হুঁ—তাই আবাব।"

"সত্যি বলছি—আমার কোন নাম নাই,—আমার নাম অনামী।"

হো হো করে হেসে উঠল ছেলেটি। হাসতে হাসতে বলল—"শুনছস্ রে ছোড়দা! ও কয় ওব নাম অনামী।"

দুই ভাই হেসে গলে পল।

সন্ধ্যার পব অন্দরেব একটি ঘরে সমিধদা গৃহস্বামীব সাথে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় যোগ দিলেন। উভয়ের সামনে একখানি কাগজ। তা'তে একটি বাড়ীব ম্যাপ আঁকা।

সমিধদা ম্যাপে চোখ রেখে প্রশ্ন করলেন—

"এই সদব দোর—এই খিড়কি?"

—"হুঁ"—সায় দিলেন গৃহস্বামী।

"ফটক পাব হইয়াই পূজাব আঙ্গিনা। তারপব একটি গেট ছাড়াইয়া এই অন্দব মহল। কিন্তু কোন ঘরে সিন্ধুক—আর বন্দুক কোন ঘরে?"

—"পূজা-আঙ্গিনায় কাচারীঘরের পাশে কর্তাব কামরা। ঐ কামরায় বন্দুক আছে দুইটি,। অন্দরের পূব দুয়ারী ঘরে সিন্ধুক তিনটি, একটি ভিৎ আলমারী—সব চিহ্ন দেয়া আছে।"

—"ও!" সমিধদা আবার দেখলেন ম্যাপটি। তারপর নিজের

মনেই যেন বলে চললেন—"গ্রাম হইতে বাহির হওনের পথ তিনটি,—এই খাল। কিন্তু ডেলিভারী?—"

আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন গৃহস্বামী।

"Excellent"—একটু থেমে সমিধদা বললেন—"অর্থের মায়া না কাটাইলে পরমার্থের চিন্তা আসেনা। অর্থ-পিশাচরে আমরা সাধু বানাইয়া দিমু!"

—"নিতাইয়ের নূতন সংস্করণ"—হেসে বললেন গৃহস্বামী।

প্রায় তিন সপ্তাহ পরে—পানামে ভীষণ ডাকাতির খবর খবরের কাগজে বের হল। কয়েকদিন পরেই বিখ্যাত গোয়েন্দা সাবদা চক্রবর্তী নিহত হল ঢাকা শহরে।

কালীচরণদা, পরেশবাবু আরও দুই একজন বসে আছেন বাসায়। তাদের সামনে এসে সমিধদা চাপা গলায়,—অথচ দৃঢ়ভাবে বললেন —"কালীদা!—এইবার রতিলাল।"

মুচকি হাসলেন কালীচরণদা।

-"না- না—না। আপনে শুধুই হাসেন। কিন্তু জানেন তো আমাগো যে অনিষ্ট করছে রতিলাল,—আর যে অনিষ্ট করত্যাছে অখনও—তাতে তারে সপরিবারে শ্যাষ করণ উচিত।"

পরেশবাবু হেসে প্রশ্ন করলেন—"পরিবারে আবার কি করছে?"

"আমাগো হাতে যদি ওরা খুন হয়, ওগো পরিবার সরকার হইতে ভাতা পাইব,—এই আশাতেই ওগো বুকের ছাতা ফুইল্ল্যা উঠছে। কিন্তু ভাতা লওনের কাউরে না রাখনের একটা দৃষ্টান্ত যদি আমরা খাড়া করি ওগো বুকে কাঁপনের সাড়া আইব।"—জোরের সাথে জবাব দিলেন সমিধদা।

একমাস পরে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম তদন্তকারী, প্রধান রাজসাক্ষী, নামজাদা গোয়েন্দা রতিলালের দেহ পিস্তলের গুলীতে ঝাঁঝরা হয়ে লুটিয়ে পড়ল ঢাকার রাজপথে।

অনেক কষ্টে খুশী চেপে সমিধদা পরেশবাবুকে বললেন—“এইবার ইনস্পেক্টর বঙ্কিম চৌধুরী। কি কস্?”

পরেশবাবু হেসে বললেন—“তুই আস্ত খুনে।”

“সুখী হইলাম কথা শুন্যে”—ঠেস দিয়ে জবাব দিলেন সমিধদা।

বিপ্লবীদের বৈঠকে স্থির হয়েছে সরাতে হবে বঙ্কিম চৌধুরীকে। কিন্তু তাকে বাগে পাওয়া যায় না। অবশেষে সুযোগ মিললো।

বিক্রমপুরে গ্রামের বাড়ীতে বঙ্কিমবাবুর মেয়ের বিয়ে। খুব ধুমধাম। মঞ্চের ওপর বাদ্যকরের দল। বরিশাল থেকে নট্টরা এসেছে ঢোল বাজাতে। শানাইয়ে চিত্তহারী আলাপ জুড়ে দিয়েছে। যথাসময়ে ইংরাজী বাদ্য ও ঢোল, শানাই, কাড়া, কাঁশি বাজিয়ে বিরাট হৈ চৈ-এর মধ্যে বরযাত্রীর দল প্রবেশ করল বিবাহ বাসরে। তখনও সকলে আসরে বসেনি,—“আসুন” “আসুন”—“বসুন” “বসুনে”র পালাই চলছে। এরই ফাঁকে সমিধদা চাপা গলায় পাশের দু’জন সঙ্গীকে বললেন—“কাজটা ভাল হয় নাই। বেটা বেজায় হুঁশিয়ার। বিয়ের আসর তো নয়—এক্কেরে পুলিশ ফাঁড়ি। তোরা যা গিয়া। একের লাইগগ্যা তিন খোয়াইলে বেকুবী হইব।”

ভিড় ঠেলে বেরিয়ে গেল দু’জন।

বিবাহের ক্রিয়া এই সুরু হবে। বরযাত্রীর দলের মধ্যে সমিধদা। ছলনার কাছ ঘেঁষেই বসলেন তিনি। বরের আসনের পরেই কন্যার, বরের প্রায় সামনে কন্যার পিতার আসন। এখান থেকে,—নাঃ—ব্যর্থ হবার কোন সম্ভাবনা নেই। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন সমিধদা।

কিন্তু ও কি? কনে সম্প্রদান করতে বসলেন এক বিধবা। শোনা গেল বঙ্কিমবাবু অসুস্থ,—নীচে নামবেন না। ব্যর্থতার নৈরাশ্যে সমিধদার বুক ভরে গেল। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে তিনি বেরিয়ে গেলেন আসর থেকে।

১৯১২ সালের শেষ ভাগে শ্রীহট্ট জেলার মৌলবীবাজার মহকুমায় একটি ভীষণ কাণ্ড ঘটে গেল। জগৎশী গ্রামে ঠাকুর দয়ানন্দের অরুণাচল আশ্রম! বহু ভক্ত নর-নারী আশ্রমে এসে পুজো অর্চনা করে—নাম কীর্তন করে। পুলিশ এর মধ্যে রাজনীতির গন্ধ পেলে। অত্যাচারী সর্বদাই সন্দেহ পরায়ণ। বহু লোক জমায়েৎ হয় আশ্রমে। পুলিশ ভাবলে এটাতো ভাল নয়। ছুতো খুঁজতে লাগল তারা। অকস্মাৎ একদা "বালক হরণের" অভিযোগ নিয়ে পুলিশদল হানা দিল আশ্রমে। ঠাকুর দয়ানন্দ বাধা দিলেন। হেঁকে বললেন— "তোমাদের কোন অধিকার নাই আশ্রমের ওপর—আশ্রম স্বাধীন।"

ফিরে গেল পুলিশদল। কিন্তু ছু'দিনও গেল না। মহকুমা শাসক ক্যাপ্টেন গর্ডন বহু সঙ্গীনধারী পুলিশসহ অগ্রসর হলেন আশ্রমের পথে।

ভোরের আলো তখনও ধরণীর বুকে নামেনি। আশ্রমবাসীরা হাত মুখ ধুয়ে স্তব পাঠ করে খোল করতাল বাদ্য সহ সুর করে কীর্তন ধরেছেন—"প্রাণ গৌর নিত্যানন্দ।"

অকস্মাৎ বন্দুক গর্জে উঠলো। সাথে সাথেই এলো বজ্র কণ্ঠের আদেশ—"থামাও গান।"

থমকে গেল আশ্রমবাসীরা। কিন্তু ঠাকুর দয়ানন্দ অধিকতর বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—"কীর্তন থামবে না। ইংরাজ সরকারের কোন অধিকার নাই আশ্রমের ওপর। আশ্রম স্বাধীন। চালাও কীর্তন –প্রাণ গৌর নিত্যানন্দ।"

গর্ডন সাহেবের আদেশে পুলিশদলের রাইফেল গর্জে উঠল।

সন্ন্যাসীরাও ত্রিশূল হাতে "হর হর মহাদেও" ধ্বনি করে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আর্তনাদ, জয়গুরু ধ্বনি আর বন্দুকের গর্জনে কেঁপে উঠল চতুর্দিক। আশ্রমের প্রভাতী মাঙ্গলিক স্তব্ধ হল গর্জন ও হাহাকারে।

অরুণাচলের পূত অঙ্গন অবস্নাত হল শোণিত ধারায়.—আশ্রমের ভক্ত শিষ্য মাষ্টার মহেন্দ্র দে'র প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পল ধুলায়।

শ্রীহট্টের বিপ্লবী নায়ক গিরিজাবাবু এই দুঃসংবাদ বহন করে নিয়ে এলেন সমিতির কেন্দ্রে—সর্বাধিনায়কের কাছে। অনেক জল্পনা কল্পনাব পব, বহু আলোচনা অন্তে স্থিব হল প্রতিশোধ চাই,—জনগণেব আন্তরিক বিক্ষোভকে রূপ দিতে হবে প্রতিহিংসার মাধ্যমে। মাষ্টাব মহেন্দ্র দে'র জীবনেব বিনিময়ে দিতেই হবে ক্যাপ্টেন গর্ডনেব জীবন।

কিন্তু কে নেবে এই কাজের ভাব? এগিয়ে এলেন অমৃতলাল সবকাব ওবফে পরেশবাবু আর তাবাপ্রসন্ন বল। দুজনেই নৈষ্ঠিক বিপ্লবী। ধীর, স্থির, মৃদুভাষী অথচ অসম সাহসী দুজনেই। কিন্তু তাদেব পিছন ঠেলে সহসা এগিয়ে এলেন সমিধদা। মৃদু হেসে বললেন তিনি- "আবে। এতবড বৃহদ ব্যাপারে একেবে পোলাপানগো উপব কি নির্ভব করণ যায়! মাথক—মানে অভিভাবক চাই। শাস্তরেই কইয়া গ্যাছে- -

উৎসবে ব্যসনে চৈব ভোজনে চ সংগঠনে—
সমবে প্রাণহবণে মাথকস্য প্রয়োজনম্"—

মৃদু হেসে মহানায়ক বললেন,—আচ্ছা!—তিনজনেই যাবে।"

সমিধদা ছুটে গেলেন কলকাতায়। রাজাবাজারেব বাসায় শশাঙ্কবাবুব সাথে দেখা করে সব জানিয়ে বললেন—"সমিধ চাই।"

"সে কি? সমিধের রূপান্তব প্রাপ্তি ঘটলো না কি? আপনার সমিধ তো উনুনেব লকড়ী!"—মন্তব্য করলেন শশাঙ্কবাবু।

"রাম কহ! আরে লকড়ী তো দেবতা তুষ্টি যজ্ঞের সমিধ! আর এ সমিধ হইত্যাছে দানব নিধন যজ্ঞের! মূঢ় জনে হেরে কয় বোমা!"

যথাসময়ে সমিধদা বোমা নিয়ে হাজিব হলেন মৌলবীবাজারে। অপর দুই বন্ধু আগেই গেছেন সেখানে। কয়েকদিন পর্যবেক্ষণের পর

স্থির হল সন্ধ্যার পর নিজের বাংলোতেই গর্ডনকে আক্রমণ করতে হবে।

রাত্রি নয়টা। কাঁটাতার আর মাথা ছাঁটা মেদির চারা দিয়ে বাংলোটি ঘেরা। তারই পাশে নিঃশব্দে অপেক্ষা করছেন তিনজন। আরও দুইজন স্থানীয় সভ্য দূরে রয়েছে পৃষ্ঠরক্ষক হিসাবে। গর্ডন সাহেব বাংলোর সামনে লনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মাঝে মাঝে আসছেনও বেড়ার ধারে। রিভলভারের পাল্লায় বেশ পাওয়া যায়। অমৃতলাল আর তারাবাবু রিভলভার উঠাতেই হাত দিয়ে নিষেধ করলেন সমিধদা। চাপা গলায় জানালেন- "বোমায় effect ভাল হয়—propaganda আর prestige দুই বাড়ে।"

তারপর প্রায় আধ ঘণ্টা গেল। সাহেব কামরায় ঢুকেছেন। বাইরে দেখা যায় না। অধীর হয়ে উঠলেন সমিধদা। সাথী দুই জনকে টেনে নিয়ে মেদির বেড়া অতিক্রম করতে গিয়ে কাঁটা-তারে বেধে পড়ে গেলেন ভিতরের দিকে। সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণে তাঁর দেহ উৎক্ষিপ্ত হয়ে রক্তাক্ত জড়পিণ্ডের মত পতিত হল ভূমিতে। সাথী দুইজন আহত হয়ে ছিটকে পড়লেন দূরে। মাটিটা কেঁপে উঠেছিল,--একটা গর্জন,—আগুনের ঝলক একবার,—এই শুধু তাঁদের মনে আছে। আর কিছুই মনে নেই।

রাত্রি প্রায় একটা। গর্ডন সাহেবের বাংলোতে পুলিশ, সি, আই, ডি গিজ্‌গিজ করছে। মৃতদেহের নিকটে ডে লাইট দেযা হয়েছে। রক্তে ভেসে গিয়েছে স্থানটি। তার মধ্যে শোণিত ধারায় রঞ্জিত তাজা টকটকে প্রকাণ্ড রক্তজবার মত পড়ে আছে নিষ্প্রাণ জড়পিণ্ড। বীভৎস দৃশ্যে শিউরে উঠছে সি, আই, ডি-রা।

গর্ডন সাহেব নিকটে এসে বললেন—"ঠিকানা মিলা? ইয়ে কোন্ হ্যায়? কেয়া নাম?"

তাঁকে সেলাম দিয়ে একজন সি, আই, ডি জবাব দিল—"পরিচয়ের কোন চিহ্নই রেখে যায়নি হুজুর! সমস্ত দেহটা দলে,

মুচড়ে, পুড়ে, ক্ষতবিক্ষত হয়ে—একাকার হয়ে গিয়েছে। নাম ঠিক করা যাবে না এর,—ধরে নিতে হবে এ অনামী বিপ্লবী।”

ঠিক সেই মুহূর্তেই দলের ডাক্তার আর সাথী ভাইদের অক্লান্ত সেবায় অমৃতলালের জ্ঞান ফিরেছে। তারাপ্রসন্ন কিছুক্ষণ পূর্বেই সংজ্ঞালাভ করেছেন। অমৃতলাল চোখ মেলে দেখলেন চারধার। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তারাবাবু তাঁকে বললেন—“পরেশ! এইভাবে আদর্শ বিপ্লবী যোগেন চক্রবর্তী আমাদের ছেড়ে গেল।”

হাহাকার করে উঠলো অমৃতলালের হৃদয়। অনেক চেষ্টায় অশ্রুদমন করে শান্তস্বরে তিনি বললেন—“ওর কোন পরিচয় নেই ভাই! ওর কোন নাম নেই। ও মা’র অনামী সন্তান। দেহ ওর রক্তরাঙ্গা জবার মত নিবেদিত হয়েছে মা’র চরণে। ওর নাম যোগেন নয়—ওর নাম সমিধ,--ও সমিধ।”

সাংঘাতিক

তার আসল নামটা ঢাকাই পড়ে গিয়েছিল। সকলেই জানত তাকে 'সাংঘাতিক' নামে। হঠাৎ এবম্প্রকাব নাম পরিবর্তনের রহস্যটা সাংঘাতিক হলেও অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। সেই কথাই বলি।

ফরিদপুব শহরের এক প্রান্তে রায় বাবুদের প্রকাণ্ড পাকা বাড়ী। প্রায় তিন বিঘে জমি জুড়ে বাড়ী আর বাগান। বহু নারকেল আর সুপারী গাছ দিয়ে ঘেরা চত্তর মিলানো বাড়ীখানি দেখলেই মনে হয় কোন বনেদি বড় লোকের। এই বাড়ীরই ছেলে যোগেশ আর সুরেশ দুই ভাই। উঁচুতে দুইজনেই ছয় ফুটের কমতো হবেই না দু'এক ইঞ্চি বেশীই হতে পারে। অসম্ভব বকমের কালোও দুইজনেই। ব্যস—এই পর্যন্তই। উভয়ের আকৃতি আর প্রকৃতির এছাড়া আর কোন মিল নেই। যোগেশ হৃষ্টপুষ্ট,—সুরেশ রোগাটে, —যোগেশ আস্ত মিলিটারী,—সুরেশ নিরীহ গোবেচারী।

১৯১২ সালেব শেষে কি ১৩ সালের প্রথমভাগে ঢাকা থেকে দু'জন ভদ্রলোক তাদের বাড়ী এসেছেন। যোগেশ সুরেশ দুই ভাই তাঁদের দেখাশোনা করে। স্থানও দেওয়া হয়েছে তাদেরই পড়ার ঘরে। দিনের বেলায় তাঁরা বাড়ীর বাইরে যান না। সন্ধ্যার পর বেড়াতে বের হন। এটা তেমন অস্বাভাবিক বলে বোধ হয় না। কারণ প্রায় মফঃস্বল শহরের, বিশেষ করে ফরিদপুরের ভদ্র বেকার যুবকদের দস্তুরই তাই। বাত আটটায় জামাটা গায়ে দিয়ে বা কাঁধে ফেলে তাঁরা বেড়াতে বের হন আর বলেন—"না! আর বেলা নাই।"

আগন্তুক যুবকদ্বয়ের পরিচয় ছিল তাঁরা সুরেশদের শিক্ষকের মাসতুতো ভাই। মাষ্টার মশাইকেও মাঝে মাঝে তাঁদের কাছে

আনাগোনা করতে দেখে বাড়ীর সকলেই ভেবে ছিল সত্যিই বুঝি তাই। কিন্তু মাসতুতো ভাইয়ের কথা উঠলে—বিশেষতঃ মাষ্টার মশাই কাছে এলে আগন্তুকরা মুচকি হেসে চোখের ইঙ্গিত করেন—আর ছোট্ট করে বলেন—"চোরে—চোরে—"

তিন চার দিন পরে। আগন্তুকরা একটা ছোট্ট বাণ্ডিল বের করে বললেন—"এটা পৌঁছে দিতে হবে একটি গ্রামে—বার তের মাইল দূরে। কে যাইবা? সুরেশ পারবা না?"

উত্তর দিল যোগেশ। সে বললে—"না—না। ওবে দিয়া হইব না। ও সাংঘাতিক বাছুর বেচারা।"

"বাছুর বেচারা?"—হেসে উঠলেন উভয়েই

আরও জোরের সাথে যোগেশ বললে—"হ—হ—বাছুর বেচারা। গো বেচারা কওন যায় না। কারণ গরুর শিং থাকে,—ঠেকলে তা নাড়ে—আবার গুতাও মারে। সুর্‌য্যার শিং নাই একদম।—কখন যে গজাইব সে সম্ভাবনাও কম।"

আগন্তুকদের একজন বললেন—"তবে তুমিই যাও। কিন্তু দেখো, তাড়া খাইলে লেজ উঠাইয়া বন-জঙ্গলে ঢুইকো না। সেই গ্রামে তোমাকে যাইতেই হইব।"

—"লে-জ-উঠাইয়া-বন-জঙ্গল—। সাংঘাতিক কইছেন"—খিল খিল হেসে বললে যোগেশ। "যাই মা রে কইয়া আসি—"

"কিন্তু মা যখন জিগাইব কৈ যাস"—বাধা দিয়ে বললেন সেই জন।

"মা জানে" উত্তর দিল যোগেশ।

"কি জানে?"

"জানে আমরা বিপ্লবী। তবে ভয় নাই। মা সাংঘাতিক ভালো মানুষ"—

"সাংঘাতিক?"—এক যোগে বললেন আগন্তুকরা।

"হ—সাংঘাতিক—মানে—খু-উব"—হাসিমুখে বললে যোগেশ

"তুমিও সাংঘাতিক"—

সেই থেকে পরিচয়ের পথে যোগেশ গেল হারিয়ে—'সাংঘাতিক' এল এগিয়ে।

কিন্তু এ তো গেল সাংঘাতিকেব সূচনা মাত্র। এবপর থেকে সাংঘাতিক শশীকলার মত দিন দিন বেড়েই চলল।

সমিতির কেন্দ্র থেকে আদেশ এসেছে যোগেশকে বাড়ী ঘর ছাড়তে হবে—ফেরারী হতে হবে। সে ভাইকে ডেকে কথাটা জানিয়ে বললে—"ছ্যাখ সুইরা! আমার ভারি আনন্দ হইত্যাছে। বাড়ীতে রইলে ছ্যাশের কাজে দেহমন উৎসর্গ করা যায় না। বাড়ীতে কিছু না কিছু আরাম আছেই। কিন্তু ফেরারী হইত্যাছে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। দেশই তাগো ধর্ম-কর্ম, দেশই তাগো ধ্যান-ধারণা। উঃ—কী সাংঘাতিক -"

সুরেশ প্রতিবাদ জানিয়ে বললে—"তুমি যাবে যাও। কিন্তু সাংঘাতিকরে অমন আটপৌরে বানাইয়া তার সামাজিক মর্যাদা নষ্ট কইরনা। 'সাংঘাতিক' বলা তোমাব বাতিক হইয়া দাঁড়াইছে।"

"উঃ—তোফা ফাইন বোলছস্ সুইব্যা, —এক্কেরে সাংঘাতিক।" যোগেশ আনন্দে ভাইয়ের পিঠ চাপড়ে দিল।

কয়েক মাস পবে। ফেরারী যোগেশ বায়েব পরিচয়—'সাংঘাতিক'। ঢাকার আড্ডায় এসে জুটেছে সে। তার নিজের বলতে কিছুই নেই। তোষক, বালিশেব তো বালাই নেই ধুতি জামাটাও নেই। প্রয়োজন মত যে কোন ফেবারীব যে কোন ধুতি জামা পরে বাইবে যাচ্ছে। কেউ কাউকে জিজ্ঞাসাও করে না,—কোথায় যান—কখন ফিরবেন। বাসাটা যেন বড় বড় ষ্টেশনের ওয়েটীং রুম। কত লোক আসছে, বিশ্রাম করে আপন আপন গন্তব্যপথে চলে যাচ্ছে -কে কার ঠিকানা রাখে! যোগেশের মন খুশীতে ভরপুর! বাঃ—চমৎকার জীবন!—একেবারে সাংঘাতিক!

আরো চমৎকার এই জন্যে যে কেউ কাউকে চেনেনা। হয়তো

জীবনে এই প্রথম দেখা। অথচ দেখা মাত্র মনে হয় কত ভাল লোক! কত আপনার! সহসা এক একজন এসে—অপরের হৃদয় যেন জুড়ে বসে! দর্শন মাত্রেই প্রণয় সঞ্চার— কোন বাধ-বিচার নেই।

এই জীবন আরো ভালো লাগার সাংঘাতিক কারণ এই যে—জীবনটা হাতের মুঠোয় ধরে—সর্বদাই পথ চলতে হয়। বীরত্বে বঞ্চিত বাঙ্গালীর বাঞ্ছিত সমরাস্ত্র সর্বদাই ফেরে হাতে হাতে। ভোজনে, শয়নে, বিশ্রামে, বিচরণে—সদা সর্বদা আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে সাথে সাথে। বাঙ্গালীর ছেলেরা কি কল্পনা করতে পারে এই জীবন? তারা কি ভাবতে পারে ভেতো বাঙ্গালীর ঘরের আদুরে দুলালরা মৃত্যুকে ভ্রূকুটী দেখিয়ে দুঃখ-দহন পায়ে দলে মারণাস্ত্র হাতে নিয়ে—মরণমারণের নেশায় উন্মত্ত হয়ে—ছুটে চলছে ঝড় ঝঞ্ঝার মাঝে—? ভাবতে ভাবতে শিউরে ওঠে যোগেশ। উঃ—কি—সাংঘাতিক!!

সেদিন বাসায় রবীন্দ্রনাথের "বলাকা" থেকে কবিতা পড়া হচ্ছে। যিনি পড়ছিলেন তিনি চাপা স্বরে অথচ আবেগের সাথে পড়ে যাচ্ছেন—

"ওরে যাত্রী,
ধূসর পথের ধূলা সেই তোর ধাত্রী—।
ঘরের মঙ্গল শঙ্খ নহে তোর তরে,
নহেরে সন্ধ্যার দীপালোক
নহে প্রেয়সীর অশ্রু-চোখ।
পথে পথে অপেক্ষিছে কাল বৈশাখীর আশীর্ব্বাদ,—
শ্রাবণ রাত্রির বজ্রনাদ।
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা
পথে পথে গুপ্ত সর্পফণা—।
নিন্দা দিবে জয় শঙ্খ নাদ—
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ—"

যোগেশ চোখ বুঁজে শুনছিল। যেন গিলছিল অন্তর দিয়ে। হঠাৎ সে বললে—"সাংঘাতিক কবি এই রবীন্দ্রনাথ। কি সুন্দর লিখছে। ভূত ভবিষ্যৎ সব যেন নিজ চক্ষে দেখছে। সত্যই সাংঘাতিক—মানে—সুন্দর।"

সকলে হো হো করে হেসে উঠল সাংঘাতিকের বহর দেখে।

'সাংঘাতিক' নামে সদাসর্বদা ডাকা খুব অসুবিধা। তাই বাসার বন্ধুরা ডাকেন 'সাংদা'। অসীম শক্তি তার গায়ে। বসে দুই হাতের মুঠোর ওপর দুজনকে চড়িয়ে হাত টান করে অবলীলাক্রমে খাড়া হতে পারে। চিৎ হোয়ে শুয়ে। পাঁচ ছজন চেপে ধরেছে হাত, পা, বুক, কোমর। সাংদা দুহাত ওঠালে—এপারের মানুষ ওপারে ছিটকে পল—আর ওপারের মানুষ এপারে। আবার সকলে ধরলে চেপে। সকলকে নিয়েই উঠে পল সাংদা। কাঁঠালগাছে যেন কাঁঠাল ঝুলছে।

আর একদিন তার দৈহিক শক্তির চমৎকার পরিচয় পাওয়া গেল।

কি একটা গুরুতর কাজের ভার নিয়ে ঢাকা থেকে কুমিল্লা চলেছে সাংদা। সাথে আছে দলের জঙ্গী-বিভাগের অন্যতম নায়ক বীরা চ্যাটার্জি—আর একজন। ট্রেণে চেপেই সাংদা উপরের বাংকে উঠে শুয়ে প'ল চাদর মুড়ি দিয়ে। দু'তিন ষ্টেশন গিয়ে আর এক বন্ধুও ওপরে উঠতে গেলেন। কিন্তু তাঁর পা এক ভদ্রলোকে' মাথায় লাগল। তখন তিনি হাতযোড় করে ক্ষমা চাইলেন—ভদ্রলোকও ক্ষমা করলেন। কিন্তু তাঁর হয়ে অপর একজন যাত্রী লম্ফ ঝম্ফ জুড়ে দিল।

—"অভদ্র—ইতর কোথাকার। লাগতো আমার মাথায়—দেখাইয়া দিতাম মজাটা।"

বীরাদা নীচেই ছিলেন, তিনি হাসিমুখে বললেন—"যাউক গিয়া। ছাড়ান স্থান্। আপনার মাথায় তো লাগে নাই। যাঁর মাথায় লাগছে— সে ক্ষমা করছে ভদ্রলোকরে।"

—"ভদ্রলোক? এরে কন্ ভদ্রলোক? চোখ নাই কপালে? আমার মাথায় লাগলে—কান ধইরা আনতাম নামাইয়া"—উত্তেজনায় লোকটি দাঁড়িয়ে পল। তার হম্বি তম্বি শুনে কামরা সমেত সকলের দৃষ্টি গেল সেইদিকে। অকস্মাৎ সকলে দেখতে পেল ওপর থেকে গোদা গোছের একখানা পা বেড়ে এসে লোকটির মাথায় দু'বার ছুঁয়ে ধীরে আবার ওপরে উঠে গেল।

লোকটি এবার রাগে ফেটে পল। অশ্রাব্য গালিগালাজ করতে করতে চাদর ধরে টানাটানি সুরু করল। বীরাদা বললেন—"ও মশয়! থাইমা যান—চুপ ছান। দেখছেন নি পায়ের গোছাটা—"

কিন্তু কে কার কথা শোনে। একটা হেস্তনেস্ত করবেই লোকটি। সে সবলে টানতে লাগল চাদরখানা। এবারে দেখা গেল চাদর ঢাকা শোয়া মানুষটি কিঞ্চিৎ কাৎ হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই একখানা হাত প্রসারিত হয়ে এসে ক্যাঁক করে লোকটির ঘাড় চেপে ধরে তাকে প্রায় একহাত শূন্যে উঠিয়ে নিল। লোকটি ঝটপট করে ঝুলতে লাগল। তারপর তাকে ছেড়ে দিয়ে হাতটি চাদরের মধ্যে পুনরায় ঢুকে পল। লোকটি তুলোর বস্তার মত পড়ে গেল কামরার মেঝেতে।

বীরাদা লোকটিকে উঠিয়ে মৃদুস্বরে বললেন—"আহা! লাগে নাই তো?"

কামরার সব লোক হেসে উঠল হো হো করে।

ঢাকায় অবস্থান কালে সাংদা পূর্ববঙ্গে বহুসংখ্যক খুন ডাকাতি প্রভৃতি দুঃসাহসিক কর্মে অংশ গ্রহণ করেছে। তার চেহারাই ছিল এক বিভীষিকা। জ্যোছনা রাতের আঁধার আলোর আবছায়ায় যদি খালি গায়ে পথের মাঝে দাঁড়ায়, ছেলে পেলেরা তো দূরের কথা তাদের বাপ দাদা পর্যন্ত আঁৎকে উঠবে তাকে দেখে। এই প্রকার দৈত্যদানা চেহারার বড় একটা জুড়িদার ছিল না। বোধহয় সেজন্যে সাংদার মনে বেশ একটু গর্বোদয় হয়েছিল। তাই গর্বহারী শ্রীহরির বিধানে অচিরেই তার পাশে দোসর এসে হাজির হল। যে এল তার

নাম ক্ষীরোদ ঘোষ। তাকে দেখেই সাংদা রোষে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। একদিন বীরাদা দুজনকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে হাসি-মুখে বললেন—"কে, বাবা তোমরা ? শুম্ভ-নিশুম্ভ ? সুন্দ-উপসুন্দ অথবা চণ্ড-মুণ্ডের কলিযুগ-সংস্করণ ?"

ব্যস—আর যায় কোথা। সেইদিন থেকে সাংদার নাম পালটে চণ্ড হল আর ক্ষীরোদের নাম মুণ্ড। নৌকাযোগে য্যাকশানে যেতে হলে চণ্ড ও মুণ্ড বসত দাঁড়ে। নৌকা যেন উড়ে যেত ঝড়ে। আর চণ্ড মুণ্ড মনের সুখে গলা ছেড়ে গান ধরত—

ময়ূরপংখী নাও আমাগো ঝড়ের বেগে যায়—
আর হাইলে বইসা বুড়া মাঝি মিটির মিটির চায়।

আনন্দে দিশাহারা চণ্ড প্রচণ্ড বেগে দাঁড় চালায় আর চীৎকার কোরে বলে -"ও মুণ্ডা! জোরসে চালা। হেঁইয়া হুঁঃ -হেঁইয়া হুঁঃ—

নৌকা যত বেগে যায়—তার চেয়েও বেগে যায় চণ্ডের মন। চোখের সামনে সে দেখতে পায় প্রকাণ্ড দালান বাড়ী। অন্দর মহলে সিন্দুক সাজানো সারি সারি। মুণ্ড ধরেছে ছেনি—চণ্ড হাতুড়ী। হাতুড়ীর ঘায় লহমায় সিন্দুকের ডালা কেটে যায়। বিভীষিকাময় আবহাওয়ার মাঝে ভীষণ দর্শন চণ্ড-মুণ্ডকে দেখে পুরনারীরা মূর্ছা যায়,—পুরুষেরা ভয়ে খাবি খায়।

কিন্তু অকস্মাৎ চণ্ডের সুখের হাট ভেঙ্গে গেল ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। ভারতব্যাপী বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান হবে,—সেনাপতি পদে বৃত হয়ে বিদ্রোহী বাহিনীর নায়কত্ব করবে চণ্ড ;—আঘাতের পর আঘাতে চুরমার করে ভেঙ্গে ফেলবে পরাধীনতার বন্দীশালা,—সেই আশায়—শুধু সেই আশায়ইতো সে দস্যুতার হীনতাকে বরণ করে নিয়েছে। কিন্তু বিরাট ভূমিকম্পে তার সেই সাধের সৌধ ধূলিসাৎ হল। বিপ্লবীদের সব আয়োজন পণ্ড হল কৃপাল সিংএর বিশ্বাসঘাতকতায়। লাহোর, দিল্লী, বেনারস, বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা

ছিন্নভিন্ন করে দিল বিপ্লবের আয়োজনকে। কাশীর কর্মীরা প্রায় সকলেই ধরা পড়লেন—যাঁরা পড়লেন না তাঁরাও দলের নির্দেশে বাংলায় এসে আশ্রয় নিলেন।

কিন্তু নিরাশ হলে তো চলবেনা। আবার সব গড়তে হবে, আবার আয়োজন পূর্ণ করে আঘাত হানতে হবে শত্রুর বুকে। এবং তা অবিলম্বে—যুদ্ধ চলার মাঝেই।

দলের নির্দেশে চণ্ড গেল কাশীধামে। সেখানে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে সে পুরাতন বিপ্লবীদের সন্ধান এবং নূতন করে দল গঠনের চেষ্টা করতে লাগল। রামকৃষ্ণ মিশনের কাশী শাখার জনৈক সন্ন্যাসী সমিতির সভ্য ছিলেন। তাঁর সাথে সে আগেই দেখা করেছে বাংলা থেকে নিয়ে যাওয়া পরিচয় পত্রের সাহায্যে।

মিলিটারী মানুষ,—সংগঠনেব জাল বোনা কারীগরী আয়ত্ত করতে হচ্ছে অবস্থার চাপে। মাঝে মাঝেই মনে হয়—দূর ছাই! কামারকে দিয়ে কি আর জোলাব কাজ চলে!

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয় বাছা বাছা বিপ্লবীরা হয় ফাঁসিতে বা গুলিতে প্রাণ দিয়েছে, নয় আন্দামানে, কারাগারে পচে মরছে। আজ তাদেব অভাবেই কি হবে জাতির সংগ্রামের অবসান? না—না—হতে পারেনা। আজ চিন্তা করার অবসর নেই কে শিল্পী—কে সৈনিক। পরাধীনতার জ্বালা দহন করবে যার অন্তর—আজ সেই হবে অগ্রসর। দেশমুক্তির প্রয়োজনে শিল্পী হবে সৈনিক,—সৈনিক হবে শিল্পী।

চণ্ড আবার লেগে যায় কাজে, পূর্ণোদ্যমে।

কিন্তু ব্যর্থ হল তার সাধনা। হঠাৎ প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়ে সে বেহুঁশ রইল তিনদিন। তারপর সর্বাঙ্গে বসন্তের গুটী দেখা দিল। অবস্থা দেখে বাড়ীওলা তাকে ঘর থেকে বের করে নামিয়ে দিল পথে। প্রচণ্ডবিক্রম চণ্ডের আজ কোন শক্তি নেই উঠে দাঁড়াবার। পথের ধারে শুয়ে প'ল সে।

বোধহয় কোন সহৃদয় পথচারী খবর দিয়েছিল রামকৃষ্ণ মিশনে। ওটা সেবার প্রতিষ্ঠান—একথা সকলেই জানে। খবর পেয়েই মিশনের সন্ন্যাসীরা এসে চণ্ডকে পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে গেলেন আশ্রমে।

দুই তিন দিনের মধ্যেই রোগী ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে এসে পৌঁছালো। সর্বাঙ্গ ফেটে ফেটে গেল,—বিকারের লক্ষণ দেখা দিল। চণ্ডের ভিতরে যে প্রচণ্ড দৈহিক শক্তি ছিল, যা রোগের প্রথম আঘাতে হয়েছিল মুহ্যমান—এবার বিকারের ঘোরে তা' পূর্ণতেজে দেখা দিল। মাঝে মাঝে লাফিয়ে ওঠে সে। তিন চার জনে ধরাধরি করে আবার শুইয়ে দেন। কখন কখন উঠে বসে রক্ত চক্ষুতে ভ্রূকুটী করে শূন্যে মুঠি বাগিয়ে চীৎকার করে বলে—

"এখন সেদিন নাহিকরে আর—
দেব আরাধনে ভারত উদ্ধার—
হবে না—হবে না—খোলা তলোয়ার—
এসব দৈত্য নহেরে তেমন"—

"I shall die or drive the Britishers out of India—I must break the chain—"

শঙ্কিত হলেন সন্ন্যাসীরা। রোগীকে তাঁরা পালা করে পাহারা দিতে লাগলেন।

একদিন দুপুর বেলা। রোগী একটু ঘুমাচ্ছে। এই অবসরে শুশ্রূষারত সন্ন্যাসী খেতে গিয়েছেন। ফিরে এসে তিনি দেখেন বিছানায় রোগী নেই। এঘর ওঘর খুঁজে দেখে চার পাঁচজন হৈ চৈ করে বের হলেন পথে। প্রায় একশো গজ দূরে চৌরাস্তার মোড়ে একটা কলরব শুনে তাঁরা সেই দিকে ছুটলেন। কিছুদূর যেতে না যেতেই তাঁরা শুনতে পেলেন কে যেন চীৎকার করে জড়িত কণ্ঠে বলছে—"That's John Bull—I must fight him—"

বহুলোক ভিড় করে হৈ চৈ করছে। ভিড় ঠেলে ভিতরে গিয়ে

দেখেন তাঁরা,—তাঁদের সেই রুগী আক্রমণ করছে একটা ষাঁড়কে। ষাঁড়ে মানুষে লড়াই চলছে,—রুগীর সর্বাঙ্গ দিয়ে অজস্র ধারায় রক্ত ছুটছে। সভয়ে দেখল সকলে, বীভৎস দেহ বসন্তের রুগী পৈশাচিক অট্টহাসিতে চতুর্দিক মুখরিত করে ঝাঁপিয়ে পল ষাঁড়ের ওপর, কামড়ে ধরল ষাঁড়ের ঘাড়। পরক্ষণেই ষাঁড়ের আক্রমণে তার প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পল ধরায়। সমবেত জনতা হায় হায় করে উঠল,—সন্ন্যাসীরা চোখে আঁচল দিয়ে কান্না চেপে বললেন—"উঃ—কি-ই সাংঘাতিক"।

নীরব সাধক

বিশ্বব্যাপী মহাসমরের সম্ভাবনা নিয়ে দেখা দিল ১৯১৪ সাল। য়ুরোপখণ্ডে আর আমেরিকায় যে সব ভারতীয় বিপ্লবী ছিলেন তাঁরা ভারতে খবর পাঠালেন এই সম্ভাবনার। জানালেন, ইংরাজের সাথে জার্মাণদের যুদ্ধ বাধবে অচিরেই,—প্রস্তুত হও বন্ধুগণ! মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনের এই অবসর।

তৎপর হয়ে উঠল বাংলার বিপ্লবীরা। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের তেরটি বিপ্লবীদল মিলিত হল মহানায়ক যতীন্দ্র মুখার্জী ওরফে বাঘা যতীনের নেতৃত্বে। এই তেরটি দলের মধ্যে কলকাতার অনুশীলন, আত্মোন্নতি সমিতি, মাদারীপুরের শ্রীযুত পূর্ণ দাসের দল আর বরিশালের স্বামী প্রজ্ঞানন্দের দলের সভ্যগণ নেতৃত্বের যোগ্যতায়, সাহসিকতায়, বৈপ্লবিক আগ্রহে অনন্যসাধারণ কুশলতার পরিচয় দিয়েছে। সবচেয়ে বে-পরোয়া ছিল মাদারীপুরের দল। সভ্যেরা সর্বদাই সাংঘাতিক কিছু করার আগ্রহে টগবগ করে ফুটত।

মহাযুদ্ধ আগত প্রায়। একটা কিছু করার আগ্রহে অধীর হয়ে উঠল বিপ্লবীরা। যতীন্দ্রনাথ, অমর চাটুজ্যে, নরেন ভট্টাচার্য (মানবেন্দ্র), চন্দননগর দলের মতিলাল রায়, শ্রীশ ঘোষ, ঢাকা অনুশীলনের মাখন সেন, নরেন সেন, প্রভৃতি বিপ্লবী নায়করা প্রায়ই মিলিত হয়ে ইতি কর্তব্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগলেন। স্থির হ'ল হানতেই হবে চূড়ান্ত আঘাত এই সুযোগে। অস্ত্র চাই, অর্থ চাই, লোক চাই। চঞ্চল হয়ে উঠলেন যতীনদা।

১৯১৪ সালের মার্চ কি এপ্রিল মাস। সন্ধ্যাকাল। কলকাতার মলঙ্গা লেনের একখানি বাসায় সবেমাত্র দুই ডেলা ভাং বাঁটা আর এক গ্লাস বাদাম পেস্তা দেয়া ভাং-সরবৎ খেয়ে বুঁদ হয়ে বসে আছেন অনুকূলদা। খর্বাকৃতি অথচ প্রশস্ত বক্ষ, পেশীবহুল বলিষ্ঠ গঠন,—

দেহ অনাবৃত। তেজোদ্দীপ্ত মুখমণ্ডল,—শার্দুলের দৃষ্টি চক্ষুতে। গোঁফ জোড়া চুমড়ে উর্ধে তুলেছেন কাইজারী প্যাটার্ণে। গম্ভীর হয়ে বসে আছেন তিনি। মাঝে মাঝে হাসছেনও আপন মনে। পাশেই রয়েছেন গিরীন্দ্র আর নরেন ব্যানার্জি।

নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করলেন যতীনদা। ধীরে ধীরে বললেন তিনি—"অনুকুলবাবু! কোন ব্যবস্থা হ'ল arms-এর ?"

"ইয়েস ম্যাডাম! হোতা"—না দেখেই জবাব দিলেন অনুকুল-বাবু। পরক্ষণেই যতীনদাব দিকে দৃষ্টি পড়তেই জিভে কামড় খেয়ে মাথা চুলকাতে লাগলেন তিনি। অবস্থা অনুমান করে ধীবে ধীরে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন যতীনদা।

গিরীনবাবু আর নরেনবাবু নিঃশব্দে হাসতে লাগলেন। অনুকুলদা উষ্মার স্বরে বললেন—"কেবল হাসতে পার ফিক্ ফিক্ করে মেয়েদের মত। বলতে পারনি কে ঘবে ঢুকেছে! দেখতো—কি বিভ্রাট হয়ে গেল!"

—"অবসর পেলুম কৈ! ম্যাডাম্ আপনার মুখে লেগেই আছে" —জবাব দিলেন গিরীনবাবু।

—"হুঁঃ—এখন কাজে লাগো জোর করে। চীনেম্যান বেটারা বড্ড দাম চায়। ফিরিঙ্গী খালাসীদের কাছে পাচ্ছি কিছু কিছু। কিন্তু পুলিশ বড্ড পিছে লেগেছে। শ্রীশ—শ্রীশের কাছে খোঁজ নাও। বল তাকে করতেই হবে যোগাড়। যতীনদাকে কথা দেয়া হয়েছে। চালাকি চলবেনা"—বললেন অনুকুলদা।

শুরু হল শ্রীশের কাছে আনাগোনা। সে ড্যাল্‌হৌসি রো'তে রডা কোম্পানীর বন্দুকের দোকানে কাজ করত। তার কাছে ঘন ঘন যাওয়াও বিপদ। সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে,—স্পাই লাগতে পারে। শ্রীশ বলেছে—"ব্যস্ত হবেন না অনুকুলদা! সুযোগ এলেই সদ্ব্যবহার করা হবে। নিশ্চিন্ত থাকুন।"

—"দেখ হাবু! গরজ বড় বালাই! আমি প্রতিদিন তাগিদ

তুমি সুসংবাদ দিবে,—আমি ছুটে যাব যতীনদার কাছে,—আমার কথা শুনে আনন্দের হাসিতে ভরে উঠবে তাঁর মুখ। কিন্তু দিনের পর দিন যায়,—সপ্তাহের পর সপ্তাহ,—মাসের পর মাস,—আর—আর আমি নিরাশ হয়ে পড়ি। মনে হয় সুযোগ বুঝি আর আসবে না।" হতাশভাবে বললেন অনুকুলদা।

অবশেষে এল সুযোগ আগষ্ট মাসের শেষে। বিদেশ থেকে এক চালান মাল এল রডা কোম্পানীর। এব মধ্যে ছিল পঞ্চাশটি মশার পিস্তল আর প্রচুর গুলি। ফার্মের বড় সাহেব শ্রীশকে পাঠালেন মালগুলি খালাস করে আনতে। দোকান থেকে বেরিয়েই শ্রীশ সোজা গেল অনুকুলদার বাসায়। তিনি তখন সবে মাত্র স্নান সেরে একখানা লুঙ্গি পরে চুল আঁচড়াচ্ছেন আব বাঁ হাতে ছোট্ট একখানা আয়না ধরে চোখ মুখ খিঁচিয়ে চাপা গলায় গান গাচ্ছেন—

"পালারে পালা শমন। এই না দেশে গৌব এল,
গৌর এল, নিতাই এল, গৌব নিতাই দুভাই এল"—
—"হ্যাঁ—অনুকুলদা! দুভাই-ই এসেছে"—

চমকে উঠে পাশ ফিরে চাইতেই অনুকুলদা দেখতে পেলেন শ্রীশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে।

"What Madam ?"—সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন অনুকুলদা। শ্রীশ হাসতে লাগল। অনুকুলদার Madam ওদের গা-সহা হয়ে গিয়েছে।

ফিসফাস করে শ্রীশ বললে—"শমন এবাব পালাবে, অন্ততঃ ছুটাছুটি করবে। কারণ গৌর নিতাই—অর্থাৎ মশার পিস্তল আর বুলেট দু'ভাই-ই এসেছে।"

খাঁ করে দুহাতে শ্রীশের কটিদেশ ধরে অনুকুলদা তাকে পুতুলের মত উঠালেন শূন্যে, তার দিকে চেয়ে বললেন "Get up—Get up—Shoulder—Shoulder—কাঁধ—কাঁধ"—

পরক্ষণেই নামিয়ে দিলেন।

চটপট পরামর্শ সেরে শ্রীশ গেল চলে।

দশখানা গাড়ি বোঝাই করে জেটি থেকে এল মাল। তার মধ্যে নয়খানা যথারীতি রডার দোকানে পৌঁছে গেল। কিন্তু যে খানিতে ছিল পঞ্চাশটা মশার পিস্তল আর নয় বাক্স পিস্তলের গুলি সেই গাড়ি-খানির পাত্তা পাওয়া গেলনা। আর তার সাথে সাথে পাত্তা পাওয়া গেল না—শ্রীশ সরকারের।

রডা কোম্পানীর বড় সাহেব রাগে গর্‌গর্‌ করে গর্জন করলেন—বিশ্বাসঘাতক।

টেগার্ট, বার্ড প্রভৃতি পুলিশ পুঙ্গবরাও সায় দিয়ে বললেন—বিশ্বাসঘাতক। এদিকে যতীন মুখার্জি, বিপিন গাঙ্গুলী প্রভৃতি বিপ্লবী নায়করা বললেন—'নীরব সাধক।'

পঞ্চাশটি মশার পিস্তল আর প্রচুর পরিমাণ গুলি! ফুলে উঠল বিপ্লবীদের বুক। বিপ্লবীদের নয়টি বিভিন্ন কেন্দ্রে ক্ষিপ্রতাব সাথে বিলি করা হল ওগুলি। যতীনদা বললেন—"এবারে চাই অর্থ। শক্তি পরীক্ষার দিন আসন্ন।"

অতুল ঘোষ ও নরেন্দ্রের নায়কত্বে চিত্তপ্রিয়, নীরেন, মনোরঞ্জন, রাধারমণ আরও জনকতক বিপ্লবী অর্থ সংগ্রহে হল অগ্রসর। সন্ধান পেল তারা সাউথ ইণ্ডিয়া জুটমিলের আঠারো হাজার টাকা বার্ড কোম্পানীর অফিস থেকে যাবে বদরতলায়! প্রকাশ্য দিবালোকে লুটে নিল তারা সেই টাকা গার্ডেন রীচের কাছে। পুলিশ মহলে হৈ চৈ পড়ে গেল। ছুটোছুটি করতে লাগল সি, আই, ডি-রা।

এই ঘটনার ঠিক দশ দিনের মাথায় আরও একটি ভীষণ ডাকাতি অনুষ্ঠিত হল কলকাতার বুকে। চাউলপট্টি রোডের ললিত মোহন বৃন্দাবন সাহার গদিতে হানা দিয়ে একদল যুবক বাইশ হাজার টাকা লুটে নিয়ে ট্যাক্সিতে উধাও হল।

পুলিশ সন্দেহে গ্রেপ্তার করল অতুল ঘোষ, নরেন্দ্র, রাধারমণ, আরও কয়েকজনকে। চলতে লাগল তদন্ত।

কিন্তু বড়ই প্রয়োজন নরেন্দ্রের। যতীনদা ব্যস্ত হলেন তার মুক্তির জন্য। তাকে পাঠাতে হবে বিদেশে। জার্মান সমর নায়কদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে আনতে হবে প্রচুর অর্থ, প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র জাহাজ ভরে। এ কাজে নরেনের যোগ্যতা সর্বাধিক। তাকে আনতেই হবে বাইরে। কিন্তু কি করে?

উপায়ান্তর না দেখে যতীনদা সরকারী উকিলের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে জানলেন যদিও নরেনের বিরুদ্ধে তেমন কোন জোরালো প্রমাণ নেই, তবুও জামীন পাবার ভরসা কম। তবে যদি কেউ স্বীকারোক্তি করে সব দোষ নিজের ঘাড়ে টেনে নেয় তা হ'লে হয়তো নরেন জামীন পাবে।

মাদারীপুর দলের নায়ক পূর্ণদাস মহাশয় কয়েকদিন পূর্বে ধরা পড়ে প্রেসিডেন্সি জেলেই আটক ছিলেন। যতীনদা তাঁকে সব অবস্থা জানিয়ে অনুরোধ করলেন একটা ব্যবস্থা করার জন্যে।

চিন্তিত হলেন পূর্ণবাবু। অনেক ভেবে চিন্তে সিপাহী জমাদারকে হাত করে তিনি বিচারাধীন বন্দী রাধারমণের সাথে দেখা করলেন। রাধারমণ তাঁর অনুগত ভক্ত শিষ্য।

সব কথা শুনে চমকে উঠল রাধারমণ। বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেল সে। পূর্ণবাবুর মুখের দিকে কিছুক্ষণ অর্থশূন্য অচল দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে জড়িত কণ্ঠে বললে সে—"স্বীকারোক্তি? কনফেশন?"

"ভয় পাচ্ছ?" প্রশ্ন করলেন পূর্ণবাবু।

রাধারমণ মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিল—"না।" ব্যথিত কণ্ঠে জানালে ভয়ের কথা সে জানেনা। সে শিক্ষা পূর্ণবাবুর কাছে সে পায়নি। জীবনটাকে সে হাসি মুখে বিসর্জন দিতে পারে এখনই। কিন্তু স্বীকারোক্তি! সে কেমন করে সহ্য করবে পুলিশ, সি, আই, ডি-রা যখন তাকে বাহবা দেবে—আপনাদের লোক ভেবে কথা বলবে,—যখন তার অন্তরঙ্গ সহকর্মীরা তাকে দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে,—মনে মনে ভাববে—ঐ বিশ্বাসঘাতক!

তাকে জড়িয়ে ধরলেন পূর্ণবাবু। সস্নেহে বললেন -"ভুল বুঝো না ভাই, ভুল কর না। তুমি বিপ্লবী। শুধু দেহ নয়, শুধু জীবন নয় —চিত্তও যে তুমি উৎসর্গ করেছ বিপ্লবের সাধনায়। লক্ষ্য যার স্থির,—নিন্দা, স্তুতি, সুযশ, কলঙ্ক কোন কিছুতেই তাকে অস্থির হলে তো চলবে না। শুধু জীবন নয় রাধারমণ। তোমার বলতে যা কিছু আছে সবই দিতে হবে মা'কে। পড়নি আনন্দমঠে—"জীবন তুচ্ছ, সকলেই দিতে পারে। চাই—ভক্তি।"

সম্বিৎ ফিরে পেল রাধারমণ। পূর্ণবাবুকে প্রণাম করে সে বললে— "আর কোন দ্বিধা নাই। দলের প্রয়োজনে আমি করব স্বীকারোক্তি। যার যা খুশী বলুক,—আমি গ্রাহ্য করি না—করুক ঘৃণা—বলুক বিশ্বাসঘাতক—"

বাধা দিয়ে পূর্ণবাবু বললেন—"কে বলে তোমাকে বিশ্বাসঘাতক? তোমার অনুপম আত্মত্যাগ একদিন না একদিন অজানার আবরণ ভেদ করে মহিমায়, গরিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে,—উত্তর কালের বিপ্লবী বাংলা তোমার দিকে নির্নিমেষ বিস্ময়ে চেয়ে বলবে আত্মত্যাগী নীরব সাধক।"

বহু নামকরা ভাল ছেলেকে ডিঙ্গিয়ে প্রথম বিভাগে এফ, এ, পাশ করে, শ্রীমান রমেশ আচার্য সকলকে তাক লাগিয়ে দিল। যে ছেলে দলে মিশে শুধু হৈ হৈ করে বেড়ায়—পড়াশোনা—সযত্নে এড়ায়, সে যে পাশ করতে পারে, তাও আবার প্রথম বিভাগে, এটা কারো ধারণাতেই আসেনি। দু'দিন আগে অনেকেই বলেছেন—"রমেশ? যদি পাশ করে আমার নামে ছাগল পুষো," অথবা—"আমার কাণ কেটে কুকুরের গলায় ঝুলিয়ে দিয়ো।" কিন্তু পরীক্ষার ফল বের হবার পর তাঁরাই আবার রমেশের পিতাকে বলেছেন—"বলিনি তোমাকে? রত্ন হে রত্ন তোমার ছেলে। ঠিক জেনো ভায়া! তোমার ছেলে কুড়ি টাকার জলপানি পেত। দল ছাড়াও,—অমি বলে রাখছি তোমার রমেশ বাপ দাদা চোদ্দ পুরুষের নাম রাখবে।"

চিন্তিত হলেন রমেশের পিতা। ছেলে স্বদেশীদলে মিশে লেখা-পড়ার পরিবর্ত্তে অস্থিরচিত্তে হামেশা "তামেচা, বাহেরা, চির, শির," করে বেড়ায় এটা তিনি বরদাস্ত করতে পারছিলেন না! দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে স্ত্রীকে বললেন—"ছেলেটার মাথা ছিল,—দলই ও'র মাথা খেল! আর এখানে না। এবারে দিই কলকাতায় পাঠিয়ে। সেখানকার কলেজেই ভর্ত্তি হোক। এখানে থাকলে দলে পড়ে বখে যাবে!"

দিন ক্ষণ দেখে বিশ্বাসী লোকের সাথে রমেশকে কলকাতায় পাঠানো হ'ল। ভর্ত্তির ফি, বই কেনা, বোর্ডিংখরচা ইত্যাদিতে প্রায় একশো টাকাও সাথে দেওয়া হ'ল। কলকাতা পৌছানোর তিন চারদিন পরই রমেশ একখানা পত্র পেল। সমিতির নায়ক শ্রীনরেন সেন ঢাকা থেকে লিখছেন—"অবিলম্বে ফিরে আসুন। বিশেষ জরুরী কাজে আপনাকে অন্যত্র যেতে হবে।"

চিঠি পেয়েই রমেশ ছটফট করতে লাগল। কি করে ফিরে

যায়, কি করে এড়ানো যায় সিধু কাকাকে, কি করে তাঁকে ফেরত পাঠানো যায় বাড়ীতে। দিনরাত সে মাথার ভেতর হাজার রকম ফন্দি আঁটে। কিন্তু সিধুকাকার সিধে বুদ্ধির কাছে সব ফন্দি-ফিকির ব্যর্থ হয়। রমেশ অধৈর্য হয়ে ভাবতে থাকে—ততঃ কিম ?

একদিন রমেশ বললে—"সিধকা। আপনার আর শুধু শুধু থাকার কোন দরকার নাই। কয়েকদিনের মধ্যেই আমি ঠিক ভর্ত্তি হয়ে যাব।"

সিধুকাকা জবাব দেন—"যেদিন ভর্ত্তি হবে,—সেইদিনই আমি চলে যাব।"

পরের দিন চটপট খাওয়া-দাওয়া সেরে সিধুকাকাকে সাথে নিয়ে রমেশ সিটি কলেজে গেল। একটু বেশী বয়েসের একটি ছেলেকে দেখে রমেশ তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—ভর্তি হবার ব্যাপারে কোন সাহায্য করতে পারেন কিনা। ছেলেটি খুব সহানুভূতির সাথে বললে—"ও—আপনি মফঃস্বল থেকে আসছেন বুঝি,—ইষ্ট-বেঙ্গল ? এইখানে একটু অপেক্ষা করুন—আমি লাইব্রেরী থেকে সব জেনে আসছি।"

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে একখানি ফরম্ এনে রমেশের হাতে দিয়ে বললে—"এটা পূরণ করে কাল আমার হাতে এইখানেই দিয়ে যাবেন—আর দশবারো দিন পর খোঁজ নেবেন। আর্টসের সীট খুব কমই আছে,—তবে আমি সব ঠিক করে এলাম, আর বেগ পেতে হবে না।"

বোর্ডিং-এ ফিরে এসে রমেশ বললে—"সিধকা। সব তো ঠিক হয়ে গেল। আর মিছেমিছি আপনার বসে থাকার দরকার কি ?"

সিধুকাকা এবার আশ্বস্ত হয়ে বললেন—"তাহলে আমি আজই যাই। বড় সুন্দর তো ঐ ছেলেটি। কলকাতায় এমন ছেলেও থাকে ? শুনছিল্লাম এডা ঠগ জুয়াচোর ধাপ্পাবাজের দেশ।" কি যেন একটু ভেবে নিয়ে আবার বললেন—"হঃ—আমি আজই যাই।"

মাথা দিয়ে রমেশ বললে—"বাঃ—আপনি তো খুব মজার লোক! কলকাতা এলেন, চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, হাবড়ার পুল, পরেশনাথের মন্দির, মনুমেন্ট—এমন কি হাইকোর্ট পর্যন্ত দেখলেন না, আর আজই চলে যাবেন? লোকে বলে—বাঙালকে হাইকোর্ট দেখানো! তাই না দেখে আপনি চলে যাবেন? দুদিন থেকে সব দেখে পরে যাবেন। শিয়ালদা থেকে প্রতিদিনই ঢাকা মেল ছাড়ে।"

রমেশের কথায় সিধুকাকার মন গলে গেল! কি চমৎকার ছেলে এই রমেশ! কত বুদ্ধি বিবেচনা! কিন্তু অনেক বুদ্ধি বিবেচনা করেই যে চমৎকার ছেলে রমেশ ততোধিক চমৎকার চালটা চেলেছে সিধুকাকা তা কল্পনাও করতে পারেন নি। কলেজে যে ছেলেটির সদয় ব্যবহারে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন সে যে রমেশেরই দলের লোক,—তার সাথে দেখা হওয়া, তার আশ্বাস দেওয়া সবই যে পূর্বনির্দিষ্ট ব্যবস্থা মতই হয়েছে, একথা বেচারা সিধুকাকা কেমন করে টের পাবেন? সবটা এমন অত্যন্ত সহজ ভাবেই ঘটল--যে এর স্বাভাবিক গতিতে একটুও জড়তা বা আকস্মিকতা ছিল না।

সিধুকাকাকে ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে রমেশ ফিরে এল বোর্ডিংয়ে। ঘরের দোর বন্ধ করে বিছানায় গড়িয়ে গড়িয়ে একা একাই খুব একচোট হেসে নিল সে। খুশী যেন উপচে পড়ে।

কিন্তু কেন? এই খুশী—এই আনন্দের কারণটা কি? কোন বস্তুকে উপলক্ষ্য করে এর প্রকাশ? রমেশকে কলেজে পড়ানোর উদ্দেশ্যে তার পিতা তাকে কলকাতায় পাঠিয়েছেন। পিতৃ হৃদয়ের অপরিসীম স্নেহের স্বাভাবিক দাবী—রমেশ লেখাপড়া শিখবে, মানুষ হবে, বিত্তশালী হবে, জীবনের গতিপথে নিরুদ্বেগে স্বচ্ছন্দে চলার যোগ্যতা অর্জন করবে। রমেশও মনে-প্রাণে পিতাকে ভক্তি করে, —লেখাপড়া শিখে দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভের আকাংখাও পোষণ করে অন্তরে। কিন্তু পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে বিপ্লবসমিতি। সে এই সমিতির একজন বিশিষ্ট কর্মী। বিপ্লবীদলে যোগ দেওয়ায় তার

আত্মাভিমুখী জীবন গতির মোড় সম্পূর্ণ ঘুরে গিয়েছে। দেশাত্মবোধের চরণে আপনাকে অঞ্জলি দিয়ে সে এক অভিনব আনন্দের সন্ধান পেয়েছে। নিজের সুখ-সমৃদ্ধি, নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যত,—তার মোহময় কল্পনা সব পায়ে দলে সে কি এক অসীম তৃপ্তি! ঠিক যেন ছিন্নমস্তা নিজ হাতে নিজের গলা কেটে রুধির ধারায় ধরণীকে সিক্ত ও সঞ্জীবিত করে অপার আনন্দে ধেই ধেই নৃত্য করে চলেছে।

যেদিন রমেশ ঢাকায় ফিরে এল তার পরের দিনই কলেজে ভর্তি হবার শেষ তারিখ। সোজাসুজি নরেন সেনের সাথে সে দেখা করলে। পকেটে ছিল প্রায় আশী টাকা। নরেনবাবু রমেশের পকেট থেকে সবটাই বের করে নিলেন। অন্তত: হোটেল খরচার চোদ্দটি পয়সা ফেরতের জন্যে রমেশ আবেদন জানালে।

নরেনবাবু হেসে বললেন—"বাড়ী হইতে খাইয়া আইলেই তো পয়সা কয়টা বাঁইচ্চ্যা যায়।"

অগত্যা রমেশ বাড়ীতেই ফিরে গেল। পিতার সাথে সাক্ষাতে যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হবে, মনে মনে তার জন্যে প্রস্তুতও হ'ল।

পিতা তাকে দেখেই যুগপৎ বিস্ময় এবং ক্রোধে ফেটে পড়লেন। তাঁর ক্রুদ্ধ প্রশ্নের জবাবে রমেশ বিনীতভাবে জানালে পড়া তার আর হবেনা। সমিতির কাজে তাকে অন্যত্র যেতে হবে। ক্রোধে জ্ঞান-শূন্য পিতা রমেশকে হিড়হিড় করে টেনে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। তারপর তার হাত পা বেঁধে নির্দয়ভাবে প্রহার করতে লাগলেন। একচোট মারেন, তারপর বোধ হয় দম নেবার জন্যেই থেমে প্রশ্ন করেন—"বল—পড়বি কি না?"

অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে রমেশ জবাব দেয়—"না।"

আবার প্রহার শুরু হয়। রমেশ তবুও বলে—"না—আমি পড়ব না—"

অকস্মাৎ দৃশ্য পালটে গেল। বিস্মিত, বিমূঢ় রমেশ দেখতে পেল তার পিতা দেওয়ালের সাথে সজোরে মাথা ঠুকছেন। কপাল

কেটে রক্তের ধারায় মুখমণ্ডল আপ্লুত হয়েছে,—চোখে নেমেছে দর দর ধারে অশ্রুর প্রবাহ। এই মর্মান্তিক বীভৎস দৃশ্য দেখে রমেশ আর ঠিক থাকতে পারলে না,—রুদ্ধশ্বাসে চীৎকার করে বললে—"বাবা! বাবা! থাম—থাম—আমি পড়ব—"

কিন্তু পরক্ষণেই এক তীব্র জ্বালাময় অনুভূতি দেখা দিল তার হৃদয়ে। সে যে দেশমুক্তির তরে সর্বস্ব ত্যাগের শপথ গ্রহণ করেছে! চকিতে তার চোখের সামনে ভেসে উঠল "আনন্দমঠের" ছবি। ঘোর দিগ্বসনা কালীর সম্মুখে মহেন্দ্র দীক্ষা গ্রহণ করছে। সত্যানন্দ বলছেন—"আমাদের মাতা নাই, পিতা নাই, ভ্রাতা, ভগিনী, স্বজন, বান্ধব কেহই নাই,—আছে শুধু জননী জন্মভূমি"—

তারই পাশে পাশে ভেসে উঠল আর একখানি ছবি। নিশীথ রাত্রি। জনমানবহীন প্রান্তরের মাঝে কালীবাড়ী। বিগ্রহের সম্মুখে বিপ্লব মন্ত্রের দীক্ষা দিয়ে পুলিনবাবু শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলছেন—"শপথ কর, দেশের মুক্তি-সাধনায় সমিতি ও নেতার নির্দেশে আমি যে কোন কার্যের জন্য প্রস্তুত থাকব"—

কিন্তু পিতার এই মূর্তি? "রমেশ, রমেশ, খোকা! তুই পড়বি" বলে তিনি রমেশকে জড়িয়ে ধরেছেন। বিষাদের পরিবর্তে হর্ষের বাদল নেমেছে তাঁর চোখে। কপালের ক্ষতস্থান হতে ঝরে পড়া শোণিতের ধারা ফিকে হয়ে গিয়েছে চোখের জলে মিশে, চিবুক বেয়ে বিন্দু বিন্দু পড়ছে ঝরে রমেশের শিরে—অব্যক্ত আশীর্বাদ বহন করে—

ছাড়া পেয়েই ছুটে গেল রমেশ নরেন সেনের কাছে। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে ঘটনার বিবরণ দিয়ে অনুযোগের স্বরে বললে—"চোদ্দটি পয়সার জন্যে এই অবস্থার সৃষ্টি করেছেন আপনি!" হেসে নরেন বাবু জবাব দিলেন—"বজ্রানলে—আপন বুকের পাঁজর জ্বেলে একলা জ্বলরে।" একটু থেমে আবার বললেন—"কৈ রইতে তো পারলেন না—ছুইট্যা আইছেন তো! পড়েন নাই আনন্দমঠে—"জীবন তুচ্ছ

—সকলেই দিতে পারে। চাই ভক্তি।” যাউক গিয়া। যে কাজের লাইগা আপনারে আনাইছি,—তাই কই। আপনারে কালই যাইতে হইব বরিশালে। সেখান হইতে বড়ই খারাপ খবর আইত্যাছে।”

কয়েকদিন পরের কথা। রমেশ বরিশালে এসেই যোগাযোগ স্থাপন করলে আদিত্য দত্ত আর যতীন্দ্র ওরফে ফেগু রায়ের সাথে। কয়েকদিন মিশেই রমেশের ধারণা হ'ল ঝকঝকে সোজা তলোয়াব এই ফেগু রায় ছেলেটি। কথায় বার্তায় লেশ মাত্র ঘোর-প্যাঁচ নেই।

একদিন রমেশ তাকে একটি ছেলের সাথে দেখা করার নির্দেশ দিলে। জানালে ছেলেটি খুব ভাল। নিজের জীবন বিপন্ন করে এক বুড়ীকে বাঁচিয়েছে জল থেকে।

দু'তিনবার বলার পরও ফেগার কোন উৎসাহ দেখা গেল না। রমেশ জোর দিয়ে বললে—“কালই কিন্তু আলাপ করা চাই।”

ভ্রূ কুঁচিয়ে ফেগু জবাব দিলে—“আমি পারুম না—”

“কেন ?”—রমেশ প্রশ্ন করে।

“সে সিগারেট খায়”—ফেগু জবাবে বলে।

“তাতে কি হইছে ? সিগারেট খাইলেই বুঝি সে ভাল হইতে পারে না ?”

—“না। যে সিগারেট খায় সে গোল্লায় গেছে গিয়া। তারে দিয়া কোন ভাল কাজ হইতে পারে না।”—ফেগুর মত অত্যন্ত স্পষ্ট—।

রমেশের মনে খেলে গেল রবীন্দ্রনাথের “অচলায়তনের” কথা—“স্তুতঃ, স্তুতঃ, স্তোতয়, স্তোতয়”—

তার মুখে হাসির রেখা ঝিলিক মেরে আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছিল। কিন্তু তার গতি সহসা রুদ্ধ হ'ল ফেগুর সুদৃঢ় নিষ্ঠার সম্মুখে। সে তৎক্ষণাৎ ধারণা করে নিলে এই নিষ্ঠার প্রতিরোধে আসবে বিপর্যয়,—শ্রদ্ধা দিয়েই করতে হবে একে জয়।

রমেশ ফেগুর যুক্তি মেনে নিলে।

আর একদিনের কথা। কি একটা ভীষণ জরুরী কাজে ফেগাকে ভোলা যাবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেখানে কুঞ্জ (ঘোষ) বাবুর সাথে দেখা করে সেইদিনই ফিরে আসতে হবে। বারবার রমেশ তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে কাজের গুরুত্ব। শেষ রাতে তার রওনা হবার কথা। কিন্তু বেলা দুটোয় সে রমেশের বাসায় এসে উপস্থিত। রমেশ কঠোর স্বরে জিজ্ঞেস করলে—"তুমি যাও নাই?"

—"না—যাইতে পারি নাই। এক মস্ত ফ্যাসাদে পড়ছিলাম—" তারপর কখন হাসি, কখন ক্রোধ, কখন ঘৃণা, কখন সমালোচনা বিজড়িত যে দীর্ঘ আবোল তাবোল বিবরণ সে দিল তা থেকে "মস্ত ফ্যাসাদের" যে রূপটি রমেশের বোধগম্য হ'ল তা হচ্ছে এই :— ফেগাদের পাড়াতে গতরাত্রে একজন বৈরাগী মারা গিয়েছে। জীবিত-কালে সে একবার তীর্থ সেরে ফিরে এসে জ্ঞাতি-গোত্রদের দশজনকে খাওয়ায়নি। এই ভীষণ অপরাধের শাস্তি স্বরূপ সেবারের আর এবারের গিঁয়াত ভোজনের সাকুল্য টাকা জমা না পেলে কেউ তার বাড়ী যাবে না। এদিকে মৃত ব্যক্তির বৌ, ছেলে, মেয়ে, মড়া আগ্‌লে কেঁদে আকুল।

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে ফেগু বলে—"দেখছেন—দেখছেননি বেটাগো আক্কেল? রাত হইতে মরা ঠায় ফেইলা রাখছে। কত অনুরোধ উপরোধ করলাম—কিছুতেই রাজী হয় না। শ্যাষে যখন পাঁচডা পোলারে লইয়া খাড়া হইয়া কইলাম—আমরাই সৎকার করত্যাছি। সাথ্‌ সাথ্‌ ইডাও জানাইয়া যাই তিনদিনের মধ্যে যদি সব ব্যাটারে এর ফল না দেই তো আমি ফেগা রায় না। তামাসা ছাখেন—তারপর সব সিধা হইয়া গ্যালো গিয়া। নাঃ—সোজা আঙ্গুলে 'ঘি' উঠে না"—

রমেশ যতই ফেগুর কাহিনী শোনে—ততই বিরক্ত হয়। বাধা দিয়ে রাগতস্বরে বললে—"তোমার উপর না খুব জরুরী কাজের ভার দিছিলাম? তোমার লঘুগুরু জ্ঞান নাই? তুমি না বিপ্লবী?"

বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে ফেগু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল রমেশের মুখের দিকে। তার ধারণাতেই এলনা তার দোষ কোথায়—কেনই বা রমেশদা বকাবকি করছেন। অবশেষে অসহায় ভাবে সে বললে —"কি কন্ ঠিক বুঝি না। বিপ্লবী বুঝি মানুষ হয় না ?"—হেসে দিল রমেশ। তার মনে হ'ল শিশুর মত সরল প্রাণ এই কিশোর বালকের হৃদয় ঐশ্বর্যে ভরপুর ! স্নেহ, দয়া, মায়া, প্রেম, প্রীতির কুসুমস্তবকে সুরভিত এর প্রাণের নন্দন-কানন—কুটিলতা বা রাজনৈতিক জটিলতার স্থান সেখানে নেই। সে একদৃষ্টে চেয়ে রইল ফেগার দিকে। সারল্যের ছবি এই বালকটির প্রতি মায়ায় তার হৃদয় ভরে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে জাগল ফেগার কৃতকর্মের কাহিনী। এই ফেগাই তো ডাকাতির পর ডাকাতি করে বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে বরিশালে। আবার সে ভাল করে ফেগার মুখখানি দেখে নিলে। এই মায়াময় দেবশিশু ডাকাতি করেছে ? পরক্ষণেই তার মনে হ'ল প্রেম প্রীতির এক মহান আদর্শ ই তাকে ভীষণ করে তুলেছে,—এর দয়াল হৃদয়ই একে ভয়াল করেছে।

"আচ্ছা যাও"—বলে রমেশ তাকে বিদায় দিলে।

কিছুদিনের মধ্যেই সুরু হ'ল বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা। রমেশ এবং ফেগা উভয়েই আসামী। এই মামলা চলার কালেই সরকারী সাক্ষী সাবুদের মারফত বরিশালবাসী শুনতে পেল—লিকলিকে বালক ফেগু—যে অজানা, অচেনা লোকেরও বিপদে আপদে পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, অসুখ বিসুখ মহামারীতে প্রাণ দিয়ে সেবা করেছে, যে নিজের মুখের গ্রাস পথচারী ভিক্ষুকের মুখে তুলে ধরেছে,—সেই ফেগা রায় বহুসংখ্যক দুঃসাহসিক ডাকাতির নায়ক। বর্গী আসার ছড়ার মত ফেগু-ডাকাতের কাহিনী ছড়িয়ে পড়ল মুখে মুখে—সত্যি মিথ্যা জড়ানো বহু আজগুবি গল্প প্রচারিত হ'ল দিকে দিকে।

রমেশ আর ফেগা উভয়েরই দ্বীপান্তরের আদেশ হ'ল। সেদিনের জেলের বর্বর নিষ্ঠুরতা তাদের মনোবল একটুও ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি।

খানি, চাকি—সাজার পর সাজা সবই হাসিমুখে সহ্য করে ১৯২১ সালে উভয়েই বেরিয়ে এল জেল থেকে মনের স্বাভাবিক দৃঢ়তা নিয়ে।

তখন অসহযোগ আন্দোলনে দেশ মেতে উঠেছে। ফেগু রায় মহানন্দে দেশের কাজ করে। কাজ কি তার একটা? কংগ্রেস তো আছেই। তার উপর সে যেন একাই ছাত্র-বান্ধব, শব-সৎকার, আপদুদ্ধার, সেবাব্রতী ও প্রজাপতি সমিতির হেড অফিস। একবার খবর দিতে যা দেরী।—আর কথা নেই। লেগে গিয়েছে ফেগা ভাই, সাথে একদল স্বদেশী চাঁই।

মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না। বিধবা মা কেঁদে পড়লেন ফেগাবাবুর কাছে—ফেললেন চোখের জল। অমনি ফেগা রায় চঞ্চল হয়ে উঠলেন। খুঁজেপেতে পাত্র আবিষ্কার করে জোরের সাথে বলেন —"তরে বিয়া করতেই হইব। বাবার মতের কথা কও? যখন সিগারেট ধরছিলা তখন বাবার মত লইছিলা? ও আমি কিছু শুনতে চাই না। এই মাসেই বিয়া হইব জাইন্যা রাইখ।"

এই রকম জবরদস্তি করে অনেক বিয়ে ঘটিয়েছেন ফেগাবাবু। কেউ তাকে বলে—আস্ত ডাকাত, কেউ বলে পাগল, কেউ বলে দেবতা—।

এরপর আরও তিনবার তিনি জেলে আবদ্ধ রইলেন। শেষবার মুক্তি পেলেন ১৯৪৫ সালে। তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গিয়েছে। মাথার চুলে পাক ধরেছে, মুখের চামড়া কুঁচিয়ে গিয়েছে, মাংসপেশী শিথিল হয়েছে। দেহের এতটা পরিবর্তন,—কিন্তু মনের পরিবর্তন হয়নি এতটুকুও। একটু কথা বললেই দেখা যায় পাকা খোলসের মধ্যে ১৯১২ সালের বালক ফেগা রায় উঁকিঝুঁকি মারছে— Fega Roy for ever.

১৯৪৭ সালের আগষ্টে খণ্ডিত ভারতের রক্তঝরা বেদনাসহ এল স্বাধীনতা। আর আর বিপ্লবীদের মতই অন্তরে হাহাকার, আর চোখে অশ্রুসহ ফেগা রায়ও দূর থেকে তাকে অভিবাদন করলেন।

দেশ ও দেশনায়কগণ মেতে উঠেছেন উৎসবে। কেউ ফিরেও চাইলেন না এই হতভাগ্যদের প্রতি। এদের আত্মার হাহাকার যে দেশাত্মারই আর্তনাদ, এই সত্য উৎসবের ঢক্কা-নিনাদে ঢাকা প'ড়ল। সমস্যাজড়িত পরাজিত বিপ্লবীরা সরে গেল দৃষ্টির আড়ালে।

১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস। ফেগা রায়ের টাইফয়েড হয়েছে। তিনি তাঁর এক আত্মীয়ের গৃহে পড়ে আছেন বিছানায়। পূর্বের সাথীভাই আশু কাহিলী, রবি সেন প্রভৃতি প্রত্যহই তাঁকে দেখে যান আর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। তৃতীয় সপ্তাহে বড়ই বাড়াবাড়ি সুরু হয়েছে। বিকারের ঘোরে তিনি উঠে বসেন। জোর করে শুইয়ে দিলে বিড়বিড় করে বকেন—"কলেরা লাগছে, আমি যাইতে চাই,—তাগো ছ্যাখনের কেউ নাই—আমারে যাইতে ছ্যায়না।" চোখ দিয়ে জলও ঝরে।

প্রায় একমাস পরের কথা। সেদিন জ্বর সম্পূর্ণ ছেড়েছে। রবি সেন, আশু কাহিলী, জিতেশ লাহিড়ী রোগীর দুইপাশে ব'সে। ধীরে ধীরে রমেশদাও হাজির হয়েছেন লাঠিতে ভর দিয়ে। সব খুশী খোশাল। আশুবাবু ঠাট্টা ক'রে ফেগা রায়কে বললেন—"ফেগাবাবু, এইবার সকলরে কই আপনার উইলের কথা?"

নিরুপায় ফেগা রায় হাত যোড় করে নিষেধ করলেন। হাত দু'খানি থরথর করে কাঁপতে লাগল।

রমেশবাবু ও জিতেশ চেপে ধরলেন আশুবাবুকে ব্যাপার কি খুলে বলার জন্যে। আশুবাবু বলতে যাবেন এমন সময় দেখা গেল ফেগা রায় রোষকষায়িত নয়নে কট্‌মট্ করে চেয়ে আছেন আশুবাবুর দিকে। বন্ধুরা উৎসুক হ'য়ে পীড়াপীড়ি করায় আশুবাবু উইলের ইতিবৃত্ত সুরু করলেন।

"মাঝে ফেগাবাবুর অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক হয়ে উঠেছিল। মাঝে মাঝে প্রলাপ বকেন, আবার জ্ঞানও হয় মাঝে মাঝে। সেই সময় একদিন ইশারায় আমাকে ডেকে ফেগাবাবু বিড়বিড় করে কি যেন

বললেন। অনেক চেষ্টায় বুঝলাম তিনি বলছেন—"আমার নিজের বলতে তো কিছুই নাই। এমনকি একখানা ধুতিও নাই। তাই আমি মলে আমার দেহটা না পুড়াইয়া যেনি মেডিক্যাল কলেজে দেয়া হয়।"

জিতেশের মনে হ'ল দধীচির হাড়ে বজ্র তৈরী হ'য়েছিল, যাতে নিঃশঙ্ক হয়েছে দেবতারা, নিষ্কণ্টক হ'য়েছে তাদের স্বর্গরাজ্য। কিন্তু নির্লজ্জ স্বার্থপর দেবতারা রাজ্যভোগও করেছে আর মর্ত্যেও প্রচার করেছে নিজেদেরই পূজা,—দধীচি পূজার প্রচার তারা করেনি। তবুও কোটি কোটি মানবহৃদয়ের স্বর্ণমন্দিরে দশের তরে আত্মোৎসর্গের অনুপম প্রতীক-রূপে উপকরণহীন মৌন পূজায় অভিষিক্ত হয়েছে দধীচি—যুগে যুগে।

রহস্য করে জিতেশ বললে—"এই তো উইল? তা আমি আনন্দবাজারে এটা উঠিয়ে দিগে যাই।"

বিড়বিড় করে ফেগা রায় কি যেন বললেন,—মুঠি বাগিয়ে ডান হাতখানা তুলতে চেষ্টা করলেন;—দুর্বলতায় ব্যর্থ হ'য়ে হাতখানা অসম্ভব কাঁপতে লাগল। আশুবাবু তাঁর মুখের কাছে কাণ নিয়ে পীড়াজড়িত অস্পষ্ট বাণী উদ্ধার করলেন—"খুন করুম্।"

বহুরূপী

খড়্গাপুর রেলজংশনের টী ষ্টলে কিছুদিন হ'ল একটি বাংগাল বয় এসে জুটেছে। যেমনি চেহারা,—তেমনি আচরণ। কালো, খিট-খিটে, চোয়াড়ে চেহাবা। গাল দুটো এমনই মার খাওয়া যেন মনে হয় লোহার দুখানা ছোট্ট প্লেট সেট করা আছে দুধাবে। তদুপরি ব্রণের দাগে মুখটি ভরা। সৌন্দর্য যেন উপচে পড়ে। বয়স বিশ কি ত্রিশ অনুমান করা শক্ত। রস-কষহীন খটখটে চেহারায় বয়সের ছাপ হারিয়ে গিয়েছে। সমগ্র মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন কবে দাঁড়িয়ে আছে গরুড় লাঞ্ছিত নাক। "কি কন্ কর্তা। ছা দিমু" বলে যখন সে মুখখানি বাড়িয়ে দেয় তখন মনে হয় মাবলে বুঝি ঠোকা নাক দিয়ে। এই তো রূপের বাহার। তাব সাথে যোগ দিয়েছে অপরূপ আচবণ। ছেলেটি কারণে অকারণে হাসে আব মাঝে মাঝেই চোখ মিট-মিট কবে ; সব কথাতেই সায় দিয়ে বলে—'হু-হু-হু'। আচ্ছা চীজ এনেছে টী ষ্টলেব মালিক। বোধ হয় এ হেন কোন চাকবকে দেখেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ কেষ্টার ছবি এঁকেছিলেন—

"ভূতেব মতন চেহারা যেমন নির্ব্বোধ অতি ঘোব"। তফাৎ এই যে ছেলেটির নাম কেষ্ট নয়—হবিরাম। বোধহয় তাব বাবা ছেলেব নাম ডেকেই ইষ্ট নাম জপ করতে চেয়েছিলেন।

মাঝে মাঝেই হরিরামকে ঘিরে আসর জমে ওঠে। চায়ের আড্ডা। রঙ বেরংয়ের মানুষ জমে সেখানে। কেউ বলে—"বেটা বাংগাল একদম বে-আক্কেল"। কেউ বা রসিকতা করে। একদিন এক বাবু চটে গিয়ে কান ধরে উঠ-বস করিয়ে ছাড়লেন। মাঝে মাঝে দারোগা, ইন্‌স্পেক্টর প্রভৃতি পুলিশ অফিসার এসে চা খেয়ে যান ষ্টলে।

১৯২৭ সাল, মন্দীভূত হয়ে এসেছে অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব। কিন্তু দেশময় জেগে উঠেছে রাজনৈতিক চেতনা। চায়ের ষ্টলে মাঝে মাঝেই রাজনৈতিক আলোচনা জমে ওঠে। ছদ্মবেশী গোয়েন্দারাও যোগ দেয় সেই আসরে। হরিরামের কি এক বদ-অভ্যাস এইসব অলোচনা যখন চলে তখন সে যেন কেমন আনমনা হয়ে যায়। দু'তিন ডাকের কমে তার সাড়া পাওয়া যায় না। সেজন্যে মাঝে মাঝে তাকে গালমন্দ খেতে হয় মালিকের কাছে। কিন্তু ষ্টলে পুলিশ বা গোয়েন্দা বিভাগের কেউ এলে অতি মাত্রায় সচেতন হয় হরিরাম। তাঁরা যা চান তা সরবরাহ করতে যেন সে চতুর্ভূজ। চোখ মিট্‌মিট্‌ করে আর বেকুবের হাসি হেসে হরিরাম অফিসারদের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়—এবং দন্ত বিকাশ করে জিজ্ঞাসা করে—"দিমু করতা আর একখণ্ড টোস্‌?"

পুলিশ আর গোয়েন্দা কর্মচারী যেসব আলোচনা করেন ষ্টলে বসে হরিরাম উৎকর্ণ হয়ে সব শোনে। একটাও বাদ পড়ে না। এরূপ ঘটনার পর মাঝে মাঝে সে সকলের অলক্ষ্যে ষ্টল থেকে উধাও হয় গভীর রাতে। কোথায় যায় কেউ জানে না।

একদিন ষ্টলের ম্যানেজার মালিকের কাছে অভিযোগ করলেন এ বিষয়ে। জানালেন,—"দুপুর রাতে - শেষ রাতে সব সময়েই ট্রেন আসে। আর ঐ সময়টায় বিক্রীও বেশ। কিন্তু মাঝে মাঝে হরিরাম না থাকায় বড় অসুবিধায় পড়তে হয়। একজন চাকরে সব ম্যানেজ করতে পারে না। তারপর দুজন থাকলে পালা করে ঘুমানো চলে।"

মালিক মহেন্দ্রবাবু হেসে বল্লেন—"ঐ জানোয়ারটার বিরুদ্ধে নালিশ করছেন? ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন। চেহারা দেখেই মনে হয় গুলিখোর। নিশ্চয় কোন গাঁজাগুলির অড্ডায় জমে গিয়েছে"।

প্রায় চার পাঁচ মাস বেশ কাটিয়ে দিলে হরিরাম। কিন্তু হঠাৎ একদিন তার ভাঙ্গা কপাল আরও ভেঙ্গে গেল। সন্ধ্যার সময় চা বিস্কুট খেয়ে এক ভদ্রলোক পাঁচ টাকার একখানা নোট বের করে রাখলেন

কাউন্টারে। বোধহয় মিনিট দুই পরেই নোটখানি আর পাওয়া গেল না। নেই তো নেই। ষ্টল ম্যানেজারের সন্দেহ হল হরিরামের উপর। শুরু হল নির্যাতন। সে যতই বলে "আমি লই নাই"—ততই বেত চলে শাঁই শাঁই। বেচারার শুকনো গাল বেয়ে অশ্রুর প্রবাহ নামল—তবুও প্রহার থামল না। গোলমাল শুনে মালিক মহেন্দ্রবাবু এসে জুটলেন সেখানে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। তাই তিনি একটু রংয়ে ছিলেন। শরীফ মেজাজে বললেন—"এই ম্যানেজার ছেড়ে দাও। Brutality করনা,—Cruelty to animals Act—এ পড়ে যাবে"। টলতে টলতে এলেন তিনি। হরিরামের কান ধরে প্রশ্ন করলেন—"এই বাংগাল। টাকা নিইছিস ?"

"লই নাই হুজুর।" জবাব দিলে হরিরাম।

"লই নাই হু-জু-উ-উর" মুখ ভেংচিয়ে বললেন মহেন্দ্রবাবু। তার পরই বিকৃত স্বরে আদেশ দিলেন—"সার্চ কর, হারামজাদাকে।"

ম্যানেজার হরিরামের কামিজের পকেটে কিছুই পেল না। কিন্তু তার পুঁটুলীর মধ্যে পাওয়া গেল সুন্দর একটা ফ্লুট বাঁশী। বাঁশী দেখেই ম্যানেজার হেসে বললেন—"ও বাবা! সখও আছে। পোড়া কাঠের আবার কেষ্ট ঠাকুর হবার সাধ আছে নাকি ?"

সকলে একযোগে হেসে উঠলেন।

টাকা পাওয়া গেল না। তার পরিবর্তে পাওয়া গেল একখানা চিঠি। কোথা থেকে এসেছে—কে লিখেছে কোন ঠিকানা নেই। নানা কথার মধ্যে ছোট্ট একটি খবর আছে চিঠিতে। সেটি হচ্ছে—"হয়তো জেনে খুশী হবে তুমি কেমিষ্ট্রিতে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হয়েছ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টির পর থেকে বিজ্ঞানে এমন মেধাবী ছাত্রের সন্ধান নাকি আর পাওয়া যায় নি।"

হরিরামের কাণ থেকে মহেন্দ্রবাবুর হাত খসে পড়ল। সকলেই এক যোগে প্রশ্ন করল—"এ চিঠি কার ?"

"টীশনের লাট-ফরমে কুড়াইয়া পাইছি"—ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে জবাব দিলে হরিরাম।

কেমন যেন একটা আবছা সন্দেহ জেগে উঠল মালিকের মনে। ফলে নির্যাতন গেল থেমে।

ডাউন বম্বে মেল চলে গেছে। পরের ট্রেন আসতে ঢের দেরী। ষ্টলের সকলে একটু জিরিয়ে নিচ্ছে। এই অবসরে হরিরাম লোকো শেডের লাখপতি মিছিরকে নিয়ে হাজির হ'ল টালি ক্লার্ক নরেশবাবুর কোয়ার্টারে। নরেশবাবু প্রশ্ন করলেন—"আজ নাকি ষ্টলের ম্যানেজার বেটা টাকা চুরির সন্দেহে আপনাকে বেদম চাবুক মেরেছে— ?"

বাধা দিয়ে হরিরাম বললে—"চড়টা আস্‌টা প্রায়ই তো কপালে জোটে। ওটা সইয়া গ্যাছে। আজ পাঁচ পাঁচটা টাকা চুরির ব্যাপার কিনা—তাই একটু বাড়ছে। ওডা কিছু না। ওরা তো আমারে মারে নাই,—মারছে টী ষ্টলের বোকা বয়রে।"

মিছিরজী বলে উঠলেন—"কেয়া বাবুজী ? আপকো মারা হ্যায় ?" সাথে সাথেই তিনি হরিরামের জামা উঠিয়ে ধরলেন। নরেশবাবু আর মিছিরজী শিউরে উঠলেন অবস্থা দেখে। জীরজীরে হাড় কখানা ঢেকে রেখেছে যে চামড়াখানি মমতাহীন পরুষ-আঘাতে তা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে।

মিছিরজী উত্তেজিত কণ্ঠে বল্লেন—"বাবুজী! হুকুম দিজীয়ে, শালেকো হাড্ডি তোড়কে হাম ইসকো বদলা লেঙ্গে।"

হরিরাম তার ঘাড়ে হাত রেখে ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে বললে—"ধীরে ভাই! ধীরে! আওয়াজ না করিয়ে। দেশমাতাকী সেবাকি লিয়ে ইস্‌সে ভি ভারী মুশ্‌কিল হাম সবকো উঠানে হোগা।"

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে নরেশ বাবু বললেন—"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জুয়েল ছেলে সুরপতি চক্রবর্ত্তী আজ খড়্গপুর ষ্টেশনের টী ষ্টলের বয়। চুরির অপবাদে আজ সে প্রহারে জর্জরিত। এদের জন্য নাই

ফুলের মালা—নাই জয় ধ্বনি—নাই কোন পরিচয়। They will die unwept, unhonoured, unsung and unknown—"

অট্টহাস্যে ঘরখানি ভরে দিয়ে নিম্নস্বরে হরিরাম বললে, "You talk in a pathetic tone. But freedom demands of us selfless suffering alone".

একটু থেমে সে আবাব বললে—"মারের জন্য দুঃখ নাই, দুঃখ হইত্যাছে চিঠিখানিব লাইগা। পরীক্ষায় প্রথম হইছি, এই গৌরবের বাহক চিঠিখানিরে পুড়াইতে পাবি নাই। এই দুর্বলতার কারণেই আজ এখানকার কাজ ফেইলা আমাবে যাইতে হইব কলকাতায়। নিতান্ত আহাম্মকের মত কাজ করছি। অখন নিজের গালে মুখে চড়াইতে ইচ্ছা করে।"

খড়্গপুরের শ্রমিক সংগঠন, সরকারী কর্মচাবীদের গতিবিধি, সৈন্য-চলাচলেব খবর, আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ এবং রেল মহলে অর্গানিজেশন বিস্তার—যাতে করে যথাসময়ে একটি ইঙ্গিতেই এই বেল জংশনের চলমান কম-প্রবাহ অসাড় হয়ে পড়ে—এই সব গুরুত্বপূর্ণ যে কাজের ভার নিয়ে দলের আদেশে সুরপতি এখানে ছুটে এসেছিল, টী ষ্টলেব বয় সেজে করেছিল আত্মগোপন—ব্যথিতচিত্তে তার সবটাই পেছনে ফেলে সেই রাতেই বিদায় নিতে হল তাকে সেখান থেকে। চলে গেল সে ক্ষেত্রান্তরে। হবিরামেব খোলসখানি সবার অলক্ষ্যে মাত্র কয়েকটি দিন স্মৃতির বোঝা বহন কবে মিলিয়ে গেল বায়ুস্তরে। কোথায় পড়ে রইল সুরপতি,—কোথায় গেল হরিরাম—এগিয়ে চলল বিপ্লবী।

মাস দুই পরে। রাণীগঞ্জ অঞ্চলের পারবালিয়া কোল মাইনে একজন নূতন সরকাব এসে জুটেছে। কুলীদের হাজিরা লেখা আর কে কতটুকু কাজ করে তার ঠিকানা রাখাই তার প্রধান কাজ। বয়স বেশি নয়—কিন্তু তার মুখ চোখ দেখে বয়স আন্দাজ করা যায় না। নাম তার নন্দ। ছেলেটি বড়ই ঢঙ্গিলা। মাঝে মাঝে কুলীদের

জলশায় সার বেঁধে নাচে—ওদের সাথে গান গায় আবার খাদে নেমে কাজও করে ওদের সাথে। যখন কোন কাজ থাকে না তখন মাঝে মাঝে বাঁশী বাজায়। সে সময় সে যেন জগত সংসার ভুলে যায়। একেবারে তন্ময়। একদিন সন্ধ্যার পর সে বাঁশী ধরে বেহাগে দিয়েছে টান। দেশ-কালের গণ্ডী অতিক্রম করে কোন সুদূর আপনভোলা স্বপ্নরাজ্যে সুরের হাওয়ায় উড়তে উড়তে চলে গিয়েছে তার মন। হঠাৎ কে যেন তাকে ডাক দিল—"বাবুজী!"

চমকে উঠল ছেলেটি। রি রি করে উঠল তার মন। ইচ্ছে হল আগন্তুক হরমন সর্দারের দেহে ঝাঁপিয়ে পড়ে আঘাতে আঘাতে তাকে জর্জরিত করে দেয়। কিন্তু থেমে গেল তার বাঁশী—থমকে গেল সুরের লহরী।

"বাবুজী! পাঁচঠো মিলা হ্যায় আজ"—বললে হরমন! চটে মোড়া একটা পোঁটলা সে খুললে। পাঁচটি ডিনামাইট। চক্ চক্ করে উঠল নন্দর চোখ। আনন্দে সে জড়িয়ে ধরলে হরমনকে। মুহূর্ত পূর্বে বেহাগের সুরে বিভোর হয়ে যে যুবকের মন সুরের হাওয়ায় ডানা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছিল সুরলোকে,—হরমনের আহ্বান যাকে দিয়েছিল আঘাত সেই সুরশিল্পীর কবি মন সহসা অন্তর্হিত হল, আর তার শূন্য আসন জুড়ে বসল রক্তপথের ভয়াল বিপ্লবী।

নন্দ হরমনের কাণের কাছে মুখ নিয়ে বললে—"আরো—আরো চাই ভাই। আরো চাই—দশ, বিশ, পঁচিশ,—ত্রিশ যা হয়"—

সেখানে ছিল না কোন ফটোগ্রাফার। তাই তার বাঁশী বাজানো আর ডিনামাইট দেখা অবস্থার মুখের ছবি নেয়া সম্ভব হয়নি। কিন্তু তার অন্তর-লোকের এই গান এই গর্জন দেখে অন্তর দেবতা নিশ্চয়ই হেসেছিলেন।

বিপ্লবী নন্দ দলের নির্দেশমত ডিনামাইট সংগ্রহ করছে একমনে। অতর্কিতে আবির্ভূত হ'ল এক বিপদ। কুলী-কামিনরা তাকে দেখে ঠাট্টা করে, ইয়ার্কি দেয়, এমন কি গা ঘেঁষে এসে দাঁড়ায়

পাশে। ওদের পুরুষরাও তো কাজ করে আশে পাশেই। তারাও তো রাগে না,—চটেনা, মেয়েদের—নিজেদের বৌ বেটির এই নির্লজ্জ বেহায়াপনা দেখে। বরং তারা চোখ টিপি দেয় আর মুচকি মুচকি হাসে। কি চায় এরা নন্দর কাছে? তার না আছে রূপ—না আছে স্বাস্থ্য যা দেখে কামিনরা তাদের উচ্ছল যৌবনের প্লাবন ভরা নিটোল দেহ সাগ্রহে উপহার দেবে নন্দকে। ভেবে খেই পায় না নন্দ। তাই সে কয়লা খাদের ছোটবাবুকে সব কথা খুলে বললে। ছোট ম্যানেজার ভূপেনবাবু ছিলেন নন্দর দলের লোক। পূর্বে উৎসাহী কর্মী ছিলেন—অধুনা গৃহী সভ্য। তিনি মন দিয়ে নন্দর কথা শুনলেন। তারপর খুব একচোট হেসে নিয়ে নীচু স্বরে বললেন—"ওরা তোমাকে বাগাতে চায়—যাতে ওদের হাজরে আর কাজের হিসেবের সুবিধে হবে।"

"বড় নোংরা তো কয়লার খাদ"—ভ্রূ কুঁচকিয়ে বললে নন্দ।

"কয়লার খাদে প্রেমের ফাঁদ পাতা আছে"—হেসে জবাব দিলেন ভূপেনবাবু।

এরপর থেকে কামিনদের এড়িয়ে চলে নন্দ। কিন্তু কামিনরা খাদের সরু গলিতে যাতায়াতের পথে তাকে কাছে পেলেই হেসে ঢলাঢলি করে,—এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে হাসিতে, যৌবনভরা দেহ-বল্লরী আন্দোলিত করে ভোগের ইঙ্গিত জানায়।

ছুটে পালিয়ে যায় নন্দ,—আর তাকে তাড়া করে পিছে পিছে ধায় কদর্য অর্থভরা খিল খিল হাসি।

সহসা একদিন নন্দ ছুটে গেল ভূপেনবাবুর বাসায়। আর্তস্বরে বললে—"নাঃ আর না। আমি চললাম ভূপেনবাবু।" বলেই ভূপেনবাবুকে কোন প্রশ্নের অবসর না দিয়েই ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সেইদিনই সে হাজির হ'ল আসানসোলে। দলের নেতা বুড়োদা সেখানে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করেই নন্দ বললে—"আমি এক্কেবারে চইলা আইছি। আর যামুনা কয়লার খাদে।"

"সে কি!"—আশ্চর্য হলেন বুড়োদা।

"তোমার কাজ, যেভাবে আগাইছে তাতে তোমার যে অখনও কিছুদিন খাদে থাকন দরকার"—শান্তভাবে বললেন তিনি।

"কিন্তু আমি তো মানুষ। আমার দেহও তো রক্ত-মাংসে গড়া! সাফ কইত্যাছি আমি পারুম না"—উত্তেজিত স্বরে জবাব দিলে নন্দ।

"ঠিক বুঝিনা তুমি কি কও। সমিতির প্রয়োজনে তোমারে রাখছি খাদে। কাজও করছ ভাল। অখন বেতালা কথা কও ক্যান?

বাধা দিয়ে নন্দ বললে—"আমারে খুন করতে চান? কাল আমারে এক কুলী কামিন চাইপ্প্যা ধরছিল।—আমি দেখছি পশু সুরপতির জাগরণ,—অনুভব করছি তার শিহরণ। না—না—না—আমি থাকুম না। খাদে রইলে মানুষ সুরপতি মরব,—বিপ্লবী সুরপতি মরব,—তার কাঠামো জুইড়া বাঁচব কুকুর আর ছাগল।"

"আস্ত পাগল'—আস্তেই বললেন বুড়োদা।

সুরপতি ফিরে গেল ঢাকায়—ফিরে গেল ছাত্র জীবনে। মেধাবী ছাত্র সে। অধ্যাপকগণ তাকে স্নেহ করেন, ছাত্রেরা দেখে সম্ভ্রমের চোখে। কিন্তু তার ধরণধারণ দেখে প্রবীণ অধ্যাপকগণ বলাবলি করেন—"ছেলেটা পাগল না জিনিয়াস!"

সমিতিতে টাকার খুব টানাটানি। ঢাকার নায়ক নির্দেশ দিয়েছেন প্রত্যেক কর্মীকেই কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ করে সমিতির খরচ যোগাতে হবে। সুরপতি সোৎসাহে সাড়া দিয়েছে।

মাস তিন পরের কথা।

ঢাকা শহরের এক মহল্লায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টসের সেরা ছেলে বুদ্ধদেবের বাসা। প্রত্যহ প্রাতে একজন ছোকরা ফেরিওয়ালা সেখানে রুটী সরবরাহ করে। সে যখন রুটী দিয়ে যায় তখন প্রায় কেউ ঘুম থেকে ওঠে না! বুদ্ধদেবের ছোট বোন সকলের আগে উঠে তার কাছ থেকে রুটী নেয়। সেদিন কেন যেন ফেরিওয়ালার আসতে দেরী হয়েছে। প্রায় সাতটা বাজে।

বুদ্ধদেবের বাসায় এসে দোরের কড়া নাড়া দিতেই মারমুখী হয়ে নেমেছে বুদ্ধদেবের বোন।

"অভদ্র,—ইতর—চাষা! কেমন করে জানবে তুমি যে রুটী লাগে খুব ভোরে! নেব না তোমার রুটী—যাও বেরিয়ে এখান থেকে।"

ফেরিওয়ালা ত্রুটি স্বীকার করে মাপ চাইলে।

আবার এক পশলা গালিগালাজ বর্ষণ করলে মেয়েটি। জিজ্ঞেস করলে—"কি নাম তোমার?"—

ফেরিওয়ালা বিনীতভাবে জবাব দিলে—"আমাব নাম জনার্দ্দন—মায়ে ডাকে জনু"—

"জনু—না—হনু? যেমন চেহারা হনু নামই ঠিক"—শ্লেষের সাথে বললে মেয়েটি।

গোলমাল শুনে চোখ রগড়াতে রগড়াতে নিঃশব্দে বুদ্ধদেব এসে দাঁড়িয়েছে বোনের পাশে। তাব দিকে চোখ পড়তেই ফেরিওয়ালা পালানোব জন্যে পা বাড়ালে। কিন্তু ততক্ষণে বুদ্ধদেব এসে তাব গলা জড়িয়ে ধরেছে।

"আসুন—আসুন—সুবপতিবাবু! আজ বড ভাগ্যে আপনাকে পেয়েছি—এক কাপ চা খেয়ে যান।"

বোন ছুটে পালাল অন্দবে। প্রায় পনের মিনিট পরে চা আর রুটী নিয়ে সে-ই ঢুকল বাইবেব ঘবে। তাকে দেখেই উঠে পড়ল সুবপতি। বললে—"আমি খামুনা চা-রুটী। আমি যাই!"

"কেন কি হয়েছে?"—ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করলে বুদ্ধদেব।

যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে সুরপতি বললে—"আমি বুঝি মানুষ না? আমাব বুঝি রাগ নাই? ঐ মেয়েটি আজ আমাবে অপমান করছে। আমি প্রতিশোধ নিমু ওব আনা চা না খাইয়া।"

উচ্চ হাসিতে ঘরখানি ভরে দিয়ে ঝড়েব মত বেরিয়ে গেল সুরপতি।

"আচ্ছা পাগল! ধীরে ধীরে বললে বুদ্ধদেব।

কাপ প্লেট টেবিলে রেখে বোন দাদাকে শুধালে—"দাদা! কে ও?"

"ও হচ্ছে ঢাকা য়ুনিভার্সিটির সায়েন্সের সেরা ছেলে সুরপতি চক্রবর্ত্তী।"—মৃদু হেসে জবাব দিলে দাদা।

"বড় অন্যায় হয়েছে আমার। আমি ওঁকে যা তা বলেছি। একদিন নিয়ে এসো দাদা! আমার মাপ চাইতে হবে।"

"কোন প্রয়োজন নাই"—উত্তর দিলে বুদ্ধদেব। "কোন নিন্দা, গ্লানি, কলঙ্ক ওদের স্পর্শ করে না। তোর গালিগালাজ ওর কাছেও ঘেঁষতে পারেনি।" দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে আবও বললে—"ধূপের কাঠি—আপনি জ্বলে ছাই হয়ে যাবে সবার অলক্ষ্যে।"

"কিন্তু দাদা! আমি যে ওঁকে 'হনু' বলেছি"—আপশোষের সুরে বললে বোন।

"বলেছিস্ নাকি? ঠিকই হয়েছে। ওবা যে প্রকাশের সূর্যকে বগলদাবা কবে মূর্চ্ছাহত লক্ষ্মণেব চেতনা সঞ্চারের জন্য ছুটে চলেছে! আর ওদের বুক চিরলে দেখা যাবে 'রাম—রাম' এর বদলে 'দেশ—দেশ, লেখা আছে বুক জুড়ে। সত্যিই তো ওবা হনু!"

মাষ্টারদা সূর্য সেনের নায়কত্বে চট্টলের বিপ্লবীরা সরকারী অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেছে। ১৯৩০ সালের ঈষ্টারে বাঙ্গালীর ছেলেরা পরাক্রান্ত বৃটিশ রাজ শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বুকের রক্তে ভারতের বিপ্লবায়োজনের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় রচনা করেছে। বিপ্লবীদের আঞ্চলিক বিদ্রোহ বিস্তার লাভ না করে, তারই জন্যে সরকার সমগ্র বঙ্গের মার্কামারা বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করে কারাগারে প্রেরণ করেছেন। তখন দেশে চলেছে লবণ সত্যাগ্রহের বিক্ষুব্ধ আন্দোলন। সত্যাগ্রহীর দল সার বেঁধে প্রতিদিন প্রবেশ করছে কারাগারে—কারাগারগুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজনৈতিক জনতার হাট। কারাগারের অভ্যন্তরে বিপ্লবীরা সত্যাগ্রহীদের সাথে অবাধ মেলামেশা করে—এটা সরকারের অভিপ্রেত নয়। আমিষের সংস্পর্শে নিরামিষের চরিত্র যাতে নষ্ট না হয় তারই দিকে দৃষ্টি রেখে সরকার বিপ্লবী আটক বন্দীদের সরিয়ে নিয়ে গেলেন হিজলী, বক্সা, বহরমপুর, দেউলী প্রভৃতি ডিটেনশন ক্যাম্পে।

আলীপুর দুয়ারের রাজাভাত খাওয়া—জৈন্তিয়া সেকশনে বক্সা রোড ষ্টেশন থেকে ছয় মাইল দূরে বারশ' ফিট উঁচু পাহাড়ের ওপরে বক্সা ক্যাম্প। গভীর বনের মাঝ দিয়ে অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমিতে তিন মাইল অতিক্রম করে আরোহণ করতে হয় পাহাড়ে। পাদদেশ থেকে শিখরে অবস্থিত ক্যাম্পের দূরত্ব আরও তিন মাইল। সমস্ত পথটাই বিশেষতঃ সমতল ভূমির তিন মাইলে বাঘ, ভালুক আর বুনো হাতীর আক্রমণের আশঙ্কা পদে পদে। এই শ্বাপদ সঙ্কুল, বিঘ্ন বহুল, দুর্গম পথের শেষে বক্সা ক্যাম্প। সেখানে রাখা হয়েছে শতাধিক বিপ্লবী বন্দীদের।

চট্টগ্রামের আঞ্চলিক বিদ্রোহের ব্যর্থতা আর তারই অনিবার্য ফলে দেশব্যাপী ধর-পাকড় চিন্তিত করে তুলেছে বিপ্লবীদের। মাঝে মাঝেই অনুশীলন দলের বিশিষ্ট কর্মীরা আলোচনা করেন—"ততঃ কিম্?" তাঁতের মাকুর মত জেলে গতায়াত বয়নের আয়তন বৃদ্ধি করলেও বিপ্লবের সিদ্ধি আনবে না এ বিষয়ে সকলেই একমত। তাঁরা সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন, সমাজবাদী আদর্শে রাষ্ট্র গঠনই হবে তাঁদের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রথম ও প্রবল অন্তরায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনতা অপসারিত করতে হবে সশস্ত্র গণ-বিপ্লবের মারফতে। দেশের বিচ্ছিন্ন খণ্ড খণ্ড বিপ্লবী শক্তিকে করতে হবে সংহত, ধূমায়মান গণ-বিক্ষোভকে বৈপ্লবিক নায়কত্বে করতে হবে প্রজ্জ্বলিত।

এমনই এক গুপ্ত বৈঠকে ধীরেন মুখার্জি বললে—"যে সিদ্ধান্তে আমরা এলাম তাকে কার্যকরী রূপ দেবার জন্যে জনকতক উপযুক্ত কর্মীর বাইরে যাওয়া প্রয়োজন।"

পূর্ণানন্দ বললে—"যেতেই হবে এখান থেকে। বাইরে যে সব বিশিষ্ট কর্মী অন্তরীণে আছেন তাঁদের মাঝ থেকেও বেছে বেছে টেনে নিতে হবে।"

মণি লাহিড়ী বললে—"শুধু তাই নয়। আমাদের মাঝে যে যখন সুবিধা পাবে তাকে তখনই পালানোর চেষ্টা কবতে হবে।"

তাই স্থির হ'ল। চলতে লাগল সুযোগের সন্ধান। ইতিমধ্যে প্রভাত চক্রবর্তী বাইরে অন্তরীণ হয়েছেন। দলের নির্দেশ পেয়ে তিনি সরে পড়লেন সেখান থেকে। অন্তরীণে নিয়ে যাবার পথে পরেশ গুহও সাফ কেটে পড়েন। আলোচনার পর স্থির হ'ল বক্সা থেকে যাবে দুইজন—জিতেন গুপ্ত আর কৃষ্ণ চক্রবর্তী। জিতেন গুপ্ত সত্যিকারের নীরব সাধক। ক্যাম্পে জিতেন গুপ্ত বলে একজন বন্দী আছেন এটা কেউ কোনদিন অনুভব করত না। বাজে কথার মধ্যে নেই। কোন হৈ চৈ এর মধ্যে নেই, সকলের দৃষ্টির অন্তরালে নীরবে দিন কাটাতেন এই পুরাতন বিপ্লবী। কৃষ্ণ চক্রবর্তী ঠিক এর

বিপরীত। খেলাধূলায়, গানে, গল্পে আলাপে, আলোচনায়, অভিনয়ে এই তরুণ বিপ্লবী ছিল ক্যাম্পের মধ্যমণি। তাকে বাদ দিয়ে কোন অনুষ্ঠানই জমে না। অভিনয়ে ভৃত্যের ভূমিকা একচেটিয়া। সকলে বলেন সেইটেই হয়েছে নাটকের শ্রেষ্ঠ অভিনয়! প্রাণরসে চঞ্চল এই বিপ্লবী কর্মীকে পূর্ণানন্দ যখন বললে—"আমরা ঠিক করছি আপনারই যাইতে হইব বাহিরে···" তড়াক করে কৃষ্ণপদ খানিকটা "পী-কক" মার্চ করে উঠে পূর্ণানন্দকে সেলাম করে বললে,—"হুকুর যাউঙ্গা জনাব! তবে তিনটে দিন সময় পাওয়া যাবে না?"

"কেন?"—প্রশ্ন করলে পূর্ণানন্দ।

"শুনছি দিনাজপুরেব বিভূতি গুহ দুদিনের মধ্যে আসছে এখানে। সবলেই বলছেন সে নাকি খুব কালো, আর নাকি দাঁত বেরকরা ঘুঘু প্যাটার্ণের মুখ তাব। আসুক সে, আমি ভয় করিনে।"

"তার মানে?" বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলে পূর্ণানন্দ।

"তার মানে বিউটি কম্পিটিশানে আমি তাকে চ্যালেঞ্জ করব। অমূল্যদা আর ধীরেনবাবু (মুখার্জি) বিচারক হতে রাজী হয়েছেন। আসুক না দেখি সে কেমন! হুঁঃ—বললেই হ'ল আমাব চেয়ে বেশি কালো আর কদাকার!"

হাসতে হাসতে পূর্ণানন্দ বললে—"তা তিন দিন সময় পাওয়া যাইব।"

সঙ্গে সঙ্গেই কৃষ্ণপদ "ট্রা—লা—লা—লা—লা—লা, ফর হি ওয়াজ এ জলি যেলা" বলে খানিকটা সাহেবী নাচ দেখিয়ে দিলে।

একটা গুরুতর সঙ্কল্পকে ঢাকার জন্যে হাল্কা পরিবেশ প্রয়োজন। বুড়ো-ছোকরা বীরেনদা (চ্যাটার্জি) একদিন বড় একখানা আয়নার সামনে পরদা ঝুলিয়ে ক্যাম্পের কমাণ্ডাণ্ট কোটাম সাহেবকে 'আফ্রিকান বেবুন' দেখালেন। ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে তিনি সাহেবকে বললেন—"You see African Baboon, so painted —Just picture—একদম living."

সাহেব যেমনি এসে দাঁড়িয়েছেন পরদার সামনে অমনি বীরেনদা পরদা দিয়েছেন টেনে। সাহেব আয়নায় নিজের ছবি দেখেই বলে উঠলেন—You naughty boy.

"Living—Living—You see Baboon talking!"—চেঁচিয়ে উঠলেন বীরেনদা।

আর একদিন ঢাকা আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জুয়েল ছেলে সুরপতি চক্রবর্তী সর্বাঙ্গে ছাই মেখে একদম বিবস্ত্র হয়ে গাছতলায় বসে "হর হর ব্যোম ব্যোম" করতে লাগল। কিরণদা (মুখুজ্যে) তার সামনে দিয়ে যেতেই সাধুবাবা ডাক দিলেন—"এই কিরণ! শোন।"

কিরণদা মুলো হাতে লাঠি নিয়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে তেড়ে যেই তার কাছে গিয়েছেন অমনি সাধুবাবা আসনের নীচে থেকে মেয়ে-মানুষের একখানা ছবি ধরলেন তাঁর সম্মুখে। কিরণদা, "ফাজিল—শূয়ার—ফাজিল—শূয়ার"—বলতে বলতে দূরে সরে গেলেন। সাধুবাবা কোপ-দৃষ্টি হেনে ভস্ম-মুষ্টি নিক্ষেপ করে অভিশাপ দিলেন—"কিরণ! এজন্মে তুমি বণিতাকে ঘৃণা কর বলে পরজন্মে তুমি হবে বারবণিতা।" সমবেত বন্দীরা হৈ চৈ জুড়ে দিল…। "সব ফাজিল, সব শূয়ার" বলতে বলতে কিরণদা চলে গেলেন।

এরপর সুরু হ'ল অভিনয়ের মহলা। কৃষ্ণ চক্রবর্তীর মহা উৎসাহ। চাকরের পার্ট তার পেটেন্ট। "পথের শেষে" বই ধরা হয়েছে। জমিদার দুর্গাশঙ্করের ভূমিকা নিয়েছে ননী নাগ, কৃষ্ণপদ শ্যামা চাকরের ভূমিকা। জোর মহলা চলেছে। কিন্তু নাটকের মহলার সাথে সাথে জিতেন গুপ্ত আর কৃষ্ণ চক্রবর্তী আরও একটি মহলা চালাচ্ছেন। সেটা হচ্ছে পাহাড়ীয়াদের বুলি কিছু কিছু নিখুঁতভাবে আয়ত্ত করা।

বিপ্লবী বন্দীদের গুপ্ত চক্রের বৈঠক বসেছে। প্রাচীর, কাঁটা তারের উঁচু বেড়া ডিঙ্গিয়ে কোন ধার দিয়ে যাওয়া যায়। আলোচনায় দেখা গেল প্রাচীর আর তারের বেড়ার যে স্থানটি দুর্বল তার সামনেই

সিপাহী ব্যারাক। শুধু সজাগ সিপাহীরা নয়—একদল কুকুরও পাহারা দেয় সেই পথ। পূর্ণানন্দ বললে—"তবুও ঐ পথেই যাইতে হইব—অন্য পথ নাই।"

তাই স্থির হ'ল। নাটক অভিনয়ের দিন। দুপুর থেকেই কৃষ্ণপদ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বুকে পিঠে ফিক ব্যথা; উঠতেও পারে না নিঃশ্বাসও নিতে পারে না। ডাক্তার এল,……জেলার এল,…… কৃষ্ণপদ অভিনয়ে নামছে না জেনে ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে গেল।

রাত্রি এগারটা। অভিনয় সুরু হয়েছে। তাই নিয়েই সকলে মেতে আছে। বীরেনদা রসাল মন্তব্যে সকলকে মশগুল রেখেছেন। এরই মাঝে পাহাড়ীদের পোষাক পরে কৃষ্ণপদ আর জিতেন গুপ্ত বেরিয়ে গেল ব্যারাক থেকে। আরও দুজন বিপ্লবী তাদের নিরাপদ নিষ্ক্রমণ লক্ষ্য করার জন্য গেল তাদের সাথে সাথে। ধীরেন, অমূল্য, পূর্ণানন্দ প্রভৃতি অধীর আগ্রহে কাল কাটাতে লাগল। গভীর উৎকণ্ঠায় প্রতি মিনিট কাটছে। ঘণ্টা দুই কেটে যায় তবুও খবর আসে না। এক বাটি রাঁধা মাংস দেওয়া হয়েছে সাথে। তাতে কি কুকুরগুলো শান্ত হবে না? চারজনেই ধরা পড়ে গেল নাকি? পাহাড়ের পাদদেশে আছে পুলিশের ফাঁড়ি। তাকে পাশ কাটাতে হলে গভীর বনের মাঝ দিয়ে প্রতি পলে মৃত্যুর সম্ভাবনা মাথায় নিয়ে পাহাড়ী পথে অনেকটা যেতে হয়। দুশ্চিন্তায় পূর্ণানন্দ টহল দিতে লাগল ঘরের মধ্যে।

রাত্রি তিনটে। অভিনয় শেষ হয়ে এসেছে। শেষ দৃশ্যে জগা পাগলা এসে শোকোন্মত্ত দুর্গাশঙ্করকে জানাল "মৃত্যু-পথ-যাত্রীরা এতক্ষণ পথের শেষে।" সেই কথারই প্রতিধ্বনি নিয়ে সাথী বন্দী দুজন ফিরে এসে পূর্ণানন্দকে জানাল—বহুক্ষণ সুযোগের অপেক্ষার পর ওঁরা সফলতার সাথে বেরিয়ে গিয়েছেন—বোধহয় এতক্ষণ "পথের শেষে।"

তিনদিন পরের কথা। ক্যাম্পের কমাণ্ডাণ্ট কোটাম সাহেব বন্ধ

অফিসার, সিপাই, শান্ত্রী নিয়ে প্রবেশ করলেন পূর্ণানন্দের ব্যারাকে। সেখানে জিতেন গুপ্ত আর কৃষ্ণপদ থাকত।

অস্বাভাবিক কঠোর কণ্ঠে সাহেব পূর্ণানন্দকে জিজ্ঞেস করলেন —"Where Jiten Gupta and Krishna Chakra ?"

পূর্ণানন্দ যেন আকাশ থেকে প'ল।—"জিতেন গুপ্ত আর কৃষ্ণ চক্র! কও কি সাহেব? তারা না কাল অফিসেই গেছে আর ফিরে নাই! কৈ তারা? তাগো কৈ রাখছ?"

"Damn it! Don't talk nonsense!"…ক্রুদ্ধস্বরে সাহেব বললে।

"আঁখ দেখায়োনা সাহেব। তাগো কি করছ জবাব দাও… I demand it……" পূর্ণানন্দ পাল্টা চার্জ চালালে।

"তিনদিন আগে তারা ক্যাম্প থেকে পালিয়েছে…কলকাতায় পৌঁছেছে তারা। সেনট্রাল আই-বি সেই খবর পেয়ে আমাদের তার করেছে……

সি, আই, ডি অফিসারের কথা কেড়ে নিয়ে কোটাম সাহেব বললেন…"All of them are in the conspiracy—These dirty fellows."

"গাল দিওনা সাহেব! মুখ সামলাইয়া কথা কও……"

বাধা দিয়ে বীরেনদা বললেন—"এই পূর্ণানন্দ! চুপ কর! ছাখস্ না রাইগ্ গ্যা ক্রোটাম্ ফুল্‌ছে……

"What"…চীৎকার করে উঠলেন কোটাম সাহেব।—"I shall teach you a good lesson"

"Very well Madam!"… হাত কচলিয়ে জবাব দিলেন বীরেনদা। আই, বি অফিসারটি এগিয়ে এসে বললেন—"আপনারা ক্যাম্পে বসেই গুপ্ত-চক্র ফেঁদেছেন। কিন্তু ঠিক জানবেন আমাদের

কাছে কোন ষড়যন্ত্রই টিকবে না···গুপ্ত-চক্রের সব কিছুই আমাদের সামনে বের হবেই হবে।"

অতিশয় বিনয় সহকারে বীরেনদা জবাব দিলেন—"অবিকল। ঠিকই কইছেন। আপনাগো সামনেই তো বাহির হইয়া গ্যালো গিয়া গুপ্ত-চক্র!"

পণরক্ষা

জিতেন গুপ্ত আর কৃষ্ণ চক্রবর্তীর অন্তর্ধানের পরই বক্সা বন্দী শিবিরে বে-পরোয়া নিপীড়ন সুরু হ'ল। কমাণ্ডাণ্ট কোটাম সাহেবের তেরিয়া মেজাজ। প্রতিপদে অপমান করতে চান রাজবন্দীদের। এই অসহনীয় অবস্থায় কি প্রতিকার করা যায় তারই জন্যে বৈঠক বসেছে পূর্ণানন্দের ঘরে। অহিংস অসহযোগের সাথে সাথে অবাঞ্ছিত অবস্থা প্রতিরোধের অথবা সঙ্কল্পসাধনের যে অস্ত্রটি মহাত্মাজী অসহায় দেশবাসীর হাতে তুলে দিয়েছেন পারিবারিক ক্ষেত্রে তার নাম অভিমান আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োপবেশন। জনৈক বন্ধু, সেই অস্ত্রটির দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করে বললেন—"এর প্রতিকারের একমাত্র উপায় হচ্ছে hunger strike। এর দ্বারা প্রতিবাদ জানানো তো হবেই—উপরন্তু মহাত্মাজীর কথায় আত্মশুদ্ধি দ্বারা আত্মিক বল লাভও হবে। প্রয়োপবেশন একপ্রকার আত্মিক ব্যায়াম—যাকে বলে Spiritual exercise—"

বাধা দিয়ে সুরপতি বললে—"খামকা খামকা হয়রাণ হইয়া লাভ কি?"

সকলে বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে চাইল। ধীরেশ জিজ্ঞেস করলে— 'তার মানে?"

সুরপতি বুঝিয়ে বললে—"সবেমাত্র সমিতিতে ঢুকছি। দাদারা কইছেন বীর হওন লাগবো—প্রতিদিন ব্যায়াম করন লাগবো। বোধ হয় সেটা বৈশাখ মাস। ভোরবেলা ঘরের মধ্যে আমি এনতার ডন দিত্যাছি। জোরে জোরে নিঃশ্বাস চোলত্যাছে। গা দিয়া ঘাম ঝোরত্যাছে। কি যেনি একটা কাজে মা ঘরে আইয়া আমার অবস্থা নি দেইখ-খ্যা অবাক হইয়া কইলেন—ওমা! তর্ কি হইছে ক' তো! খামাকা হয়রাণ হস্ ক্যান্?—সেই হইতে ব্যায়াম ছাড়ছি।

আপনাগো আত্মিক ব্যায়ামের কথা শুইন্যা মার কথাই মনে হইত্যাছে—খামাকা আত্মার হয়রানি কইরা লাভ কি ?”

অমূল্য, মনি, যশোদা, পূর্ণানন্দ প্রভৃতি বন্ধুরা একযোগে হেসে উঠল।

অনেক গবেষণার পর স্থির হ'ল—সহিংস আয়োজনে অহিংস উপকরণ কোন কাজেব কথা নয়। কমাণ্ডাণ্ট কোটাম সাহেবকে প্রহার দ্বারা প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। বিচারের জন্য জলপাইগুড়ি জেলে নিয়েও সেখান থেকে পালানোর সুযোগও মিলতে পারে।

কিন্তু মারা বললেই তো মাবা হয় না! কোটাম সাহেব অত্যাচারী। তাই নিজের সম্বন্ধে অতিশয় সাবধানী। আগের মত আর ক্যাম্পের মধ্যে যখন তখন আমড়াগাছি করে বেড়ায় না। সান্ত্রী সুরক্ষিত অফিস ঘরেই বসে—বাইরে বড় একটা যায়ই না। নিজেও দাঁত তক্ সশস্ত্র। এই অবস্থায় কি করে তার বর-অঙ্গে আঘাত দেওয়া যায় সেইটাই হ'ল সমস্যা। ধীরেন মুখার্জি বললে—“Hit the lion in his den—আফিস্‌মে কৌসিস্ করনা”—

তাই ঠিক করে রাজবন্দীরা বার বার সাহেবের সাক্ষাৎ চাইলে। জবাব কিন্তু এল না। এও এক ফ্যাসাদ! অবশেষে বীরেনদা বললেন—“ব্যাটাবে ' গালি দাও—coward কও। আরে কও হালা! তুমি তো বৃটিশের বাচ্চা নও—তুমি হইত্যাছ বাঙ্গালীর ঘরের বৌ।—দেখবা ঠিক ফল পাইবা। গালি নি খাইয়া অভিমানী দুর্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদ হইতে ফুঁপাইতে ফুঁপাইতে বাইরে আইছিল। মহাভারতে সে কাহিনী স্পষ্ট লিখা আছে। দাম্ভিক সাহেব-বাচ্চা কোটামরে গাইলে মাৎ করো······দেখবা সে নিশ্চয় কাৎ হইব।”

সত্যিই অদ্ভুত ফল পাওয়া গেল এই যুক্তিতে। গাল খেয়ে কোটাম সাহেব Interview দিলে। কিন্তু সাহেব আর তার রক্ষীদল এতই সজাগ যে দু'তিন দিন চেষ্টা করে কোনই ফল হ'ল না। চতুর্থ দিনে গেল পূর্ণানন্দ। ঘরে ঢুকে বসার আগেই সে ধাঁ করে

পা থেকে চটি জুতো খুলে নিয়ে ছুড়ে মারলে সাহেবের মুখে। সাথে সাথেই রক্ষীদল লাফিয়ে প'ল তার উপরে……,চলল লাঠি দমাদম। পূর্ণানন্দের মাথা ফেটে রক্তের ফিনকি ছুটল……চোয়ালের আর পাঁজরের হাড় ভেঙ্গে গেল। ঘণ্টা তিন বাদে রণাঙ্গনে আহত সৈনিকের মত আষ্টেপৃষ্ঠে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় পূর্ণানন্দ ফিরে গেল ক্যাম্পের ভেতরে।

সন্ধ্যার পর আবার বৈঠক বসেছে। বীরেনদা মাইকেলী ছন্দে বললেন—

"সমরে আহত আজি পূর্ণানন্দ বলী……
শূলী শম্ভু কাঁপে যার দাপে।
হায়! মোর পাপে—
বীরশূন্য হ'ল লঙ্কাপুরী!
পোহালে শর্বরী—
রণভেরী বাজিবে আবার……
এবে কোন বীরে বরি সেনাপতি পদে
রণে আমি হব আগুসার?"

ধীরেন মুখার্জি দাঁড়িয়ে মাইকেলী ছন্দেই তা'র জবাব দিলে—

"বীরশূন্য নহে লঙ্কা দেব!
পূর্ণানন্দ যদ্যপি আহত,—
গোরা-ত্রাস বীরবৃন্দ যদ্যপি বিফল,....
দাস তব রয়েছে সম্মুখে…
দেহ আজ্ঞা যাইব সমরে।
করি পণ, শুন সভাজন
নাকখৎ, থূৎকার লেহন
পাইকারী চাঁটি কিম্বা কর্ণ বিমর্দন

বরিব নিশ্চয়……
অক্ষম হই হে যদি
কোটাম প্রহারে।”

সভাজন ‘সাধু’ ‘সাধু’ রবে ধীরেন মুখার্জীকে প্রোৎসাহিত করল। সভা ভঙ্গ হ’ল।

পরদিন প্রাতে বীরেনদা ধীরেনের ভালে চন্দন লেপন করে কোটাম ব্যূহ অভিমুখে যাত্রার প্রাক্কালে “ধেনুর্বৎস প্রযুক্তা, দ্বিজ-নৃপ, গণিকা” প্রভৃতি স্বস্তি বচন উচ্চারণ করে তাকে বিদায় দিলেন। মহারথী ধীরেন্দ্রনাথ যথাকালে কোটাম ব্যূহে প্রবেশ করলো। টেবিলের অপর পারে উপবিষ্ট কোটাম সাহেবকে সম্ভ্রমে অভিবাদন করে শান্ত-ভাবে বসল সে। তারপর টেবিলের উপর দক্ষিণ করে কপোল বিন্যস্ত করে মৃদুস্বরে বললে—

“Mr. Cottam! I have known you to be one of the finest gentleman, I have ever seen. So this difference betweenyou andourselves pains me very much. I know there are some unreasonable men in us. Detention without limit has made some even desperate.” But it is amatter of deep regret that it enrages a level-headed man like you”—ফোঁৎ করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে ধীরেন। আরো অনেক ভাল ভাল কথা সে বললে। তার কথাবার্তার ধরণ-ধারণ দেখে আশ্বস্ত হলেন কোটাম সাহেব। ক্রমে অবিশ্বাস কেটে গিয়ে আলোচনা চলেছে হৃদ্যতার দিকে। রক্ষীদলও বুঝেছে স্বদেশীবাবুর খারাপ মতলব নেই। তবুও তারা কড়া নজর রেখেছে—টেবিলের উপরে ন্যস্ত ডান হাতের দিকে।

বিপদ তো ঐ হাত থেকেই। কিন্তু বাবুর মুণ্ড তো তাকে পেপার-ওয়েটের মত চেপে রেখেছে টেবিলের ওপরে। সুতরাং ভয় নেই। এধারে আলোচনা বেশ জমাট হয়ে উঠেছে। অকস্মাৎ সাঁ করে

একপাটী স্যাণ্ডেল ধীরেন বাঁ হাতে ছুড়ে মারলে কোটাম সাহেবের মুখে। ডান হাত ঠিক আছে। আঘাত পেয়ে সাহেব গর্জন করে উঠল। কিন্তু ততক্ষণে রক্ষীদল ঝাঁপিয়ে পড়েছে ধীরেনের ওপরে। পরক্ষণেই সুরু হ'ল লে-দনাদন্ ধোলাই। মুহূর্ত মধ্যে রক্তাক্ত, সংজ্ঞাহীন ধীরেন নীত হ'ল হাসপাতালে।

পরদিন প্রাতে আহত রথী ধীরেন্দ্রনাথকে ষ্ট্রেচারে করে নিয়ে আসা হ'ল পূর্ণানন্দদের ব্যারাকে। বন্ধুরা ঘিরে দাঁড়াল তার বিছানার চারধারে। যন্ত্রণায় তার সুন্দর মুখ নীল হয়ে গিয়েছে। বীরেনদাকে দেখেই তার মুখে ঈষৎ হাসি ফুটে উঠল। ধীরে ধীরে সে বললে—

"পদধূলি দেহ দেব! কর আশীর্ব্বাদ ;—
স্যাণ্ডেলিত করিয়াছি পাষণ্ড কোটামে
পণরক্ষা করিয়াছি অক্ষরে অক্ষরে—"

বীরেনদা তার মাথায় হাত রেখে বললেন—

"ধন্য বৎস! ভাল কীর্তি রাখিলে সংসারে।"

পলায়ান

বক্সা বন্দী শিবিরের কমাণ্ডাণ্ট কোটাম সাহেবকে প্রহারের অভিযোগে বিচারের জন্যে পূর্ণানন্দ আর ধীরেন মুখার্জিকে নিয়ে আসা হল জলপাইগুড়ি জেলে। আসার পথে তারা পাহাড়, পাহাড়ী ঝরণা আর গহনবনের গভীর সৌন্দর্য্য দেখে নিল প্রাণ ভরে। সবই যেন নূতন। এই পাহাড়ী ঝরণাটিতো তাদের বন্দীশিবিরের পাশ দিয়েই অবিরাম গান গেয়ে নেচে নেচে চলেছে,—দেখেওছে তারা অজস্রবার।

কিন্তু আজ যেন তার অপরূপ সৌন্দর্য্য নূতন করে তাদের চোখে পল, তার সঙ্গীত-মুখর নৃত্য ছন্দে তাদেরও প্রাণ নেচে উঠল। আসার পথে যত কিছু দেখতে পেল তারা,—পাহাড়ী স্ত্রী-পুরুষের বোঝা বহন কোরে পাহাড়ে ওঠা নামা, সমতলভূমিতে গরুর গাড়ীর ক্যাঁ—কোঁ শব্দে পথ অতিক্রম, চালকের দুর্বোধ্য গালিগালাজ আর দুইহাতে গরুর লেজমলা—বক্সারোড ষ্টেশনে যাত্রীদের আনাগোনা ইত্যাদি সব কিছুই নূতন তাৎপর্য্য নিয়ে প্রতিভাত হল উভয়ের কাছে। বন্দীশিবিরের বৈচিত্র্যহীন জীবনে প্রতিটি প্রভাত নূতন দিনের আগমন ঘোষণা করলেও সেটা একই দিনের পুনরাবৃত্তি মাত্র। সেই ঘর, সেই আঙ্গিনা, সেই প্রাচীর, সেই সাথী, সেই সান্ত্রী—সব সেই। একটু অদল বদল নেই। একটা দিনের অভিজ্ঞতা থেকে সব দিনের কাহিনী বেশ বর্ণনা করা যায়। সবদিন মিলে যেন একটানা একটা দিন। অথবা একটি দিনই যেন সন্ধ্যার পর আঁধারে অবগাহন করে ফিরে আসে বারে বারে। এই অবস্থার নিশ্চলতাকে অতিক্রম করে বন্দীরা যেদিন বের হয় পথে,—দেখে নূতন মুখ,—উপনীত হয় নূতন পরিবেশে, সেদিন্ তাদের অবরুদ্ধ জীবনের একটানা দিনের উপর ছেদ টেনে আবির্ভূত হয় নূতন একটি দিন। তাই তারা একে গ্রহণ করে অন্তর দিয়ে।

জলপাইগুড়ি জেলে প্রবেশ করেই পূর্ণানন্দ একবার চেয়ে দেখল চারদিক। তারপর নির্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে বন্ধুর দিকে চেয়ে একটু হেসে বললে—"মন্দ নয়।" ধীরেন সায় দিলে। বললে—"বেশ খোলা মেলাই আছে। গেট আর ব্যারাকের মাঝে মাঠটি বড়ই। আর ফুলের গাছও আছে কয়েকটি—"

পূর্ণানন্দ বাধা দিয়ে বললে—"চুলায় যাউক আপনার খোলা মেলা,—জেলের মধ্যে চাইনা ফুলের মালা। এখানে 'বেশ' কইতে যদি কিছু থাকে তা—ঐ"—

প্রাচীরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখালে সে। ধীরেন বুঝে মুচকি হাসলে।—নীচু স্বরে বললে—"হুঁ"—বেশ নীচু।"

এরপর থেকেই কারা-প্রাচীর লঙ্ঘনের আয়োজন চলতে লাগল। আগে হতেই এই জেলে তিন চার-জন বিপ্লবী বন্দী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রফুল্ল ত্রিপাঠী আর কালাচাঁদ ব্যানার্জি। দেশপ্রিয় জে, এম, সেনগুপ্তও ছিলেন সেখানে। তাঁর চেষ্টাতেই কোটাম মারা মামলায় বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ নিশীথ সেন, এবং জে, সি, গুপ্ত পূর্ণানন্দের পক্ষ সমর্থন করেন। মামলা তো জ্যায়সা কে ত্যায়সা। আসল কাজ হল পলায়নের সুযোগ অন্বেষণ,—আর তার আয়োজন। প্রফুল্ল ত্রিপাঠীর সহায়তায় কারাগারের জনৈক কর্মচারীর মারফত বাইরের সাথে যোগাযোগ সুসাধ্য হয়েছে। একজন সিপাহীর সাহায্যে লোহার শিককাটা করাতও একখানা আনা হয়েছে জেলের ভেতরে। কিন্তু শ্যেন-চক্ষু সেনগুপ্ত মহাশয়ের দৃষ্টি এড়ানো গেলনা। একদিন তিনি পূর্ণানন্দকে ডেকে নিয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলেন কোন সাহায্যের প্রয়োজন আছে কিনা।

চমকে উঠল পূর্ণানন্দ। শাঁ করে তার মন ফিরে গেল ১৯২৫ সালে। পূর্ণানন্দরা তখন বহরমপুর জেলে। রাতে জানালার শিক কেটে ধুতি বেয়ে দোতলা থেকে নীচে নেমে প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে পালানোর আয়োজন করেছিল তারা ছয়জন। তার মধ্যে ছিল

বিপ্লবীনায়ক রমেশ আচার্য, আশু কাহিলী,যোগেশ চ্যাটার্জি, জিতেশ লাহিড়ী, প্রতুল ভট্টাচার্য্য আর পূর্ণানন্দ। অত্যন্ত গোপন ভাবে চলেছে আয়োজন। হঠাৎ একদিন সকলের সাথে খেতে বসে প্রাদেশিক কংগ্রেসের তৎকালীন সেক্রেটারী অধ্যাপক অনিলবরণ রায়, এম, এল, সি বলে উঠলেন—"আয়োজনে সাহায্যের প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন মিটাতে গিয়ে বহু আয়োজন ব্যর্থ হয়।"

তারপরই দেখা গেল জেলের ভেতরে বাইরে কড়া পাহাড়া। গোপন তথ্য বেফাঁস হওয়ায় ফেঁসে গেল প্রচেষ্টা।

মাথা নীচু করে পূর্ণানন্দ দাঁড়িয়ে রৈল কিছুক্ষণ। তার হাব-ভাব দেখে দেশপ্রিয় বললেন—"কোন ভয় নেই। আমি সাহায্যই করতে চাই।"

সংশয় কেটে গেল পূর্ণানন্দব। শান্তভাবেই সে জবাব দিল—"আমরা জানি আপনি শুধু দেশপ্রিয় নন—আপনি বিপ্লবীদেরও পূজনীয়। কোন অসুবিধায় পড়লে অসঙ্কোচে আপনার সাহায্য নিমু।"

পূর্ণানন্দ বাইরের সাথে যোগাযোগ রেখে পালানোর ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ কবতে লাগল। কিন্তু অকস্মাৎ হল বজ্রপাত। পূর্ণানন্দ খবর পেল অবিলম্বে তার 'সেল' তল্লাসী করার জন্যে তার করেছে সেণ্ট্রাল আই, বি। ঝট্‌পট্ সবিয়ে ফেললে সে করাত খানি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ সাহেব, জেলের বড় সাহেব, জেলাব প্রভৃতি কর্তারা সিপাহীদের নিয়ে হাজির হলেন পূর্ণানন্দের ঘরে। জোর তল্লাসী চলল আধঘণ্টা ধরে। কোন কিছু না পেয়ে নিরাশচিত্তে তাঁরা গেলেন ফিরে।

এই ঘটনার তিন চাব দিন পবেই কোটাম প্রহাব মামলায় দণ্ডিত হয়ে ধীরেন আর পূর্ণানন্দ প্রেরিত হল রাজসাহী সেন্ট্রাল জেলে।

জেলে ঢুকেই তাদের চক্ষু ছানাবড়া। এখানকার ব্যবস্থা অতিশয় কড়া। পালানো তো দূরের কথা পাশ ফেরাই মুস্কিল।

জেল সুপার লিউক সাহেব পরম পাজী। হাতকড়ি, বেড়ী, চট-কাপড়, মাড়ভাত, ডাণ্ডাবেড়ী, ঘানি চাক্কী প্রভৃতিতে অতিষ্ঠ করে তুলেছে রাজনৈতিক বন্দীদের। কথায় কথায় অপমান, বিড়ম্বিত করে তুলেছে তাদের প্রাণ। ফলে মাঝে মাঝেই চলেছে অনশন-ধর্মঘট, তার উপরেও সমানেই চলে নির্যাতন। এই অত্যাচারের কাহিনী প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ছুটে গেল বাইরে। বিক্ষুব্ধ হল জনমত। সেই সময়ে শান্তিলাল ওরফে ছোট ফিলো (জিতেশ লাহিড়ী) ছিল রাজসাহীতে অন্তরীণ। অনুশীলন দলের উত্তরবঙ্গ সংস্থার পরিচালক ফেরারী মাষ্টারদা (ক্ষিতীশ দেব) দেখা করলে তার সাথে। শান্তিলালের কাছে কারাগারে অত্যাচারের বিবরণ আগেই পৌঁছে গেছে। ক্ষিতীশ তাকে জানালে দলের অবস্থা। দলে আভ্যন্তরীণ বিরোধ দেখা দিয়েছে। এখনই প্রতিরোধ না করলে হানাহানি সুরু হতে পারে একথাও বললে। কি উপায় করা যায়,—শান্তিলালের পরামর্শ চাইলে সে। শান্তিলাল শান্ত ভাবে জবাব দিল—"জন-বিক্ষোভকে রূপ দিতে হবে। অত্যাচারী লিউককে সরাতে হবে। এর দ্বারাই আভ্যন্তরীণ বিরোধ প্রতিহত হবে।"

প্রায় এক সপ্তাহ পরে আবার এল ক্ষিতীশ। শান্তিলালকে সে বললে—"বাগে পাওয়া যাচ্ছে না লিউককে। কি করে যে কাজ হাসিল করি!"

"গতিবিধি লক্ষ্য করেছ?" জিজ্ঞাসা করলে শান্তিলাল।

"হুঁ—সকাল আর সন্ধ্যায় মোটরে চড়ে বাংলো থেকে বেরোয়। আর কোন ফাঁক নাই"—জবাব দিলে ক্ষিতীশ।

"সাইকেল য়্যাক্সিডেণ্ট করে মোটর আটকাও—তারপর গুলি চালাও। কিন্তু সাবধান! পালানোর পথ ঠিক দেখো,—যেখানে আক্রমণ করবে তার বেশ কিছু দূরে লোক রেখো। ধরা পলেও আততায়ীর হাতে যেন অস্ত্র না পাওয়া যায়।"

এরপর কিছু দিন আর ক্ষিতীশের দেখা নেই। অকস্মাৎ একদা

সন্ধ্যায় সহরবাসী শুনে স্তম্ভিত হল যে লিউকসাহেব গুলির আঘাতে আহত হয়েছে—আর রাজসাহীর একটি ছেলে, ভোলা রায়—ধরা পড়েছে। হর্ষ আর বিষাদে ভারাক্রান্ত হল শান্তিলালের মন। জেলের রাজনৈতিক বন্দীরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

এই ঘটনার পর এক সপ্তাহ মধ্যেই পূর্ণানন্দ প্রেরিত হল আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলে। সেখানে এসেই তার চক্ষু চড়কগাছ! জেল আর অন্তরীণ থেকে যে সব বন্ধুরা দলের নূতন কার্যক্রম সফল করার জন্যে উধাও হয়েছিলেন তাঁরা সকলেই একে একে ধরা পড়ে ফিরে এসেছেন। শুধু তাই নয়। সারা ভারত জুড়ে যে সব বন্ধুরা তড়িৎগতিতে অভ্যুত্থানের আয়োজনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের অনেকেই ধরা পড়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী আগরতলায় ডাকাতি উপলক্ষে ধরা পড়েছে,—জিতেন গুপ্ত, প্রভাত চক্রবর্ত্তী আরও কতিপয় বিশিষ্ট বিপ্লবী, কলকাতার এক আড্ডায় ধরা পড়েছেন। তাঁদের সাথে ধরা পড়েছে বোমা, পিস্তল আর বিভিন্ন প্রদেশের বিপ্লবী আড্ডার সাথে যোগাযোগের ঠিকানা। তারই সঙ্কেত উদ্ধার করে পুলিশ হানা দিল বাংলার বিভিন্ন জেলার বিপ্লবী কেন্দ্রে,—ভারতের বহুস্থানে। সব মিলিয়ে পুলিশ দেখলে কি বিরাট ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পেতেছে বিপ্লবীরা। আসাম, মণিপুর, ত্রিপুরা, বাংলার প্রতিটি জেলা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, পাঞ্জাব, সর্বত্রই সক্রিয় এরা। একে ভিত্তি করেই গোয়েন্দা বিভাগ অগ্রসর হল আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্রের আবিষ্কারে।

পূর্ণানন্দ প্রথমটা একটু মুষড়ে গেলেও ধৃত বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে আবার পলায়নের প্ল্যান আঁটতে লাগল। যেতেই হবে বাইরে। সকল প্রয়াস সরকারের আঘাতে চুরমার হয়ে গেছে,-কিন্তু চলতেই হবে পথ, নিরাশ হলে তো চলবেনা বিপ্লবীদের। আরও মনে হল তার,—কাকে ধ্বংস করবে ইংরাজ সরকার,—কাকে ঠেলবে কারাগারে? বিপ্লব কি গুটিকয় মানুষ বা

তাদেরই একটা অনুষ্ঠান যে ধ্বংস হয়ে যাবে গ্রেপ্তারে, কারাগারে অত্যাচারে? শোষণে, অবিচারে, অত্যাচারে যার জন্ম, অবিচার অত্যাচার দিয়ে কি তাকে রোধ করা যাবে? বিপ্লব যে শোষিত জনগণের আত্মার বিক্ষোভ,—নিপীড়িত জনসমাজের বেঁচে থাকার একান্ত প্রয়োজনের ভয়াল অভিব্যক্তি। বিপ্লবীদল সমাজের অভ্যন্তরে শোষিত শ্রেণীর অধিকার লাভ সংগ্রাম চেতনার ধারক ও বাহক। দু দশ জন কর্মী, দু, চারটি প্রতিষ্ঠানের ধ্বংস বা বিলোপে বিলুপ্ত হবে না বিপ্লব-চেতনা। ঝিমিয়ে সে পড়তে পারে সাময়িক ভাবে। কিন্তু বাঁচার প্রয়োজনই তাকে করে তুলবে সংগ্রামশীল। সে সংগ্রামের নায়কত্বের ভার নেবে শোষিত সমাজের ভিতর থেকে গড়ে ওঠা অজ্ঞাত, অখ্যাত সৈনিকেরা। কালের এই দাবী মহাকালের মতই অতীব সত্য,—অতীব দুর্দম।

রাজশাহী জেলের অত্যাচারে পুর্ণানন্দের শরীর ভেঙ্গে পড়েছিল। সে হাঁসপাতালে গেল। তবে চিকিৎসার জন্যে নয়,—পালানোর সুযোগের সন্ধানে। পালানোর পক্ষে জেল হাঁসপাতালই সব চেয়ে সুবিধাজনক স্থান। কিন্তু হাঁসপাতালে গিয়েই পুর্ণানন্দ বুঝলে আর একজন বিপ্লবী এসেছেন সেখানে পালানোর সঙ্কল্প নিয়ে এবং দু'চার দিনের মধ্যেই তিনি তাঁর কল্পনাকে রূপ দিতে চান। ইনি বরিশালের ফণী দাশগুপ্ত,—যুগান্তর দলভুক্ত, বিপ্লবী হিসাবে একেবারে হীরের টুকরো। মৃদুমন্দ হাসি সর্বদাই মুখে লেগে আছে,—কিন্তু বিপ্লব সাধনার দুর্দান্ত এক সঙ্কল্প লুকিয়ে আছে তার পিছে। ফণীবাবুর সাথী নলিনী দাসও ফণীবাবুর মত ছাই চাপা আগুণ। এ দুটির জুটি মেলা ভার।

পুর্ণানন্দ সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে তাঁদের ওপরে। মনে মনে গর্বও অনুভব করল এঁদের সঙ্কল্পে। বাংলার বিপ্লবী ঐতিহ্য তবে নষ্ট হয়নি। পথের পাশে এলিয়ে পড়েনি দুর্গম পথের যাত্রীদল!

একদিন রাতে সাথীসহ ফণীবাবু শিক কেটে হাঁসপাতাল থেকে গেলেন বেরিয়ে। দুরু দুরু বুকে প্রতিটি মিনিট গুণতে লাগল

পূর্ণানন্দ। অকস্মাৎ আঙিনায় ছেড়ে দেওয়া কয়েকটি রাজহাঁস গভীর রাতে মানুষের আবির্ভাবে "প্যাঁক্" "প্যাঁক্" করে ডেকে উঠল। এই সর্বনাশ। প্রমাদ গণলো পূর্ণানন্দ। মুহূর্তের মধ্যে হাঁসপাতালের পাহারা—সিপাইয়ের বাঁশী বেজে উঠল—সঙ্গে সঙ্গেই আরো বাঁশী আরো বাঁশী—পাগলা ঘন্টি। উত্তেজনায় পূর্ণানন্দ উঠে দাঁড়াল শয্যা ছেড়ে। তারপরই থেমে গেল বাঁশী,—থেমে গেল ঘন্টি।

কয়েদীরা সিপাইকে জিজ্ঞেস করল—'ক্যা হুয়া সিপাইজী" ?

—"শালা স্বদেশী ডাকু লোগ ভাগ্‌তা থা। মটার পাকড়া গেয়া বড়ে পাঁচীল-কা-নগিচ"—জবাব দিল সিপাই।

বিষাদে ভরে গেল পূর্ণানন্দর অন্তর।

কয়েক দিনের মধ্যেই পূর্ণানন্দের সশ্রম কারাদণ্ডের ম্যাদ শেষ হল। রাজবন্দী হিসাবে সে প্রেরিত হল প্রেসিডেন্সী জেলে।

এখানে এসেই পূর্ণানন্দ বিশ্বস্ত বিপ্লবী বন্ধুদের সাথে মিলিত হয়ে দলের কার্যক্রম সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করলে। সকলেই একবাক্যে মত দিল—বাছা বাছা জনকতক কর্মীকে যেতেই হবে বাইরে। ভেতর থেকে যথাসাধ্য অর্থসাহায্যও করতে হবে দলকে। কারাগারের অভ্যন্তরে আর বাইরে উভয় স্থানেই সুনিয়ন্ত্রিত কার্যক্রম অবলম্বন করে হতে হবে অগ্রসর।

দলের বিশিষ্ট সভ্য ক্ষীরোদ দত্ত বললে—"বের হতেই হবে। কিন্তু আমার মনে হয় জোর করেই যেতে হবে—সিপাই সান্ত্রীদের সামনে দিয়েই।"

সায় দিয়ে গম্ভীরভাবে পূর্ণানন্দ বললে—"বার বার ব্যর্থ হইয়া আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু কি প্ল্যান করা যায় ?"

অনেক আলোচনার পর স্থির হল বাইরের বন্ধুরা মোটর কারে আসবে প্রাচীরের কাছে। রেড্ আর ব্লু-লাইটের সিগ্‌ন্যাল করবে তারা। জেল ব্যারাকের ভেতর থেকে আলোর সঙ্কেতেই জবাব দেবে বন্দীরা। জানাবে তারা শিক কাটা হয়েছে—তারাও প্রস্তুত।

তার পর ডিনামাইটের বিস্ফোরণে উড়ে যাবে জেল প্রাচীরের নির্দিষ্ট অংশ, ধূম্রজাল সৃষ্টি করে বন্দীরা যাবে পালিয়ে। এই প্ল্যান পাঠানো হল ফেরারী বিপ্লবীদের আড্ডায়। দুই সপ্তাহ পরে খবর এল সব প্রস্তুত। দুরূহ সাঙ্কেতিক ভাষায় খবরাখবর চলে। এর চাবী কাঠি না জানলে লিপির মর্মোদ্ধার অসম্ভব। মাত্র দু'চার জন বন্ধু এই সঙ্কেত জানে। বাইরের বন্ধুরা প্রস্তুত হয়েছে খবর পেয়ে পূর্ণানন্দ, ক্ষীরোদ এবং আরও অনেকে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। কিন্তু টাকা? টাকা যে পাঠাতেই হবে বাইরে। তারা তো কারাবাসের যাতনাকে এড়িয়ে গিয়ে শুধু আত্মগোপনই করতে চায় না। তারা চায় সর্ব্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিপ্লবী আন্দোলনের পুনর্গঠন সমাজবাদী ভিত্তিতে। ভারতব্যাপী বৈপ্লবিক সংস্থার প্রসার আব শোষিত জন সমাজের অধিকার দাবীর ভিত্তিতে সংগ্রামী সংগঠনে সৃষ্টি,—এই উদ্দেশ্য নিয়েই যে তারা যাবে বাইরে। সুতরাং অর্থ চাই--অর্থ চাই।

এই সময় অন্তরীণে যাবার পথে রাজসাহীর বিপ্লবী ছাত্র-নেতা সত্যেন্দ্র নাথ মজুমদার এল প্রেসিডেন্সী জেলে। চার পাঁচ জনে পরামর্শ করে তার সাথে অতি সংগোপনে দেওয়া হল একখানা হাজার টাকার নোট। পূর্ণানন্দ চুপি চুপি বললে তাকে নোট দিয়ে—"অন্তরীণ থেকে উধাও হতে হবে।" কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে খবর এল বাইরের গোয়েন্দারা সরাসরি লুক্কায়িত স্থানে তল্লাসী করে নোট বের করে ফেলেছে,—সত্যেন্দ্রনাথকেও আন্তঃপ্রাদেশিক মামলার আসামী শ্রেণীভুক্ত করে আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলে নিয়ে এসেছে।

চিন্তিত হল পূর্ণানন্দ! যে পাঁচ ছয় জন বন্ধু এই খবর রাখে তাদেরই কেউ নিশ্চয় বিশ্বাসঘাতক। তবে কি বেফাঁস হয়ে গেছে পালানোর প্ল্যান? যারা নিতান্ত অন্তরঙ্গ তাদের দু'তিন জনের সাথে ঝটপট পরামর্শ করে—সাঙ্কেতিক লিপিতে বাইরের বন্ধুদের সে জানালে—"Arrange Rope Ladder first,—Blow up wall if danger arises."

এবারেও স্থির করলে সে, বেশী লোক নয়,—মাত্র দু'জন—ক্ষীরোদ দত্ত আর সে—যাবে বাইরে। অবস্থা বুঝে অবশিষ্ট বন্ধুদের উদ্ধারের উপায় হবে পরে।

দিনক্ষণ স্থির হ'ল। নির্দিষ্ট রাত্রিতে পূর্ণানন্দ আর ক্ষীরোদ গুণতি এড়িয়ে রয়ে গেল ব্যারাকের বাইরে। রাত্রি প্রায় এগারোটায় উভয়ে প্রহরীদের চোখ এড়িয়ে একতলার ছাদে উঠে বুকে হেঁটে দুঘণ্টার চেষ্টায় বহিঃপ্রাচীরের নিকটে নির্দিষ্ট কোণে এসে নিঃশব্দে অবস্থান করতে লাগল। একঘণ্টা অপেক্ষা করেও আলোর ইসারা পেল না তারা। সুতরাং নিঃশব্দেই সুরু হ'ল শম্বুকের backward march। ভোরের আগেই তারা নেমে পল ছাদ থেকে। ভোরে দোর খোলার সাথে সাথেই মিলে গেল তারা বন্ধুদের দলে।

তারপর ফেরারীদের আ.ড্ডা থেকে খবর এল নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে এসেছিল তারা মোটর নিয়ে; কিন্তু প্রাচীরের বাইরে ছিল সজাগ প্রহরী। তাই তাদের যেতে হল ফিরে।

চট্টলের বিপ্লবী বন্ধু প্রতাপ রক্ষিতকে ক্ষোভের সাথে পূর্ণানন্দ বললে, "জেলের ভিতরে আমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই বিশ্বাসঘাতক আছে।"

মাথা ঝাঁকিয়ে প্রতাপ জানালে—"হুঁ—খু-উ-ব সাবধান!"

হঠাৎ খবর এল পুলিশ কাঁকুড়গাছির ফেরারী কেন্দ্রের সন্ধানে ফিরছে। ব্যস্ত হয়ে পূর্ণানন্দ বৌবাজার আড্ডায় সাঙ্কেতিক লিপিতে এই আসন্ন বিপদের কথা জানালে। কিন্তু সেখানে যারা ছিল কেউ এই লিপির মর্ম উদ্ধার করতে পারলে না। সর্বনাশ ঘটে গেল।—পাঁচ সাত দিন পর সন্ধান পেয়ে পুলিশ আর মিলিটারী কাঁকুড়গাছির ফেরারী আড্ডায় হানা দিয়ে দড়ির মই, মোটরগাড়ী, ল্যাবরেটরী, বোমা, ডিনামাইট আর প্রচুর মালমশলাসহ কয়েকজন বিশেষ সক্রিয় বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করলে। এর চেয়ে আরও যা সাংঘাতিক,—বিভিন্ন প্রদেশের সাথে যোগাযোগের ঠিকানাও পুলিশের হাতে এল! ভারতের সব কেন্দ্রে সুরু হল নূতন করে ধরপাকড়। ষড়যন্ত্রের ব্যাপকতায়

সরকারী মহল হল স্তম্ভিত,—আর বিপ্লবীদল হল ব্যর্থতার বেদনায় পীড়িত।

জেঁকে উঠল আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা। প্রভাত চক্রবর্তী, জিতেন গুপ্ত, সীতানাথ দে (ব্রহ্মচারী), নিরঞ্জন ঘোষাল, সত্যেন মজুমদার প্রভৃতি এই মামলার প্রধান আসামী।

ইতিমধ্যে পূর্ণানন্দকে দেওলী শিবিরে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরেই তাকে ফিরে আনা হল আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে, আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হিসাবে। আলীপুর জেলে ঢুকেই বন্ধুদের দেখে পূর্ণানন্দ বলে উঠল—"বাঃ—বাঃ—বেশ হইছে। একেবারে নরক গুলজার!"

তারপর সীতানাথ, নিরঞ্জন আর প্রভাতবাবুকে ডেকে সে বললে—"এবার শেষ চেষ্টা করতে হইব। পলাইতেই হইব এখান হইতে।"

"পলাইয়া কি হইব? সবতো ধরাই পড়ছে।" প্রভাতবাবু মন্তব্য করলেন। হা হা করে পূর্ণানন্দ উঠল হেসে। নীচু স্বরে বললে—"কে কারে ধরে! সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের শোষণে অত্যাচারে দেশে বিপ্লবের আগুন সর্বদাই ধোঁয়াইত্যাছে। আমরা বাহিরে যাইয়া আবার জ্বালুম সে আগুন। বিপ্লবী সর্বদাই বিপ্লবী। তার লাইগা জেল আর বাহির নাই"।

স্থির হল পালাতে হবে। কে কে যাবে তাও ঠিক করা হল। আরও স্থির করা হল বাইরের সাথে যোগাযোগে নয়,—ভেতর থেকে এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতে হবে।

চলল প্রস্তুতি।

"বড় পাচীলটা সতর ফিট উঁচা হইব। পর পর দুইজনরে যদি কাঁধে লই—তাহলেই তো পাচীলের মাথা নাগাল পাওয়া যায় হাত বাড়াইলে"—বললেন ব্রহ্মচারীজী।

সেই কসরৎই সুরু হল। কিন্তু ইতিমধ্যে বিপদ দেখা দিল আর

একদিক দিয়ে। পৃথক পৃথক ওয়ার্ডে রাখা হত সকলকে ভাল করে। অথচ একত্রে না মিশলে কল্পনাকে রূপ দেয়া যায় না। ট্রাইবিউনালের বিচারপতিদের কাছে আসামীরা আবেদন জানালে মামলা পরিচালন সম্পর্কে আলোচনার জন্যে তাদের মেলামেশা করতে সুযোগ দেয়া হোক।

বিচারপতিরা আদেশ দিলেন যেদিন মামলার শুনানী থাকবে তার পূর্বদিন আসামীরা কয়েক ঘণ্টার জন্যে মেলামেশা করবে।

এই আদেশের সুযোগ নিয়ে আবার চলল আয়োজন। ব্রহ্মচারীজি সাধুলোক। নিজের প্রকোষ্ঠে নাক টিপে বসে থাকেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সিপাইরা ভক্তি ভরে প্রণাম করে তাঁকে। তিনি তাঁদের করেন আশীর্বাদ। আবার কখনো কখনো তাদের ভূত ভবিষ্যতের কথা বলে দেন। অলৌকিক তাঁর ক্ষমতা।—কিন্তু তিনি যখন ধ্যানে বসেন নিতান্ত অন্তরঙ্গ দুই একজন ছাড়া কেউ প্রবেশ করতে পায় না তাঁর কুঠুরীতে। সামনে কম্বলের পরদা ঝুলান থাকে।

কাঁধে চড়ার মহড়া চলে এরই ফাঁকে।

একদিন এক সিপাই সীতানাথকে জিজ্ঞেস করলে—"বরম্‌-চারীজী! শুনতেহেঁ যোগীলোক আকাশমে বিচরণ কর সকতেঁ। ইয়ে বাৎ কেয়া ঠিক হ্যায়?"

মৃদু হেসে জবাব দিলেন ব্রহ্মচারী—"হাঁ—বেটা হ্যাঁ। উস্‌কো কুম্ভক কহলা যাতা হ্যায়। উও পরমবায়ুকা খেল হ্যায়। ইয়ে দেহ কোই চীজ্‌ নেহি বেটা—কোই চীজ নেহি। আস্‌লি চীজ হ্যায় বায়ু।"

সিপাই ভাবলে ধন্য সাধু। হাত যোড় করে নমস্কার করলে সে।

কাজ বেশ এগিয়ে যাচ্ছে। কসরৎ উৎরাচ্ছে চমৎকার। কিন্তু আরও একটি সুয়োগের দরকার। পালানোর দিনটি হওয়া চাই দুর্যোগময়। আঁধারে ঢেকে আসবে চতুর্দিক. ঝঞ্ঝায় আচ্ছন্ন হবে

দিগ্মণ্ডল, ঝড়, বৃষ্টি, অশনি সম্পাতের সাথে প্রকৃতি সুরু করবে—প্রলয় নাচন,—সেইতো হবে পলায়নের মাহেন্দ্রক্ষণ। কিন্তু অন্ততঃ চব্বিশ ঘণ্টা পূর্বেই তার আবির্ভাব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া প্রয়োজন।

আবহাওয়া তথ্যের বিশেষজ্ঞ ছাড়া ভাবী দুর্যোগ সম্ভাবনার হদিশ কে দেবে?

পূর্ণানন্দ চিন্তিত ভাবে বললে—"তাইতো অখন কি করণ যায়? চার মিনিট সময় আমার চাই। দুই মিনিট পাঁচীর টপকাইতে আর দুই মিনিট গুলির রেঞ্জের বাইরে যাইতে। দুর্যোগ ছাড়া চার মিনিট পাওন অসম্ভব। কূলের কাছে আইয়া নাও ডুববো?"

"আবহাওয়ার পূর্বাভাসের ভারটা আমার উপরে ছেড়ে দিতে পারেন"—বাধা দিয়ে বললে দ্বিজেন রায়। পূর্ণানন্দ হাতে স্বর্গ পেল। দ্বিজেন ছিল আবহাওয়া বিশেষজ্ঞ। তার দেয়া পুর্বাভাস দিনের পর দিন মিলে গেল অক্ষরে অক্ষরে।

৩০শে জুলাই। দ্বিজেন রায় পূর্ণানন্দকে জানাল পরদিন দুপুর বেলা থেকেই ভীষণ দুর্যোগের সম্ভাবনা আছে।

৩১শে তারিখ বারোটার মধ্যেই বন্ধুদের সাথে দেখাশোনা করে পূর্ণানন্দরা ছয়জন সমবেত হল নির্জন প্রকোষ্ঠে। বেলা দুটার সময়—আকাশ কালোয় কালো হয়ে গেল। তার পরেই শোঁ—শোঁ—বোঁ—বোঁ করে উঠে এল প্রচণ্ড ঝড়। এত তার গতি বেগ—যেন সে তার চলার পথে মানুষের তৈরী সকল বাধা চুরমার করে দিয়ে যেতে চায়। ঝঞ্ঝার সাথে সাথে সুরু হল প্রবল বর্ষণ। পূর্ণানন্দরা সাতজন বেরুল সেল থেকে তাদের মনের গতি যেন প্রকৃতির প্রলয়ঙ্কর উন্মাদ নাচনকেও অতিক্রম করছে। দুর্যোগের রুষ্ট ভ্রূকুটীকে উপেক্ষা করেই দুর্বার সঙ্কল্প বুকে নিয়ে বের হল তারা ঘর থেকে।

"হাঃ—হাঃ—হাঃ"—উন্মাদ অট্টহাসি ফেটে পড়ল পশ্চাতের দেয়ালে প্রতিহত হয়ে। বজ্রাহতবৎ ফিরে দাঁড়ালে অভিযাত্রী দল। সভয়ে

দেখল তারা "আমি যাব"—"আমি যাব" শব্দে ছুটে আসছে জ্যোতি-মুকুল ঘোষ। কিছুদিন যাবৎ মাথা খারাপ হয়েছে বেচারার!

পূর্ণানন্দ আর নিরঞ্জন ছুটে গেল তার কাছে। আদর করে বুঝিয়ে বললে—"যাও ভাই!—ফিরে যাও"—

"না—আমি যাবই"—দৃঢ়তার সাথে জবাব দিল জ্যোতিমুকুল। ছুটে চলল সে প্রাচীরের দিকে।

উপায়ান্তর না দেখে সীতানাথ খবর দিল সিপাইকে। তিন চারজন সিপাই জোর করে তাকে ধরে নিয়ে গেল হাসপাতালে।

আর পলক মাত্র দেরী করা চলে না। কিন্তু সীতানাথরা তিনজন যেমনি আঙ্গিনার ছোট দেয়াল টপকাতে যাবে অমনি প্রহরারত সিপাই বিপদের সঙ্কেত দেবার জন্য বাঁশী বের করল। সীতানাথ ও আরও দুইজন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁশী কেড়ে নিল। তারপর তার মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে বেঁধে ফেলল তার হাত পা। সিপাইটি হাতজোড় করে চাইলে প্রাণ ভিক্ষা। পূর্ণানন্দ আদেশ দিলে দেয়ালের দিকে মুখ রেখে চুপচাপ বসে থাকতে। প্রাণ ভয়ে মেনে নিলে সে এই আদেশ।

টকাটক ছোট দেয়াল পার হয়ে ছয়জন ছুটল বড় দেয়ালের দিকে। সেদিকে যাবার একটি মাত্র পথে যে গেটটি আছে তাকে শক্ত করে কাপড় দিয়ে বেঁধে শরীরের সমস্ত জোরে গেটটি ঠেলে ধরে অভিযাত্রী দলকে আক্রমণের পথ রোধ করে দাঁড়াল অমূল্য সেন।

পূর্ণানন্দরা ছয়জন এক দৌড়ে যেমনি দেয়ালের কাছে পৌঁছেছে অমনিই বিপদ বাঁশী বেজে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গেই এদিক ওদিক সবদিক থেকেই বিপদ বাঁশী বেজে উঠল পাগলা ঘণ্টা পাগল হয়েই দুলতে লাগল ঢং—ঢং—ঢং—ঢং।

ভ্রূক্ষেপ নেই, ইতস্তত: নেই অভিযাত্রীদলের। পরিকল্পনা মত দুইভাগে বিভক্ত হয়ে তারা টকাটক কাঁধে উঠে পড়ল। যেন সার্কাসের

শিক্ষিত খেলোয়াড়। এক ব্যাচে সকলের উপরে ছিল পূর্ণানন্দ—আর এক ব্যাচে সীতানাথ। প্রায় একই সময়ে উভয়ে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল প্রাচীরের ওপর। প্রকৃতির উন্মত্ত তাণ্ডব চলছে সমানেই। তার সাথে সাথে আলোড়িত হয়েছে সমগ্র কারাগার। বন্দুক, বেয়নেট, লাঠি, ডাণ্ডা নিয়ে সিপাইরা আসছে ছুটে, সেণ্ট্রাল টাওয়ারের প্রহরী নিশানের সঙ্কেতে নির্দেশ করে দিচ্ছে লক্ষ্যস্থল, সিপাইরা ছুটে আসছে সেইদিকে। কিন্তু ওকে? কে ঐ রুদ্ররূপী মহাকাল মূর্তিমান প্রলয়ের মাঝে নির্বিকার দাঁড়িয়ে আছে? ওকি প্রবীরের শিবিরের প্রহরী নীলকণ্ঠ ত্রিপুরারি? ও কি মানব? ও কি দানব? ও কি দেবতা—যে দৈত্যপুরীর হিংস্র আক্রমণ প্রতিহত করতে চায় নিজের দেহ দিয়ে? পূর্ণানন্দ আর সীতানাথ চকিতে চেয়ে দেখল এই দ্বাররক্ষী দানব নয়, মানব নয়, দেবতাও নয়,—সে বিপ্লবী—তাদেরই বিপ্লবী বন্ধু অমূল্য সেন। আজ তার আত্মোৎসর্গ, তার দৃঢ়তার কাছে থার্মোপলি, হলদিঘাট ম্লান হয়ে গেছে, দুর্গতোরণে ত্যজে যে পরাণ সেই দুর্গেশ দুমরাজও অতিক্রান্ত হয়েছে এই বিপ্লবী মহাবীরের উদ্দেশে যুক্তকরে অভিবাদন জানিয়ে সীতানাথ আর পূর্ণানন্দ—ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রাচীরের অপর পারে। এক মিনিটেই হরিপদ দে আর নিরঞ্জন ঘোষাল প্রাচীর ডিঙ্গাল। তারপর চারজন গঙ্গায় দিল ঝাঁপ।

জেলের পাগলা ঘন্টির প্রবল ঢং ঢং তখনও চলছে—একটা রাইফেলের শব্দও হ'ল যেন—পূর্ণানন্দর বুক যেন বিদ্ধ হ'ল সুতীক্ষ্ণ শায়কে—তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল অস্ফুট কাতরোক্তি—"অমূল্য সেন—অমূল্য সেন।"

চিঠি

হরিপদ, নিরঞ্জন আর ব্রহ্মচারী সাঁতরে পার হল কালিঘাটের গঙ্গা। কিন্তু স্রোতের প্রবল টানে পূর্ণানন্দ চলল ভেসে। রোগাক্রান্ত ক্লান্ত, অবসন্নদেহ,—উত্তেজনায়, আশঙ্কায় ও দায়িত্বের গুরুভারে পীড়িত মন নিয়ে সন্তরণে অপটু পূর্ণানন্দ উঠল হাঁপিয়ে। হাতের ইসারায় বন্ধুদের জানালে চলে যাও—চলে যাও তোমরা। বন্ধুরা দেখল সে ডুবছে আর ভাসছে—স্রোতের টানে ভেসে চলেছে সেতুর দিকে! দেখলে তারা পূর্ণানন্দের নিমজ্জমান অবস্থা,—বুঝলে আর মুহূর্তের মধ্যে তার অক্ষম দেহ সেতুর থামে আহত হয়ে তলিয়ে যাবে গঙ্গাগর্ভে। ব্রহ্মচারী আর হরিপদ আবার ঝাঁপ দিলে গঙ্গায়! ক্ষিপ্রতার সাথে সাঁতরে এসে চরম মুহূর্তের পূর্বেই তারা ধরল চেপে পূর্ণানন্দকে। তারপর তাকে একরকম বহন করেই উপনীত হ'ল অপর পারে!

একখানা ট্যাক্সি ভাড়া করে চলে এল তারা বালিগঞ্জে। প্রত্যেকের কাছে রয়েছে দশটি করে রুপোর টাকা। বালিগঞ্জ ষ্টেশনের কাছে হরিপদ নেমে গেল জনৈক বন্ধুর সন্ধানে।—কথা ছিল শুকনো কাপড় চোপড় নিয়ে সে মিলিত হবে যাদবপুর ষ্টেশনের ওপারে,—সন্তোষপুরে। কিন্তু এক ঘন্টার মধ্যেও সে ফিরে এল না। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে নিরঞ্জন বললে—"অসম্ভব। এত দেরী হতেই পারে না, নিশ্চয়ই বিপদ ঘটেছে।"

অগত্যা ষ্টেশনে এসে ট্রেনে চেপে বসলে তিনজন। যাত্রীদের মুখে মুখে শুনতে পেল তারা—আলীপুর জেল থেকে বোম কেসের বন্দী পালিয়েছে,—একজন ধরা পড়েছে বালিগঞ্জ ষ্টেশনে।

বিমর্ষ হল পূর্ণানন্দরা। কিন্তু বিপ্লবী তারা—এগিয়ে যেতে হবে তাদের,—পেছন ফিরে চাইলে চলবে না! কণ্টকময় দুস্তর পথে পড়ে গেল কোন প্রিয়তম পথের সাথী ভাই,—ফিরে দেখবার তো অবসর

নেই। একটা দীর্ঘশ্বাস, একটু হা হুতাশ পিছনে পড়া বন্ধুর জন্তে পেছনে রেখে আগামী দিনের আশ্বাসে বুক বেঁধে এগিয়েই যেতে হবে সমুখ পানে।

এক মাসের মধ্যেই বিপ্লবী সংগঠন আবার দানা বেঁধে উঠল। পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, আসাম আর বাংলার বিভিন্ন জেলার বিপ্লবীদের সাথে সংযোগ স্থাপিত হল। কিন্তু তারপর? সমস্যা দেখা দিল দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা নিয়ে।

গান্ধী আরুইন চুক্তির পর জনতার আসমুদ্র হিমাচল ব্যাপী উদ্দাম বিক্ষোভ নেতিয়ে পড়েছে, উন্মত্ত ঝড় যেন থেমে গিয়েছে। জনতার অভ্যুত্থানের সম্ভাবনাহীন পরিস্থিতিকে কি করবে গুটিকয় বিপ্লবী? কয়েকটি রাজপুরুষের, কতিপয় শ্বেতাঙ্গ বণিকের জীবন নিয়ে কি করবে তারা? তাতে কি সম্ভব হবে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান?

কলকাতার শহরতলীর এক গৃহে এই নিয়ে চলল আলোচনা। পূর্ণানন্দ সকলকে বুঝিয়ে বললে—"দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন রইলে বিপ্লবের নাগাল পামু না। আমাদের যে সব বন্ধু কংগ্রেস আন্দোলনের পুরোভাগে আছে তাগো সাথে আমাগো ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখতে হইব। গান্ধীজীর আন্দোলনের বাহ্যরূপ বিপ্লবী। কিন্তু অন্তর হইত্যাছে আপোষকামী। তাই—"

বাধা দিয়ে জনৈক বন্ধু বললে—"গান্ধী আরুইন চুক্তি কি সেই আপোষ?"

"না—তা নয়! তাই দেশের অবস্থা আপোষের উপযোগী কইরা গড়নের লাইগা আবার আন্দোলন চালাইতে হইব। নিশ্চয় আইব আন্দোলন। আমাগো সেই সুযোগ লইতে হইব। Movement যখন ব্যাপকভাবে সুরু হইব তখন আমরা আক্রমণোদ্যোগ কংগ্রেস নেতাগো হাত হইতে ছিনাইয়া নিজ হাতে নিমু,—জনসাধারণের বিক্ষোভরে বৈপ্লবিক রূপ দিমু"—

"বাঃ—বাঃ—চমৎকার"—বলে উঠলেন ব্রহ্মচারী।—"পুরাণের

ঘণ্টাকর্ণ রাক্ষসের পর্বের লগে হুবহু মিইলা যায়। ভগীরথ ঘণ্টা বাজাইয়া আগে আগে যায়,—গঙ্গা পিছে পিছে ধায়। কিন্তু রাজমহলের পর ভগীরথ যেমনি মোড় লইছে অমনি রাক্ষস ঘণ্টাকর্ণ তার রূপ নি ধইরা ঘণ্টা বাজাইয়া গঙ্গারে সিধা পথে টানছে। দেবী গঙ্গা সেই স্থান হইতে ভীমা ভৈরবী পদ্মা রূপে গর্জন কইরা চলছে—সাগরে।"

"অর্থাৎ আমাদের ঘণ্টাকর্ণের পার্ট প্লে করতে হবে" বললে বিহারের এক বন্ধু।

"হ্যাঁ—তারই জন্যে চাই উদ্যোগ,—চাই আয়োজন। প্রচুর ভাবে অর্থ—অস্ত্র সংগ্রহ করতে হইব, বোমার ফ্যাক্টরী বানাইতে হইব, পুলিশ মহলে, সেনাদলে রিক্রুট চালামু, যোগাযোগ ব্যবস্থারে paralyse করুম। আমাগো প্রস্তুতির উপর সব কিছু নির্ভর করত্যাছে। আমরা অপ্রস্তুত রইলে ব্যর্থ হইব জন জাগরণ—জনতার বিপ্লবী আগ্রহের সুযোগে কংগ্রেসের নেতারা আপোষের ক্ষেত্র রচনা করব।"

আয়োজন সফল করতে হলে নিভৃত স্থানে একটি বড় বাগান বাড়ীর প্রয়োজন। অথচ সেটা কলকাতারই আশে পাশে হওয়া চাই। লোক সমাগমে যেন সন্দেহের উদ্রেক না করে। এই রকম একটা বড় বাড়ী পাওয়া গেল টিটাগড়ে। কিন্তু মেয়ে না দেখলে ভাড়া কেউ দেয় না। সে সমস্যারও সমাধান হল। কুমিল্লার উৎসাহী বিপ্লবীনায়ক অমূল্য মুখার্জীর বোন পারুল পার্টির প্রয়োজনে কিছুদিন আগেই ফেরার হয়েছে। তাকে নিয়ে এসে টিটাগড়ের বাসা ভাড়া নেয়া হল। কাজ সুরু হল পুরোদমে। কিন্তু হঠাৎ সর্বনাশ। একদা প্রত্যূষে প্রচুর পুলিশ আর মিলিটারী বাসাটি ঘিরে ফেলল। সাথী সঙ্গী সহ পূর্ণানন্দ বমাল ধরা পল।

এই থেকেই সুরু হল টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা। ক্রমে ক্রমে নিরঞ্জন, ব্রহ্মচারী সকলেই ধরা পলেন। আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র আর

ঘটিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা জেঁকে উঠল। দুই মামলাতেই কাশ্মীর থেকে বোম্বাই, গুজরাট থেকে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত, সুগঠিত, সুসংহত, সুনিয়ন্ত্রিত ও শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান অনুশীলন সমিতির সভ্যগণের বিপ্লবপথে গোপন অভিযানের সমাপ্তি ঘটে। এর পর থেকে এই দলের অধিকাংশ সক্রিয় কর্মী মার্কস ও লেনিনের নির্দিষ্ট সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচী গ্রহণ করে রামগড়ে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের প্রতিষ্ঠা করে।

রামগড় কংগ্রেস। কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র রামগড়েই আপোষ বিরোধী সম্মেলন ডেকেছেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিপ্লবী কর্মীরা সমবেত হয়েছে তাঁর চারপাশে। পাশাপাশি চলছে কংগ্রেসের অধিবেশন আর আপোষ বিরোধী সম্মেলন। কিন্তু সুরু হল পেল্লায় বারিপাত। মণ্ডপ, তাঁবু ছিঁড়ে ছুঁড়ে, ক্যাম্পের ভেতর দিয়ে ছুটল জলের প্রবাহ। বিছানা, জামা যার যা ছিল সব ভিজে লটপট। এরই মধ্যে ভেজা, চুপসা কাকের মত কাঁপতে কাঁপতে আপোষ বিরোধী সম্মেলনের ডেলিগেট ক্যাম্প থেকে সমর কংগ্রেস ক্যাম্পে এসে প্রবীরদাকে খুঁজে বের করলে। বৃষ্টিতে ভিজে সমরের দেহটা কাঁপছে, কিন্তু তার অন্তরে নবচেতনার আগুণ জ্বলছে।

প্রবীর আর সমর দুজনেই অনুশীলন দলের বিশিষ্ট সভ্য ছিল—দুজনেই এক সাথে কংগ্রেসের কাজ করেছে। কিন্তু রামগড়ে দু'জনে পা বাড়াল দুই দিকে। প্রবীর নৈষ্ঠিক কংগ্রেসী,—আর সমর বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী। তবুও দু'জনেই ভালবাসে দুইজনকে। প্রবীরের তাপস তুল্য নিষ্কাম নিষ্ঠা শ্রদ্ধা জাগায় সমরের মনে, আর সমরের আপন ভোলা বৈপ্লবিক আগ্রহ,—তার প্রাণবন্ত উৎসাহ, চরিত্রের নির্মলতা—সম্ভ্রমের আসন গড়ে তুলেছে প্রবীরের অন্তরে।

কতকটা নির্জন স্থানে সরে এসে সমর বললে—"বীরুদা! আর

কেন ? সরে আসুন কংগ্রেস থেকে। দেখেছেন তো, হাইকম্যাণ্ড বিপ্লবকে কি ভাবে নির্বাসিত করেছেন কংগ্রেস থেকে।"

"ভুল—ভাই। ভুল। এতবড় বৈপ্লবিক জাগরণ যিনি এনেছেন দেশে,—সেই মহাত্মা কখনও বিপ্লবের পরিপন্থী হতে পারেন না। দেশকে মুক্তির পথে এগিয়ে দিতে একমাত্র তিনিই পারেন। সুভাষবাবু মস্ত ভুল করেছেন কংগ্রেস থেকে সরে গিয়ে"—শান্তভাবে জবাব দিলেন প্রবীরদা।

"মহাত্মা গান্ধীর কথা বলছেন বীরুদা ? আচ্ছা বলতে পারেন দেশের লোক তাঁকে কেন "দেশপ্রাণ" "দেশব্রত" এই সব বলে না ডেকে "মহাত্মা" বলে ডাকে ?"

—"কারণ তাঁর আত্মা বিশ্বের মহান কল্যাণে নিয়োজিত"—আশু বেড়ে জবাব দিলেন প্রবীরদা।

"ঠিক সেই কারণেই আমার মনে সন্দেহ হয় বীরুদা! দেশের কল্যাণের চাইতে ব্যক্তিগত পবিত্রতাই বুঝি মহাত্মার কাছে বড়। তাই ভয় হয় মহাত্মা বুঝি দেশভক্ত নন। তিনি যখন বলেন, দেশমুক্তির চেয়ে সত্য ও অহিংসাই তাঁর কাছে বড়, তখন ঠিক বুঝতে পারিনে তিনি দেশভক্ত—না যীশু, বুদ্ধ। স্বামীজির বাণী—"দেশের জন্ম আমি হাজার জনম নেব, লাখো নরকে যাব"—আপনার কাছেই শুনেছি। এর সাথে তো মহাত্মার কথার মিল নেই।"—ধীরে ধীরে বললে সমর।

প্রবীর অস্বস্তি বোধ করছিল। ইতস্ততঃ ভাব কাটিয়ে জোরের সাথে বললে—"মনে রেখো Mahatma is a political leader, তাঁর কথার তাৎপর্য আমাদের Plane থেকে বোঝা অসম্ভব।"

"তারপর আরো দেখুন কংগ্রেসের নায়কত্ব ধনিক ও অভিজাত শ্রেণীর হাতে। তারা কি কখনও বিপ্লবী হতে পারে ? এই অবিপ্লবী প্রভাব তো মহাত্মার আশীর্ব্বাদেই পুষ্ট হচ্ছে দিনের পর দিন। এটা কি সুদিনের সূচনা ? বীরুদা!"

"ইজ্‌মের বদহজম বিগড়ে দিয়েছে তোমাদের মাথা। কিন্তু ঠিক

জেনো একদিন না একদিন তোমাদের ভুল ভাঙ্গবে। সেদিন বুঝবে সত্যের পথ ছেড়ে আলেয়ার পিছে বৃথাই ছুটাছুটি করে মরেছ। এখন ভিন্ন পথে যাচ্ছো—যাও। কিন্তু অচিরেই তোমাদের মোহ ভঙ্গ হবে। সে আঘাত সইবার শক্তি থাকে যেন”—দৃঢ়তার সাথে বললে প্রবীর। এখানেই থেমে গেল সেদিনের আলোচনা।

রামগড়ের পর প্রবীর আর সমর দুজনে চলে গেল দুদিকে। প্রবীরের মন জুড়ে “বন্দেমাতরম্—মহাত্মা গান্ধীজী কি জয়”—আর সমরের মনে বাসা বেঁধেছে “ভূখা ভাইয়োঁ এক হো,—ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ”। তাদের মধ্যে দেখা সাক্ষাতও আজকাল খুবই কম হয়।

সমগ্র বিশ্বের রাজনৈতিক গতি যেন ধাঁ ধাঁ করে এগিয়ে চলছে। পৃথিবীটা যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে মহা প্রলয়ের সম্ভাবনায়। ১৯৩৯ সাল দেখা দিল বিশ্ব-সমরের আশঙ্কা নিয়ে। বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র মুক্তি-পাগল অট্টহাসি হেসে বরণ করতে চাইলেন সেই ভয়ঙ্কর সম্ভাবনাকে,—আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করে বজ্রের স্বরে ঘোষণা করলেন—“এবার বাঁধন ছিঁড়তে হবে,—প্রস্তুত হও বন্ধুগণ।” এদিকে মহাত্মার প্রভাব পুষ্ট কংগ্রেস নেতৃত্ব এই আসন্ন ঝড়ের মুখে শঙ্কিত, বিহ্বল, দ্বিধাগ্রস্থ। ভারত কি করবে এই সঙ্কটে? কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই।

অবশেষে হুড়মুড় করে এসে পল বিশ্ব-সমর। তারই প্রাক্কালে সুভাষচন্দ্রের আহ্বানে কতিপয় বিপ্লবী নায়ক মিলিত হলেন তাঁর ভবনে। দেখলেন তাঁরা সুভাষ বাবুর রুদ্ররূপ। কংগ্রেস নেতৃত্বের নিষ্ক্রিয়তা তাঁকে যেন ক্ষেপিয়ে তুলেছে। উন্মত্তের মত তিনি বললেন—“দেশের নেতারা এই সঙ্কটে যেমন Bungling করেছেন অন্য কোন দেশ হলে এঁদের সরিয়ে দিত।”...

যুদ্ধ লাগার সাথে সাথেই জার্মানদের প্রচণ্ড আক্রমণে চুরমার হয়ে গেল পোলাণ্ড, হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, ফ্রান্স। ঝাঁকে ঝাঁকে জার্মান বিমান ফেলতে লাগল বোমা লণ্ডনে। সুন্দর যুগ যুগ ব্যাপী মানব

সভ্যতার লীলাকেন্দ্র প্যারি নগরী আর বিগত ইঙ্গ সভ্যতার অনবদ্য সৃষ্টি ওয়েষ্টমিনিষ্টার টাওয়ারের কথা ভেবে ব্যথিত হল মহাত্মার মন। ন যযৌ ন তস্থৌ নীতিতে অতিক্রান্ত হল আড়াই বৎসর।

এরই মধ্যে সুভাষচন্দ্র দেশ থেকে পালিয়ে গিয়েছেন। সরকার বিপ্লবীদের জেলে পুরেছে। কম্যুনিষ্ট পার্টি—রুষ-জার্মান সংগ্রাম সুরু হবার সাথে সাথেই—ইংরাজের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকেও জন যুদ্ধ বলে প্রচার করেছে!

এই সব ঘটনা দাগ কেটে যাচ্ছে প্রবীরের মনে। তার মন যেন সঙ্গতি খুঁজে পায় না কংগ্রেসের অচল-পন্থায়। তাই মাঝে মাঝে দিশাহারা হয়ে সমরকে চিঠি লেখে। হতাশার সুর বেজে ওঠে ছত্রে ছত্রে! এক পত্রে লিখলে সে—"বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মানব আঁধারের মাঝে বসে আলোর তপস্যায় মগ্ন। সার্থক কি হবে না তাঁর তপস্যা,—ব্যথাহত বিশ্বে আলোর রেখা কি ফুটে উঠবে না?"

পত্র পেয়ে সমর একটু হাসলে। জবাব দিলে—"আঁধারের মাঝে আলো জ্বালতে হলে লোহা বা পাথরের মত শক্ত দুটো কিছুতে ঠোকাঠুকি করতে হবে,—নয় দেশলাই ধরাতে হবে। কিন্তু ওতে সংঘর্ষ আছে—দাহ আছে বলে ওতে যদি হাত না দিই, আলো জ্বলবে না। চুপ করে বসে থাকতে হবে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে প্রভাত হবার প্রতীক্ষায়।"

ক্ষুণ্ণ হল প্রবীর চিঠি পেয়ে। তার মনে হল দু পাতা মার্ক্স, লেনিন পড়ে ওরা সবজান্তা হয়ে গিয়েছে। মহাত্মার আন্তরিকতায় সন্দেহ করে! এত বড় ধৃষ্টতা ওদের! অনেকদিন পর্যান্ত সমরের কাছে আর কোন চিঠি দিল না সে।

ইতিমধ্যে ভারতকে আলোড়িত করল মহাত্মার "ভারত ছাড়" প্রস্তাব। এর পশ্চাতে অমিত বীর্যের সন্ধান পেয়ে খুশীতে ভরে গেল প্রবীরের মন। সে চোখের সামনে দেখতে পেল এক বিপ্লবের সূচনা। ভারতের মুক্তি সমরের এক গৌরবময় অধ্যায় খুলে গেল তার সশ্রদ্ধ

দৃষ্টির সম্মুখে। মহাত্মা গ্রেপ্তার হয়েছেন,—গ্রেপ্তার হয়েছেন কংগ্রেসের নায়কবৃন্দ। কিন্তু দেশের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে মহাত্মা গান্ধীর বিপ্লবী নির্দেশ—'ভারত ছাড়' 'ছাড় ভারত'।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে প্রবীর সমরকে লিখলে—"এবার হয়ত নিজের ভুল বুঝতে পেরেছ। এবার হয়ত স্বীকার করবে মহাত্মা সংগ্রাম-কাতর নন। তবে সংগ্রাম-সাধনায় তাঁর নিজস্ব একটা টেকনিক আছে। তিনি প্রতিপক্ষের প্রীতি কামনাই প্রথমে করেন তাকে বে-কায়দায় ফেলার জন্যে।"...

সপ্তাহ মধ্যেই জবাব এল সমরের। সে লিখেছে—"কিন্তু বীরুদা! প্রীতি কামনা আর সংগ্রামের এই টেকনিকের পিছনে লুকিয়ে থাকে আপোষের গোপন প্রতীক্ষা। তবুও আমরা—বিপ্লবী সমাজতন্ত্রীরা বরণ করে নিয়েছি মহাত্মার এই আহ্বান। তাঁর ডাকে দেশ সাড়া দিবে, উদ্বেলিত হয়ে উঠবে জনতার বিক্ষোভ—, মন প্রাণ দিয়ে এই কামনাই করেছি আমরা। স্বার্থান্ধ সাম্রাজ্যবাদ মস্ত বড় ভুল করেছে মহাত্মাকে গ্রেপ্তার করে। বিপ্লবের পথে অহিংসা নীতির প্রবল বাধা তারা অপসারিত করে শুধু নির্ভর করেছে পাশবিক শক্তির উপরে। তাদের এই ভুলের পূর্ণ সুযোগ নিয়ে আমরা গণ বিক্ষোভকে সত্যিকারের বৈপ্লবিক রূপ দেবার চেষ্টা করব এবার। চৌরিচৌরা আর ফিরবে না,—এজন্যে আমরা বাস্তবিকই আনন্দিত বীরুদা।"

চিঠি পড়ে প্রবীরের মনে হল মার্কস্‌বাদের কি হলাহলই না বিষিয়েছে এদের মন। তবুও সমরের নিষ্ঠায় মুগ্ধ হ'ল সে।

দুই তিন দিন পরে সে গ্রেপ্তার হয়ে জেলে গেল। জেলে বসেই শুনল—বোম্বাই, সাতারা, বালিয়া, গোণ্ডা, বিহার, মেদিনীপুরে বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠেছে। তার কেটে, রেললাইন উপড়ে, থানা, ট্রেজারী, জেলখানা আক্রমণ করে—জনতার বিপ্লব-অভিযান এগিয়ে

চলেছে দিনের পর দিন। বিহারে বত্রিশটা থানা দখল করে নিয়েছে তারা, বিপ্লবী জনতার কারারুদ্ধ নায়ক চিত্তু পাণ্ডের কাছে বালিয়ার কালেক্টর আত্ম-সমর্পণ করেছে, সাতারায় আর মেদিনীপুরে বিপ্লবীরাজ কায়েম হয়েছে। আনন্দে ফুলে উঠল প্রবীরের বুক। ইচ্ছা হল জেলের মধ্যেই প্রাণভরে চীৎকার করে, "মহাত্মা গান্ধী কি জয়।"

কিন্তু সহসা আগাখাঁ প্যালেস্ থেকে মহাত্মা গান্ধী ঘোষণা করলেন, এই সহিংস অভিযানের সাথে কংগ্রেসের কোন সম্পর্ক নেই। তাঁরই কথার প্রতিধ্বনি করলেন কংগ্রেস নেতারা—"কোন সম্পর্ক নেই।"

একি কথা? সংশয়ে কেঁপে উঠল প্রবীরের বুক। জনতার স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লবী অভিযানকে কংগ্রেস অস্বীকার করছে? বলছে—ওরা আমাদের কেউ না? তবে কি—তবে কি সমরের কথাই ঠিক? সমরের শেষ চিঠির প্রত্যেকটি অক্ষর—বড় হয়ে ভেসে উঠল তার চোখের সামনে। সে স্পষ্ট দেখতে পেল—"প্রীতি কামনা আর সংগ্রামের টেকনিকের পিছনে লুকিয়ে আছে আপোষের গোপন প্রতীক্ষা।"

ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে একরকম জোর করেই নিজের মনে সে বললে—না—না—তা' হতেই পারে না। কোটি কোটি ভারতবাসীর বুকে যিনি এনেছেন জাগরণ,—অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মহামন্ত্র যিনি দিয়েছেন ভারতের জনতাকে, সেই মহাত্মা—ডাণ্ডি-অভিযানের নির্ভীক পদাতিক—জাতির মন্ত্রগুরু গান্ধীজী কখনো চুক্তিকেই মুক্তি বলে মেনে নিতে পারেন না। কক্ষণো না—কক্ষণো না—

সমর ছিল বিহারে। উল্লাসে, উৎসাহে ফুলে উঠেছে তার বুক। কুলী, মজুর, গেঁয়ো-চাষী—যত সব মেহনতী জনতা—যারা লেখাপড়ার ধার ধারে না,—রাজনীতি করেনি কোনদিন—তারাই কিনা লাঠি, ডাণ্ডা, শাবল, বর্শা, তরবারি যে যা পেয়েছে তাই নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে টেনে হিঁচড়ে উপড়ে ফেলছে রেলপথ, কেটে দিচ্ছে বিজলী তার, পুড়িয়ে দিচ্ছে রেলষ্টেশন, ডাকঘর,—আক্রমণে আক্রমণে সরকারী

সিপাইদের পরাভূত পর্যুদস্ত করে দখল করছে থানার পর থানা। সরকারী বাহিনীর গুলিতে হতাহত হয়ে জনতার পুরোভাগের কতজন যাচ্ছে পড়ে। কিন্তু উন্মত্ত জনতার ভ্রূক্ষেপ নেই সে দিকে,—গগণ বিদারী গর্জন করে তারা ছুটে চলেছে সামনের দিকে। একি প্রলয়ের জলোচ্ছ্বাস? একি আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্রাব? একি কাল বৈশাখীর কালান্তক ঝঞ্ঝা? একি ভূমিকম্প? একি বিপ্লব?

সমর আত্মহারা হয়ে মিশে যায় জনতার ঝাঁকে। আহার নেই, নিদ্রা নেই, বিরাম নেই। বিশ্রাম নেই। অথচ দেহ মনে ক্লান্তিও নেই। মাঝে মাঝে সমর অবাক হয়ে যায় নিজের শক্তি দেখে! কিন্তু আবো বেশী অবাক হয় নিরীহ, বুভুক্ষু, নিরক্ষর মেহনতী জনতার শক্তির প্রচণ্ডতা দেখে। আনন্দে নেচে ওঠে তার মন।

সরকার এবাবে গোরা সৈন্যদের দিলেন লেলিয়ে। সুরু হল প্রতি-আক্রমণ। গ্রামেব পর গ্রাম ঘিরে তারা বেপরোয়া গুলি চালাতে লাগল মেশিনগান থেকে। নিরস্ত্র নর-নারী,—আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা প্রাণ দিল তাদের গুলিতে। মেশিনগান, ষ্টেনগান, ব্রেনগান, রাইফেল নিয়ে দলে দলে গোরা-সৈন্য চষে ফেলল বিহারের গ্রামগুলি। প্রমাণ করতে চাইলে তারা যে জাপানী আক্রমণের সম্মুখে হংকং, মালয়, সিঙ্গাপুব, বর্মা থেকে ফেরুপালের মত লেজ গুটিয়ে—চোঁ-চা দৌড় দিলেও আসলে তারা বীর! অভ্রান্ত তাদের নিশানা—অসীম তাদের বীরত্ব। অবশ্য প্রতি-পক্ষ যেখানে নিরস্ত্র নিরীহ গ্রামবাসী,—শিশু,—নারী—বৃদ্ধ।

সমর ছিল ফেরারী। অকস্মাৎ এক দিন ধরা পড়ে সে গেল জেলে।

যুদ্ধের শেষ দিকে বিলাত থেকে এল ক্রিপস মিশন। তার প্রস্তাব সম্বন্ধে জোর আলোচনা সুরু হল। মহাত্মাজী ক্রিপস সাহেবের সাথে কিছুটা আলোচনা করেই মৃদু হেসে বললেন—"It is a post dated cheque." আলোচনা গেল ফেঁসে।

এই খবর জেলে যখন পৌঁছাল প্রবীরের বুক ফুলে উঠল গর্বে।" মনে হল তার—হুঁঃ—মহাত্মার সাথে চালাকি! রুষকে দলে ভিড়িয়ে ক্রিপস ভেবেছেন এমন মাথা আর কারো নেই! এইবার ঠেকে গেল যাদু!

আরো তার মনে হল মহাত্মা কখনো ভুল করতে পারেন না। পতাকা অবনমিত তিনি করতে পারেন না—না—কক্ষনো না—।

ওদিকে সমর জেলে বসে ভাবতে লাগলো—তাই তো! একি ব্যাপার? এ যে রীতিমত হেঁয়ালী! বৃটিশ মন্ত্রী এলেন আপোষের—সর্ত নিয়ে। মহাত্মা করলেন অগ্রাহ্য? তবে কি তারা ভুল করেছে মহাত্মার সম্বন্ধে? মহাত্মা কি বিপ্লবী?

ভেবে কুল পেল না সমর।

১৯৪৪ আর ৪৫ সালে জেল থেকে সকলেই বাইবে এল। জহরলাল দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছুটে বেড়াতে লাগলেন উল্কার মত। তিনি বিয়াল্লিশের বিদ্রোহের সম্পূর্ণ দায়িত্ব স্বীকার করলেন। অত্যাচারী রাজপুরুষদের, পুলিশের, কর্মচারীদের প্রকাশ্য বিচাব দাবী করলেন তিনি। প্রকাশ্য জন-সভায় সদর্পে ঘোষণা করলেন, দেশ স্বাধীন হলে অত্যাচারী, রাজকর্মচারী ঘুষ-খোর, সমাজ-দ্রোহী চোরা-কারবারী, মুনাফা-শিকারী সকলকে প্রকাশ্য স্থানে গুলি করবেন—গাছের ডালে অথবা লাইট পোষ্টে লটকিয়ে ফাঁসি দেবেন।

পণ্ডিত নেহেরুর প্রতি অসীম শ্রদ্ধায় ভরে গেল প্রবীরের মন। এই তো চাই।—নেতার মত নেতা বটে জহরলাল! মনের খুশী চেপে রাখতে না পেরে সে চিঠি লিখলে সমরের কাছে—

"সমর! এখন হয়ত দেখতে পাচ্ছ তোমাদের অনুমান কত ভ্রান্ত। আজ মহাত্মার দৃঢ়তার সাথে সংঘর্ষে বৃটিশ রাষ্ট্রনায়কদের রাজনৈতিক তীক্ষ্ণতা ভোঁতা হয়ে গিয়েছে। পণ্ডিতজী আজ ভ্রাম্যমান আগ্নেয়গিরি। তাঁর অগ্নুদগারে আগুন লেগেছে সারা দেশে,—গণ-চিত্ত টগবগ করে ফুটছে—দেশ এগিয়ে চলেছে বিপ্লবের পথে প্রচণ্ড

বেগে। দেশের এই পরিস্থিতি তোমাদের চোখে যদি ধরা না পড়ে, বুঝব মার্কসবাদের ঠুলি তোমাদের দৃষ্টিকে অন্ধ করেছে!”.........

যথা সময়ে জবাব এল সমরের। সে লিখেছে—“বীরুদা! আপনি সত্যিই দেশপ্রেমিক। দেশের ভালো যাতে হয় তাতেই আপনার মনে আনন্দের খোরাক যোগায়। মহাত্মার দৃঢ়তা, পণ্ডিতজীর বৈপ্লবিক আগ্রহ দেখে আপনি মুগ্ধ হয়েছেন। আমি কিন্তু ভিন্ন মত পোষণ করি। পণ্ডিতজী সমাজের যে শ্রেণীর লোক সেটা হচ্ছে বিত্তশালী অভিজাত শ্রেণী! সে শ্রেণী তো বিপ্লব চায় না! তার আশা আকাংখা আর কোটি কোটি বুভুক্ষু জনসাধারণের আশা আকাংখা এক নয়। তাই নেহেরুর চাওয়া স্বাধীনতা আর দরিদ্র জনসাধারণের চাওয়া স্বাধীনতার রূপ এক নয়। অভিজাত শ্রেণীর গণ্ডী কাটিয়ে পণ্ডিতজীর মেহনতী জনতার গণ্ডীতে নেমে আসা, তাদের জীবন সংগ্রামের সাথে নিজের জীবন মিলিয়ে দেয়া—অত্যন্ত কঠিন—একরকম অসম্ভব। শ্রেণী চেতনার যে স্তরে দাঁড়িয়ে পণ্ডিতজী লড়াইয়ের হাঁক-ডাক দিচ্ছেন সেটা গরীব শ্রেণীর পক্ষে সমধিক ভয়ঙ্কর। কারণ তাতে জনসাধারণের বিভ্রান্ত হবার সম্ভাবনা,—প্রচ্ছন্ন আপোষকামীকে বিপ্লবী বলে ভুল বোঝার সম্ভাবনা। মহাত্মাজী সম্বন্ধে এ কথা বোধ হয় বলা যায় না। তাঁর দুই রূপ। একরূপে তিনি চাষী মজুর,—আর একরূপে তিনি বুদ্ধ, চৈতন্য। বৈপ্লবিক কামনা আর আধ্যাত্মিক সাধনা জড়াজড়ি করে আছে তাঁর মধ্যে। দরিদ্র জনসাধারণের পাশে তিনি দাঁড়াতে পারেন। কিন্তু তাদের বিপ্লবী-রূপের কল্পনায় তিনি শিউরে ওঠেন। আমার মনে হয় বীরুদা! তাঁর এই ভীমার্ত চেতনায় তাঁর বিপ্লব কামনাকে বিফল করে দেবে। তাঁর অন্তরের যীশু, বুদ্ধ, চৈতন্য বিপ্লবী গান্ধীর পথ রুখে দাঁড়াবে। আধ্যাত্মিকতার চাপে বিপ্লবী মরে যাবে।”

পত্র পড়ে প্রবীর খুব বিরক্ত হ'ল। পণ্ডিতজীর বিপ্লবী প্রেরণা যাতে সমস্ত দেশটা মেতে উঠেছে, শ্রেণী-চেতনার ফরমূলাতে ফেলে তাতেও এরা সন্দেহ পোষণ করে—তাকে প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দিতে

চায়। হায়রে মার্কস! হায়রে লেনিন! শ্রেণী সংগ্রামের কি জোয়ারই আনলে দেশে,—শেষে ভালো ভালো ছেলেরাও গোঁয়ার হয়ে গেল!

এরপরই এল বোম্বায়ের নৌ-বিদ্রোহ—পাটনার পুলিশ বিদ্রোহ। আই, এন, এ বিচারে আর জহরলালের জোর প্রচারে সংগ্রামমুখী হয়েছে দেশের মানসিক অবস্থা। তার উপর নৌ-বিদ্রোহ। প্রবল সম্ভাবনা নিয়ে থমথমে হয়ে উঠল দেশের আবহাওয়া। বিদ্রোহীদের ওপর গোরা সৈন্যরা চালাল গুলি,—কংগ্রেস নেতারা বিদ্রোহে বাধা দিলেন তাঁদের ব্যক্তি ও সমষ্টিগত নৈতিক প্রভাব দিয়ে। বিদ্রোহ গেল থেমে।

প্রবীর আর সমর দুজনে দুই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখল একে। প্রবীর ভাবলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেব বিজয়ী ইংরাজ শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে ঢাল তলোয়াব হীন নিধিরাম সর্দারের দল। দুটো মেশিন-গান, দুটো কামান, এইতো এদের সম্বল। বিরোধ চললে নৌ-বাহিনীর বিদ্রোহী সিপাইদের রক্তে লাল হ'ত সাগরের জল। কংগ্রেস নেতারা ঠিকই করেছেন এই বিদ্রোহ থামিয়ে দিয়ে। অকালে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের ফল অনিবার্য মৃত্যু।

সমর ভাবলে—বাঃ—বাঃ—চমৎকার। Thus far and no further। সুন্দরভাবে কংগ্রেসী সর্দারদের শ্রেণীরূপ ফুটে উঠেছে। সারা দেশটা এমন ধোঁয়াচ্ছে—এমন তার অবস্থা যে শুধু একটা কাঠি, একটা স্ফুলিঙ্গের ওয়াস্তা। নৌ-বিদ্রোহ কি সেই কাঠি? সেই স্ফুলিঙ্গ? থর থর করে কেঁপে উঠল বৃটিশ সরকার,—শঙ্কিত হল কংগ্রেস নেতৃত্ব। সুতরাং একজন চাইলে ধূমায়মান জাহাজগুলি গোলার আঘাতে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিতে,—আর একজন চাইলে কমণ্ডলু হতে নীতি কথার বারি সিঞ্চনে ধূমায়মান সম্ভাবনাকে নিভিয়ে দিতে। হঠাৎ সমরের মনে খেলে গেল "প্রবীর পতন" নাটকের জনার তিরস্কার—

"মহারাজ! বসি সংগোপনে নীতিশিক্ষা
দিতেছ পুত্রেরে?
নীতিশিক্ষা?—ভীরু নীতিশিক্ষা।
পুত্র ধায়—বীরত্ব কারণ,—
তুমি তারে—কর নিবারণ—
নরনারায়ণ বলি অর্জুনেরে!"

নিপীড়িত জনগণের দাবী-দাওয়ার মুখর রূপ দেব আমরা। অথচ জনগণ নিজেরাই সে দাবীর সংগ্রামী রূপ দেবে—সেটা চাই না।

"ঔরংজেব! আবার বলি চমৎকার!"

তারপর হ'ল সাম্প্রদায়িক দানবের আবির্ভাব। কলকাতায় রক্তগঙ্গা বয়ে গেল। নোয়াখালি আদিম যুগের বর্ব্বরতাকেও লজ্জা দিল,—বিহারের পৈশাচিক তাণ্ডবে মানবাত্মা শিউরে উঠল। মহা-মানবের এই মর্মান্তিক বেদনা শেলরূপে বাজল মহাত্মার বুকে। দানবীয় আলোড়নে সমুত্থিত হলাহলের মধ্যে অমৃতের সন্ধানে মহাত্মা গেলেন নোয়াখালিতে। মহারাজ (ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী) গেলেন সেখানে মহাত্মার নির্দ্দেশমত সেবার ভার নিয়ে। প্রবীর আর সমরও গেল মহারাজের অনুবর্ত্তী হয়ে।

সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ল নোয়াখালিতে। সুরু হ'ল মহাত্মার পল্লীপরিক্রমা। প্রতি পদক্ষেপে পঙ্কিল বন্যভূমিতে ফুটে উঠল আশার শতদল,—বিভীষিকাময় শ্মশানে আবার জাগল জীবনের কোলাহল। বুকফাটা আর্তনাদ আশঙ্কায় যেখানে মৌন হয়ে গিয়েছিল সেখানেই আবার বেজে উঠল কাঁসর, শঙ্খ, ঘণ্টা।

নোয়াখালির ধূলি ধন্য হ'ল মহামানবের চরণ স্পর্শে।

প্রবীর মহাত্মার চলা-পথের ধূলি ছোঁয়াল কপালে। সমর বিস্ময়ে হতবাক হল ক্ষীণকায় অশীতিপর বৃদ্ধের বিরাটত্ব দেখে। প্রবীর সমরকে জিজ্ঞাসা করলে—"কেমন দেখছো?"

"মহান—বিরাট"—সম্ভ্রমের সাথে উত্তর দিলে সমর।

"তোমাদের মার্কস কি বলেন ?"—ঈষৎ শ্লেষ ধ্বনিত হল প্রবীরের কণ্ঠে।

"মার্কস বলেন এঁদের বিরাটত্ব মানুষের একান্ত স্বাভাবিক দাবীকে ধোঁয়াটে করে তোলে,—আধ্যাত্মিক ছোপে রঙ্গিয়ে শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের অভিযানকে স্তব্ধ করে দিতে চায়।

—"অর্থাৎ এই প্রভাব প্রতিক্রিয়াপন্থী"—বললে প্রবীর।

—"ঠিক তাই"—জবাব দিলে সমর। আবার বললে সে—"এখানে এসে বুদ্ধ ও খৃষ্টের দর্শন পেলাম। কিন্তু ম্যাজিনি, ওয়াশিংটন, লেনিনকে দেখতে পেলাম না। আচ্ছা বীরুদা! বলুনতো সাম্প্রদায়িকতা কি আসল ব্যাধি ? মহাত্মার এই অনুপম প্রচেষ্টায় তা দূর হবে ?"

"তোমার কি মনে হয় ?" প্রশ্ন করলে প্রবীর।

"হবে না। কারণ সাম্প্রদায়িকতা মূল ব্যাধি নয়। এটা শ্রেণী সংগ্রামের বিকারের অভিব্যক্তি। এখানে সাম্প্রদায়িক রূপ নিয়েছে, সাম্রাজ্যবাদ ও কায়েমী স্বার্থের উস্কানীতে বেড়েই চলেছে—মনে হচ্ছে,—উঃ—কি ভয়ঙ্কর। ধর্মীয় পার্থক্য না থাকলে হয়ত এই সংগ্রাম অন্য রূপ নিত। প্রদেশে—প্রদেশে, ভাষায়—ভাষায়, রক্তে-রক্তে, শৈবে—শাক্তে এমন কি বামুনে কায়েতেও এই সংঘর্ষ দেখা দিতে পারে—যদি জীবিকার প্রতিযোগিতা থাকে, আর্থিক স্তরের প্রভেদ থাকে।"

"অর্থাৎ"—

"অর্থাৎ এটা শ্রেণী সংগ্রামের বিকৃত রূপ"—

"প্রতিকার ?"

"প্রতিকার—সেই সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা যেখানে বেকার থাকবে না, একজন আর একজনকে শোষণ করতে পারবে না"—

"মহাত্মা তাই চান"—জোরের সাথে বললে প্রবীর।"

—"বাঘকে বাঘ রেখেই তার হিংসাবৃত্তি ভুলিয়ে। সেটা হয়না বীরুদা!"—শান্তভাবে জবাব দিলে সমর।

চিন্তিত হল প্রবীর।—"যাক এ নিয়ে তর্ক করতে চাইনে" বলে আলোচনা সেখানেই থামিয়ে দিল।

ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে অতি দ্রুত পট পরিবর্তন হচ্ছে। ওয়াভেল প্ল্যান নিয়ে আলোচনা স্বরু হল। সেটাও গেল ফেঁসে। অবশেষে মন্ত্রী-মিশন। ভারতের অঙ্গচ্ছেদের সম্ভাবনা দেখে মহাত্মা চীৎকার করে বললেন, "আমার মৃত দেহের উপর দিয়ে ভারত বিভাগ হতে পারে।" কিন্তু তাও সত্য হল। কংগ্রেস নেতারা ভারত-বিভাগ মেনে নিলেন। মহাত্মা কোন প্রতিবাদ করলেন না। প্রবীরের মনে দারুণ ক্ষোভ দেখা দিল। ভারত বিভক্ত হয়েছে এটা সে বরদাস্তই করতে পারছিল না। তবুও মনে মনে বললে—হয়ত এর পিছে কোন গূঢ় তাৎপর্য আছে যা আমরা বুঝতে পারছি না! মহাত্মা ভুল করতে পারেন না—আদর্শবাদী নেহেরু, প্যাটেল অন্যায় মেনে নিতে পারেন না।

১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭।

স্বরু হল স্বাধীনতা উৎসব। তারই পাশে পাশে স্বরু হল দানবীয় ধ্বংস লীলা। আর্তের রোদনধ্বনিতে ভরে গেল আকাশ বাতাস। মর্মবেদনায় মহাত্মা ছুটাছুটি করতে লাগলেন পাগলের মত। প্রবীরের হৃদয়ও কেঁদে উঠল—স্বাধীনতার স্বরূপ দেখে। সাত কোটি ভারত-বাসীর সর্বনাশ সাধন করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বাধীনতা!

পৃথিবীর কোন অন্তর্বিপ্লব, রাষ্ট্র-বিপ্লব, স্বাধীনতা সংগ্রাম এমনকি বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মহাযুদ্ধেও এ সর্বনাশের নজির নেই। কি করলেন কংগ্রেস নেতারা—কি করছেন দেশ নায়করা? ডুকরে ডুকরে কেঁদে ওঠে প্রবীরের মন।

ভারত স্বাধীন হল—সাম্রাজ্যবাদী শোষকের শেষ প্রতিনিধি ভারতে বড়লাট হলেন। যা' ছিল সব সেই; সেই আইন, সেই আদালত, সেই শাসন-যন্ত্র—সবই ঠিক আছে,—কেবল বদলেছে

বাক্যের কচকচি। খচ খচ করে ব্যথা বেঁধে প্রবীরের বুকে। এই কি স্বাধীনতা? এ যেন ক্লাইভ ষ্ট্রিটের নাম পালটে নেতাজী সুভাষ রোড রাখা হয়েছে। দুপাশে সেই সব বাড়ীতে সেই সব কেনা বেচা —ব্যবসা বাণিজ্য চলছে।

অকস্মাৎ সর্দ্দার প্যাটেল ঘোষণা করলেন "Govt. Officers are as good patriots as we are." আরও ঘোষণা করলেন তিনি—"আগামী দশ বছরের মধ্যে ধনিক স্বার্থের কোন ভয় নাই। জাতীয়করণ হবে না।........."

দেশের ভেতরের অবস্থা গভীর দাগ কেটে যায় প্রবীরের মনে। ঘুষ, চোরাকারবার, মুনাফাশিকার বে-পরোয়া বেড়ে যাচ্ছে। যাদের ফাঁসি দেবেন বলে পণ্ডিতজী সদর্পে ঘোষণা করেছেন আজ নিজেই তাদের প্রেমের ফাঁসে পড়েছেন। সাম্রাজ্যবাদের পরমশত্রু জহরলাল ছুটেছেন ইংলণ্ডে মিতালীর সন্ধানে।

মহাত্মার মর্ম্মবেদনা ঝরে পড়তে লাগল প্রাত্যহিক প্রার্থনা সভায়। তাঁর খদ্দর সেবার প্রতীক না হয়ে—বিলাসের আবরণ হয়েছে দেখে তিনি লজ্জায় মুখ ঢাকলেন। গান্ধীজী বিস্মিত হয়ে দেখলেন তাঁর অতি ভক্ত Yes man-রা আজ Nay man হয়ে দাঁড়িয়েছে। মহাত্মার ব্যথা প্রতিধ্বনিত হল প্রবীরের হৃদয়ে। যাতনায় ছটফট করতে করতে সে চিঠি লিখল সমরকে। সে লিখলে —"চোখের সামনে থেকে যেন সব আলো একের পর এক নিভে যাচ্ছে। সব যেন আঁধার হয়ে আসছে। আজ শুধু আমার তোমার মত কোটি কোটি মানুষের নয়—মহাত্মারও অশ্রু ঝরে পড়ছে স্বাধীনতার স্বরূপ দেখে। কেন এমন হল বলতে পার? জহরলাল, প্যাটেল কি পথ-ভ্রষ্ট? বিশ্বাস-ঘাতক? ভাবতেও পারি না"—

জবাবে সমর লিখলে—"সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ মেনে নিয়ে বিপ্লবী মহাত্মার মৃত্যু হয়েছে। বিপ্লবী গান্ধীর মৃত্যুতে মহামানব গান্ধী কাঁদছেন। আসলে কি হয়েছে জানেন বীরুদা? মহাত্মার ডাকে

জাতির মুক্তি সাধনায় দেশে যে সাড়া এসেছিল তার উৎস এক স্থানে ছিল না। বিভিন্ন স্বার্থ-চেতনা বিভিন্ন শ্রেণীর লোককে জমায়েত করেছিল মহাত্মার চারপাশে। দেশীয় বণিক স্বার্থ চেয়েছিল অর্থ-নৈতিক শোষণের ব্যাপারে বৈদেশিক স্বার্থকে মুখ্যস্থান থেকে কোণ-ঠাসা করে গৌণ স্থানে নিয়ে যেতে। অভিজাত শ্রেণী চেয়েছিল সম্পদ ও সম্মান। আর কোটি কোটি দরিদ্র জনসাধারণ চেয়েছিল শোষণের সর্বাঙ্গীন অবসান। নেতৃত্ব ছিল ধনী, বণিক, অভিজাতদের হাতে। বিপ্লবী নেতৃত্বের দুর্বলতায় জনসাধারণ ধনিক নেতৃত্বের প্রভাব মুক্ত হতে পারেনি। তাই আজ তারা প্রতারিত হয়েছে। শুধু কি তারা? বিপ্লবী গান্ধীও প্রতারিত হয়েছেন। ধনিক, বণিক, অভিজাত সম্প্রদায় অনুকুল অবস্থায় আপোষ করে তাদের কাম্য লক্ষ্যে পৌঁছেছে। জনসাধারণ যে তিমিরে সেই তিমিরেই পড়ে আছে। পণ্ডিতজী, সর্দারজী পথভ্রষ্ট নন,—বিশ্বাসঘাতক নন। তাঁরা তাঁদের শ্রেণীর ভূমিকা চমৎকার অভিনয় করে চলেছেন। তাঁরা যা চেয়েছিলেন, তা পেয়েছেন। তাই তাঁরা আর এগুতে চান না বলে দোষ দেয়া যায় না। আমরাই ভুল করে যদি তাঁদের বিপ্লবী মনে করে থাকি, সিঁদুরে মেঘকে দাবাগ্নি বলে ধরে নিয়ে থাকি সে দোষ আমাদের। বলতে পারেন নেহেরু প্যাটেল বিপ্লবী হবেন কোন দুঃখে? তাঁরা বড় জোর বুদ্ধি দিয়ে বিপ্লবের প্রয়োজন অনুভব করেন। বুদ্ধি দিয়েই আমাদের দুঃখ অনুভব করেন তাঁরা। তাই তাঁরা আমাদের মত গরীব জনসাধারণের উপকার করতে এগিয়ে আসেন। এদিকে বিপ্লব আমাদের গরীব জনগণের জৈবিক প্রয়োজন। না হলে বাঁচার উপায় নেই। তাই শ্রেণী হিসাবেই আমরা বিপ্লবের পথে এগিয়ে যাই।"

সমরের চিঠি আর স্বাধীন ভারতের কঠিন বাস্তব সন্দেহে, সংশয়ে, নৈরাশ্যে ভেঙ্গে দিয়েছে প্রবীরের মন। প্রতিদিন সে দেখছে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু ছুটে চলেছে মৃত্যুর পানে,—বস্ত্রের অভাবে গেরস্তের বৌ গলায় দড়ি দিচ্ছে, অন্নের অভাবে সমগ্র পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে,—

ক্রমবর্ধমান দৈন্যের তাড়নায় সমগ্র দেশ শ্মশান হতে চলেছে। অথচ নগরীতে নগরীতে সরকারী ভবনে, ধনিক—বণিকের ইমারতে বিলাসের হুল্লোড় চলেছে। প্রবীর দৈনিকে, মাসিকে দেখলে বহির্জগতের সম্মান কুড়ানোর ব্যয়ভারে কঙ্কালসার দরিদ্র ভারত হাঁপাচ্ছে।

এরপরই এল সর্বনাশের চূড়ান্ত আঘাত। দিল্লীর বিড়লা ভবনে মহাত্মা গান্ধী নিহত হলেন আততায়ীর গুলিতে। সমস্ত দেশ জুড়ে ক্রন্দনের রোল উঠল। প্রবীর খবর শুনে থরথর করে কেঁপে পল। অতি কষ্টে সমরকে লিখলে—"সমর! একি সর্বনাশ!"

সমর জবাবে লিখল—"আধ্যাত্মিক তাপস মহাত্মার মৃত্যুতে কাঁদছেন বীরুদা! কাঁদুন—চীৎকার করে কাঁদুন। আপনাদের ম নৈষ্ঠিক সেবকদের সত্যিকারের চোখের জলে পবিত্র হোক মিথ্যা ও শাঠ্যভরা ধরণীর ধূলি,—আপনাদের শুষ্ক অন্তরের কাঁদনভরা অনায়াস দীর্ঘশ্বাসে নব প্রেরণা লাভ করুক বিষায়িত বায়ুস্তর। নেতারাও কাঁদছেন,—ধনিকরাও কাঁদছেন—বিদেশী বণিক আর রাজপুরুষরাও হায় হায় করছেন। ধনিক আর অভিজাতরা কাঁদছেন,—তাঁদেব স্নেহময় বাপুজী আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন। কিন্তু বস্তুবাদের সন্ধানী দৃষ্টি কোন কোন রোদনের অন্তরালে খুশীর পৈশাচিক হাসি দেখতে পাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছে অশ্রু দিয়ে তারা ঢেকে রেখেছে স্বার্থের কুৎসিত বীভৎস রূপ। গান্ধীজীর মৃত্যুতে তাদের শোষণ আর স্বৈরাচারের পথ নিরঙ্কুশ হল—নৈতিক বাধা অপসারিত হল। তাদের শোক অদূর ভবিষ্যতে পুলকের রূপ নেবে। যতই তারা মহাত্মাকে ভুলবে, ততই তাঁর জয়ধ্বনি তুলবে, যতই করবে মহাতাপস মহাত্মার অপমান ততই উচ্চকণ্ঠে করবে তাঁর জয়গান। বন্দনা হবে প্রতারণার অশ্রু। আজ আধ্যাত্ম সাধনার নৈতিক আদর্শবাদী ঋষি গান্ধীর মৃত্যুতে আপনারা কাঁদছেন, ভারতীয় বণিক আর অভিজাত শ্রেণীর প্রতিনিধিরা বাপুজীর মৃত্যুতে কাঁদছেন। আমরাও কেঁদেছি। কিন্তু সে আজ নয়। আমাদের গান্ধীর মৃত্যু হয়েছে আগেই। যেদিন শোষিত জনতার জীবনের

দেবতা গান্ধী আপোষ মেনে নিয়েছেন সাম্রাজ্যবাদের সাথে সেইদিনই জনতার বিপ্লবীনায়ক মহাত্মার মৃত্যু হয়েছে। জনতার হয়ে আমরা সেদিন মহাত্মার মৃত্যুতে কেঁদেছি—নিজেদের অক্ষমতায় কেঁদেছি। হইনি। বিশ্বাসও হারাইনি। নিপীড়িত, শোষিত জনগণের দেবতা গান্ধী আবার সংস্কারহীন নবজন্ম নেবেন জনতার মা...ই মহাত্মারূপে নয়—অশরীরী, রুদ্র ও ভয়ালরূপে, বঞ্চিত ...র উষ্ণ নিশ্বাসেব ঝঞ্ঝাবাতে ভেঙ্গে চুরে খান খান করে দেবে ...রের গর্বিত দুর্গ,—সেই আশা—সেই আশা নিয়েই নিরাশাময় ...বব মাঝে বেঁচে আছি বীরুদা!”